ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

শতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

শতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা

সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

প্রকাশকাল: জুন ২০২২

সম্পাদক

হারুন রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

শতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশক
রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

স্বত্ব : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্ষরবিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল- press@du.ac.bd

প্রচ্ছদ :

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

ISSN : 2411-9059

অনলাইন পত্রিকার পাঠ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায়
www.journal.library.du.ac.bd

DHAKA VISHWAVIDYALAYA PATRIKA [Bangla Journal of the University of Dhaka],
Vol. 102, December 2020 and Vol.103, June 2021
Edited by Haroon Rashid, Professor, Department of Philosophy, University of Dhaka, Bangladesh.
Published by Registrar, University of Dhaka
Printed by Dhaka University Press, University of Dhaka, Email- press@du.ac.bd
Price: Tk. 200.00, US$ 25.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

শতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ (হারুন রশীদ) — সম্পাদক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক — সদস্য
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈন — সদস্য
ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির — সদস্য
ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী — সদস্য
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণভাবে লেখকের/লেখকবৃন্দের একান্ত নিজস্ব। এজন্য সম্পাদনা পরিষদ বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নন।

সূ চি প ত্র

সুকোমল বড়ুয়া ১
দু'শ বছরে (১৮০০-২০০০) বঙ্গে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার উৎস বিচার
এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এর প্রভাব

সন্তোষ কুমার পাল ৩৫
জি. সি. দেবের সমন্বয়বাদ ও সমকালীন ফলিত দর্শন

সৈয়দ আজিজুল হক ৪৭
পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক : নবতর চেতনায় উজ্জ্বল

শাহনাজ নাসরীন ইলা ৬৫
রবীন্দ্রনাথের গানে পুরাণভাবনা

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া ৭৫
চট্টগ্রামের প্রাচীন পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় : নির্মাণ-ইতিহাস অন্বেষণ

মিলটন কুমার দেব ৮৯
শহিদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ ও তাঁর মানবিক মূল্যবোধ

চন্দনা রাণী বিশ্বাস ১০৫
শিক্ষকাগ্র্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃতানুশীলন

মো. আশিকুর রহমান লিয়ন ১২৩
শিক্ষায়তনে সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চায় নব্য তরঙ্গরূপী নাট্য অভিযাত্রা :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের ইতিহাস ও দর্শন অনুসন্ধান

বিপাশা আহমদ ১৬৩
রবীন্দ্রভাবনায় শিশুশিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

দু'শ বছরে (১৮০০-২০০০) বঙ্গে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার উৎস বিচার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এর প্রভাব

সুকোমল বড়ুয়া*

সারসংক্ষেপ : অবিভক্ত বঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ১৮০০ সালে। সাময়িকী, ছড়া তথা মুদ্রণশিল্পের যাত্রাও শুরু ঐ শতকে। তখন বৌদ্ধরাও জাগতে শুরু করে তাদের লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। ঐ শতকটিতে কলকাতা মহানগরীতে বসবাসরত শিক্ষিতজনদের হাতেখড়ি হয়েছিল বেশি। এর পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বিস্তীর্ণকালে অবিভক্ত বঙ্গে তথা বাংলাদেশে শিক্ষক, সাহিত্যিক, গবেষক, দার্শনিক ও ইতিহাসবেত্তাগণ বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে সর্বপ্রথম লেখালেখি শুরু করেন। এ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং সাহিত্যের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সাথে ভারত-বাংলা উপমহাদেশের বৌদ্ধরাও পালি ভাষা, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, অনুবাদকর্ম, প্রবন্ধ রচনা এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। বৌদ্ধরা ও রেনেসাঁ-উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে বিভিন্নভাবে অবদান রাখেন। এ দুই শতাব্দী ছিল বৌদ্ধধর্মের নবজাগৃতির যুগ। বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা পালি ও বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা তথা এ দু'শ বছরে বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় এবং সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের আগমনকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদগণের মতে, যে সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ ও সিংহল প্রভৃতি বহির্বিশ্বে আপন ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই সময় প্রাচীন বৃহৎবঙ্গ তথা বাংলাদেশেও (চট্টগ্রাম) বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ ও প্রচার হয়ে থাকবে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধমত অতি প্রাচীন। সেই দেশ চট্টগ্রামের একেবারেই নিকটবর্তী এবং একসময় চট্টগ্রামও রাখাইন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সূত্রে বাংলাদেশেও এই ধর্মমত সুপ্রাচীন ভাবা অযৌক্তিক কিছু নয়। (আবদুল হক চৌধুরী, ১৯৮৬ : ৬৪)। আরাকানের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৪৬ (একশত ছয়চল্লিশ) খ্রিস্টাব্দে মগধে চন্দ্রসূর্য নামক এক সামন্ত রাজা চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজ্য জয় করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন

* সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং তিনি সেই রাজ্যের রাজা হন। তখন রাজা চন্দ্রসূর্যের মগধাগত হিন্দু ও বৌদ্ধ সৈন্যরা এই রাজ্যের জড়-উপাসক আদিম জনগোষ্ঠীকে আর্যধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষা ও শিক্ষাদান করেন। কালক্রমে এসব অঞ্চলে সর্বপ্রথম, বিশেষ করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আরাকানে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয়। পণ্ডিতদের মতে, এই রাজবংশ চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আবার কথিত আছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ অব্দে আরাকানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। (আবদুল হক চৌধুরী, ১৯৮৬ : ৬৪)। সেই সময় আরাকানী সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ধন্যাবতী রাজবংশের রাজা চন্দ্র সুরিয়। এ কথা সুবিদিত যে, সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যে সব দেশে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন তন্মধ্যে তাঁর নিজ পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে এবং সোন ও উত্তর থেরকে প্রেরণ করেন সুবর্ণভূমিতে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে প্রাচীনকালে বঙ্গে যে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'রাখাইন রাজোওঁয়ে'[১] নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু রাজবংশ আরাকান শাসন করেন। এই রাজবংশগুলোর মধ্যে ধন্যাবতী, চন্দ্রবংশ ও থ্রডোক বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল রাজবংশের রাজারা সকলে বৌদ্ধ ছিলেন। ইসলামাবাদ গ্রন্থে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেছেন, "বাংলাদেশী বৌদ্ধরা এদেশের আদিম অধিবাসী। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষে। বৌদ্ধধর্ম সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। কারণ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল হলো খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক। এদিক থেকে ভারতবর্ষসহ সমগ্র প্রাচ্যের ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই শতাব্দীতে চীনে কনফুসিয়াস, পারস্যে জরথুষ্ট্র, ভারতে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম পৃথিবীতে সর্বজনীনতা লাভ করেছে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপকভাবে বিস্তার এবং গভীর প্রভাব ফেলেছে।"

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে যুগে যুগে। খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে আজ অবধি বৌদ্ধধর্ম বিচিত্রভাবে বাঙালির জনমানসে, বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এবং বাঙালির সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। একদিন এ ধর্ম ছিল ভারতবর্ষের একছত্র আধিপত্যের অধিকারী। কিন্তু কালের অমোঘ বিধানে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটে। এর অস্তিত্ব সেখানে বর্তমান থাকলেও শুধুমাত্র পুরাতত্ত্ব, ভাস্কর্য, শিল্প, স্থাপত্য, ইতিহাস এবং সাহিত্যে বিদ্যমান। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও বৌদ্ধ নিদর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নানা স্থানে ও নানা জায়গায়। অনেক মূল্যবান পুরাকীর্তি দেখা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকে। (সুকোমল চৌধুরী, ১৩০০ বঙ্গাব্দ : ১)

বাঙালি বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক পরিচিতি রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায়। কারণ অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল রাজাগণ কৃতিত্বের সাথে এখানে রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের পরে ক্ষমতায় আসে সেন বংশের ব্রাহ্মণ্য রাজাগণ। এ সময় ধর্ম, সমাজ ও জাতিতে সৃষ্টি হয় ভেদাভেদ ও বর্ণ বৈষম্য। এ সময় অনেক বৌদ্ধতীর্থ ও মূর্তি, হিন্দু তীর্থ ও সংস্কৃতির রূপ লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম ও ঐতিহ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র বৌদ্ধ বিহারগুলো লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আমরা এও জানি কোন জাতির ইতিহাস উত্থান-পতনের নানা ঘটনা-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়। তেমনি বাংলার বৌদ্ধ সমাজের ইতিহাসের উত্থান-পতন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধির বিষয়ও একই রকম। বাংলার বৌদ্ধ সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন, 'যে সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশে আপন ধর্মের বাণী নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, সেসময়ে বাংলায় (চাটগাঁয়ও) বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজ-উ-দৌল্লা'র পতন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান শাসক সুবেদার নবাব নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। মধ্যবর্তী মাত্র চার বছর (১৪১৪-১৪১৮) রাজা গণেশ স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'

বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা' গ্রন্থে বলেছেন, বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হয়। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশ বছর বাংলার বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীন ছিল। পাল রাজাদের অনেকে সুশাসক ছিলেন। পাল আমলে দেশীয় সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ ঘটেছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্র (৫২৯-৬৫৪ খ্রি.) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সম্মান পেয়েছিলেন। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন জাগে, ঐ যুগের বিপুলসংখ্যক বাঙালি বৌদ্ধ কোথায় গেলেন?

বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে খনন কার্যের ফলে প্রস্তর যুগের (চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে ও রাণীগঞ্জে) ও তাম্রযুগের (অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত ও পাণ্ডুরাজার ঢিবি) বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননে একাধিক পর্বের নিদর্শন মিলেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে কোন স্তরের লোক তা নির্ণয় করতে গেলে নৃতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজন। ঐ সব মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি ও ভাষা কি ছিল তাও জানা প্রয়োজন। হাজার হাজার বছর ধরে এ জনপদে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী কোন্ গোত্র, কোন্ বংশ ও কোন ভাষা পরিবারের অন্তর্গত- তাও জানার বিষয়।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায় তাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীয় ভাষা। বাঙালি জাতি মূলত অনার্য বংশ উদ্ভূত। ভাষাবিচারে বাংলা ভাষা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট চীনীয় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে বেশি সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ভাষা লেখা হয় বাংলা লিপিতে। এ লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে এসেছে। ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নির্দশন পাওয়া গেছে পিপরাওয়া স্তূপে প্রাপ্ত একটি কারুকার্য সমন্বিত পাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিতে। এর সময়কাল অশোক অনুশাসনের পূর্ববর্তী। (অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮২ : ১২২)। ব্রাহ্মী লিপির পরবর্তী নিদর্শন পাওয়া যায় অশোকের অনুশাসনে। একমাত্র উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ছাড়া অশোকের আর সব অনুশাসনের লিপি হলো ব্রাহ্মী। আর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লিপি হলো খরোষ্ঠী। কালক্রমে তা পরিবর্তন হয়ে গুপ্ত আমলে পূর্বাঞ্চলে এ ব্রাহ্মী লিপি যে রূপ পায় তাকে বলা যায় কুটিল লিপি। এ কুটিল লিপি পরিবর্তন হয়ে বাংলা বর্ণমালার রূপ লাভ করে। সমাচার দেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনে বাংলা বর্ণমালার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। (রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৮ : ১৮০-১৮১)।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা অক্ষরে লিখিত প্রথম সাহিত্যকীর্তি। চর্যাপদের ভাষা বাংলা হলেও নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত। বাংলাদেশে এখনো বাঙালি সংকলিত বা রচিত কোন প্রাকৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। মৌর্য বংশীয় রাজার একটি প্রাকৃতে রচিত অনুশাসন লিপি পাওয়া গেছে পুণ্ড্রবর্ধন এলাকায় মহাস্থানগড়ে; তাও বাঙালির রচনা না হওয়ারই কথা। (ইতিহাস, ১৪০৪ বাংলা : ৪৭)। কারণ তখনো বাঙালি আর্যভাষায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে ওঠেনি। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধরা বাঙলার ও বাঙালির শাস্ত্র, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসমূহকে প্রবহমান রেখেছিলেন; যাঁরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত শীলভদ্র, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, শান্তিদেব (ভুসুকু), শান্তরক্ষিত, অনিরুদ্ধ, লুইপা, হাড়িপা, প্রজ্ঞাভদ্র, শান্তিপাদ, বিমলমিত্র, জিনমিত্র, বোধিভদ্র, তিলোপাদ, অভয়কর, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, আর্যদেব, জ্ঞানশ্রী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় বুদ্ধচর্চার ইতিহাস ১৪০ থেকে ১৫০ বছরের অধিক নয়। 'মঘা খমুজা'[২] আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ বলে গবেষকগণ মনে করেন। এর পূর্বে বাংলাভাষায় কোনো বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এটি মূলত একটি অনূদিত গ্রন্থ, যাতে মূল গ্রন্থের নামের পরিবর্তন করা হয়নি। বাংলার বৌদ্ধদের কাছে 'মঘা' শব্দের অর্থ হলো গ্রন্থ। বাংলাভাষায় বুদ্ধচর্যা যারা প্রথম শুরু করেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯০৮), পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-১৮৯৬), পণ্ডিত অগ্গসার মহাস্থবির (১৮৬০-১৯৪৫) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পূর্বে ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার আবির্ভাব। তারও পূর্বে বড়ুয়াদের মধ্যে জনৈক প্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি 'মঘা খমুজা'র রচয়িতা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর নাম-ধাম কিছুই এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তিনি ফুলচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ব্যক্তি ছিলেন। ফুলচন্দ্র প্রথম জীবনে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে প্রৌঢ়ে গৃহী হয়েছিলেন। পালি ও বাংলা এই দুই ভাষায় তাঁর সমান অধিকার ছিল। এছাড়া বর্মিভাষাও তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। বলতে গেলে সেই অন্ধকারযুগে তাঁর মতো পণ্ডিত বৌদ্ধ সমাজে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না।

'তাধুবাইন'[৩] বা 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' বাংলা ভাষায় বৌদ্ধদের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক আদি গ্রন্থ। এর নামপত্রে উল্লেখ আছে "বৌদ্ধরঞ্জিকা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ"। উক্ত গ্রন্থের পদ্যে বর্ণিত কথায় প্রমাণিত হয় এটি বাংলা ভাষায় প্রথম বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ। যেমন-

"মঘা শাস্ত্র[৪] গূঢ়তর সবে জ্ঞাত নয়।
কেহ জেন্তে[৫] পারে কেহ নাহিক জানয়॥
অতএব বঙ্গভাষা করি পদবন্দে।
মঘা ভাঙ্গি বাঙ্গালা রচিব মনানন্দে॥"

[বৌদ্ধ-রঞ্জিকা: ২০০৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ) : ৫২]

লেখক সম্পর্কেও পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে-

"ফুল নামে[৬] লোতক[৭] সে মঘা শাস্ত্রজ্ঞতা।

শাস্ত্র দেখে বলিলেন যে সব ভারতা [বারতা]॥
সে সব বৃত্তান্ত বঙ্গ ভাষাতে রচন।
করিতে বাসনা নীলকমলের মন॥"

[বৌদ্ধ-রঞ্জিকা: ২০০৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ) : ৫৩]

গ্রন্থটির রচনাকাল ২৫শে চৈত্র, ১২৯৬ বাংলা (১৮৯০)। (বিপ্রদাশ বড়ুয়া এবং দিলীপ কুমার বড়ুয়া, ২০০৫ : ৯)। তবে ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের অভিমত, এটির অর্ধাংশ ১৮৯০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল বটে বাকি অর্ধাংশ প্রকাশিত হয়নি। ফলে এই অমূল্য গ্রন্থের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য এই 'বৌদ্ধরঞ্জিকা'ই চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়াদের ঘরে ঘরে পঠিত হতো পুঁথি হিসেবে যা তাধুয়াইং, ধাতুডোয়াং, থাতুত্তোয়াং, থাডুথাঙ, থাধুবাইং, তাধুআইং, তাধুবাইন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ গ্রন্থে রচয়িতার মূল কৃতিত্ব রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামের ফুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং বেতাগী গ্রামের নীলকমল দাসের। কাব্যটি রচনায় একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চাকমা রাণি কালিন্দী আর বিষয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন ফুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং পদ্যচ্ছন্দে ও রূপায়নে নীলকমল দাস। (রেবত প্রিয় বড়ুয়া, ২০১৯ : ৯)।

উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর কালটি ছিল নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ শতকটি নানা গবেষণা, সাহিত্য রচনা, সৃষ্টি-নবজাগরণ, প্রকাশনাসহ নানা সংস্কার ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং ঐ ধারাবাহিকতা ও পরম্পরায় আর একটি নতুন শতাব্দীকে স্বাগত জানিয়েছিল। সেদিক থেকে ঊনবিংশ শতকটি অবিভক্ত বঙ্গ তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধদের জাতীয় জীবনে বহু অর্জন, বহু প্রাপ্তি, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা সংস্কারসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টি- সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। ঐ উৎস অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটেই বর্তমান বাংলাদেশ তথা প্রাচীন বঙ্গের বৌদ্ধদের নানা ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বৌদ্ধ শেকড়ের পূর্বাপর অনেক বিষয় উঠে আসে।

যেমন উন্নত বিশ্বে শিল্প-সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। সমাজ উন্নত হলে শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটে। তাই সমাজের জাগ্রত বিবেক হিসেবে এসব কর্মকে সম্মান জানাতে হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিবেকবুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নানা পেশাজীবীদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-কল্পনা যুগে যুগে সমাজে প্রভাব ফেলেছে নানাভাবে। এ প্রেক্ষিতে ব্যক্তি, ধর্ম, নানা পেশা, সমাজ, শিক্ষা, ভাষা-কৃষ্টি, শিল্প-সাহিত্য একটি দেশ, একটি জাতি ও একটি সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

অতএব বৌদ্ধদের সমকালীন চিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণে ধর্ম ও সমাজের পাশাপাশি শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রভাব; এছাড়াও নানা পেশাজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানামুখী আলোচনা এ প্রসঙ্গে অতীব মূল্যবান। এদেশের বৌদ্ধদের চিন্তা-চেতনার অগ্রগামিতার স্বরূপ এবং তাঁদের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের

মানসপ্রকৃতি এবং তাঁদের রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত সাহিত্যের গঠনমূলক আলোচনা এক্ষেত্রে নতুন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বলা চলে। একটি সুশীল সমাজের বৌদ্ধিক চিন্তা-চেতনায় অন্তরে ও বাইরে যেমন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রভৃতি থাকে, তেমনি ধনী ও প্রভাবশালীদের সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা সমাজের নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার মধ্যেও থাকে নানা বৈষম্য ও দ্বিধা-বিভক্তি। এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় এবং উন্নতি-সমৃদ্ধি ও বৈষম্যের মধ্য দিয়েই বর্তমান বৌদ্ধ সমাজে নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। (সুকোমল বড়ুয়া, ২০১৭ : ৭)।

বৌদ্ধদের বিদ্যাচর্চা, জ্ঞান, মনন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধধর্ম ও ভাষাসাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষার জন্ম এবং বাংলা সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি। বৌদ্ধরাই বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার উত্তরাধিকারী। বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয় বৌদ্ধ পালরাজাদের সময়ে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মাধ্যমে। মূলত অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বাংলাভাষার উদ্ভবকাল এবং ওটা ছিল বৌদ্ধ ঐতিহ্যের স্বর্ণযুগ। আবার খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এ চারশ বছর ছিল বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্ম-কর্ম ও সাংস্কৃতিক চর্চা এবং পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ। (বনশ্রী মহাথের, ২০০১ : ৫২)। এ সময়কার সঠিক বৌদ্ধ ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। আবার এটাও প্রমাণ করে বৌদ্ধ পালরাজত্বের অবসানের পর বৌদ্ধদের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন। বৌদ্ধধর্মীয় শাস্ত্র, বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয় এবং বিনষ্ট করা হয় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোকে। এতদ্সত্ত্বেও কত দৃঢ়চেতা এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যানুরাগী হলে আমাদের পূর্বসূরিরা কোনো প্রকারে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন এ বাংলা অঞ্চলে। এজন্য আমরা তাঁদের নিকট চিরঋণী। সেন আমলে সংস্কৃত এবং মুসলিম যুগে আরবি, ফারসি, উর্দু চর্চার ফলে বৌদ্ধদের পালি ভাষা এবং বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও সাহিত্য চর্চার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এতে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য চর্চা এবং পালি ভাষার প্রভাব ব্যাহত হয়।

দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা স্তিমিত থাকার পর বিশেষ করে ইংরেজদের আগমনের ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে আবার পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। বাংলার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ছিল নবজাগরণের যুগ। বাঙালি সমাজে আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন, উন্নয়ন, সমন্বয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সাহিত্য চর্চার অগ্রযাত্রার সময়। এ পরিবর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন সুশিক্ষিত, মানবতাবাদী সমাজকর্মীদের একটি বৃহৎ শ্রেণি। প্রধানত তাঁদেরই প্রচেষ্টায় উভয় বঙ্গের বৌদ্ধ সমাজের নবজাগৃতির সূচনা ঘটে। তাইতো বলা হয়, বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার এবং ভাষা সাহিত্য ও দর্শন চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট সময় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তখন দু'বঙ্গের বৌদ্ধসমাজের বহু প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচনা করেন এবং অনুবাদকর্মসহ নানা সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বলতে গেলে প্রাচীন বাংলায় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্ভাবক ছিলেন এদেশের আদি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। এ দেশের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিতে আর্য উত্তর মৌর্য, গুপ্ত ও পালযুগের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলার পালযুগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সন্ধ্যাকার নন্দীর রামচরিত কাব্য সেসময় রচিত হয়। তবে পালযুগের জনপ্রিয় সাহিত্য ছিল শান্তিদেবের তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্য। পালযুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত

ছিলেন আচার্য শান্তিদেব ও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। (সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ২০০৩ : ১২৭)। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান সাধনার এক অমূল্য আকর। সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যা বা কবিতাই হলো বাংলাভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন।

আদি চর্যাপদ থেকে কালক্রমে বাংলা ভাষার প্রচলন হয়। সেকারণে সিদ্ধাচার্যগণ বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তার জনক হিসেবে পরিচিত। তাঁদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভাষা, জীবন ও জগৎ এবং দর্শনতাত্ত্বিক অভিব্যক্তি থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যের সূচনা হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কাব্যিক ছন্দে বিভিন্ন পদ রচনা করতেন। এসব পদ নিজেরা সুরারোপ করে সমবেতভাবে পথে প্রান্তরে নেচে গেয়ে শোনাতেন। তাঁদের রচিত এ গানগুলোই আধুনিককালে চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত। অতি সুখের বিষয় যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিংশ শতকের প্রথম পাদে ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে এই চর্যাপদগুলো (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) আবিষ্কার করেন। পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (Buddhist Mystic Songs), সুকুমার সেন, ড. আর্নল্ড বাকে, সৈয়দ আলী আহসান (চর্যাগীতিকা), অতীন্দ্র মজুমদার (চর্যাপদ) এবং মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন (পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী) চর্যাপদ ও সিদ্ধাচার্যের কাল্পনিক প্রতিকৃতি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন (জ্যোতিপাল মহাথের, ১৯৯০ : ৫)।

বলা হয়ে থাকে বাংলা গানের এক সমৃদ্ধ উপাদান কীর্তন। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মতে, চর্যাপদগুলোই বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বাংলা সাহিত্য ও বৌদ্ধ প্রভাব প্রবন্ধে লিখেছেন, "বৌদ্ধ চর্যাপদ ও দোঁহার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় মেলে।" পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির লিখেছেন, "বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাগীতি ও দোঁহাবলি সাহিত্য রচনা করে বাংলাভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন।" রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, দুর্লভ মল্লিকের গোপীচাঁদের গীত, ময়নামতির উপাখ্যান এবং বিভিন্ন লেখকের মঙ্গলকাব্যগুলো রচিত হয়ে বাংলা ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় দেশে তান্ত্রিক, সহজিয়া প্রভৃতি ধর্মের প্রভাব গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। (নালন্দা, ২০০১ : ৪)।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদ রচনার উত্তরকাল থেকে আধুনিককালে বৌদ্ধদের সাহিত্যের বিচরণের ক্ষেত্রই হলো বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যের নবপ্রভাত। তাই সে সময়কালের এই ধারাবাহিকতায় এখনো এখানকার বৌদ্ধরা বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। একথা সকলের জানা যে, বাংলাদেশে পাল, খড়্গ, দেব এবং অন্যান্য সমসাময়িক রাজবংশের শাসকগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বজুড়ে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। শিক্ষানুরাগী বৌদ্ধ পালরাজা ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমপুর, জগদ্দল (রাজশাহী) এবং পণ্ডিতবিহার (চট্টগ্রাম) তথা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন এ সব বিদ্যায়তনে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষার্থী ও বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতগণ এসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন।

স্মর্তব্য যে, নালন্দা এবং ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার ভিক্ষু-শ্রামণ ও দেড় হাজার আচার্য একত্রে আবাসিকরূপে অবস্থান করতেন। মহীপাল ও জয়পালের সময় বিক্রমশীলা ও সোমপুরী বিহার প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ছাড়া হলুদ বিহার, রাজা ভবদেব প্রতিষ্ঠিত ময়নামতি শালবন বিহার, বগুড়ার ভাসু বিহার, ত্রৈকুট বিহার প্রভৃতি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার উচ্চ পীঠস্থান। পাল রাজত্বের শেষ যুগে নালন্দার পর চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। (আলী ইমাম, ১৯৯৬ : ১৩)। এ বিহারে অধ্যয়নের জন্য চীন, তিব্বত, সিংহল, জাভা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অনেক শিক্ষার্থী আসতেন। মহীপালের সময়ে পণ্ডিতবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য প্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপা বা তিলপাদ)। (ভিক্ষু সুনীথানন্দ, ১৯৯৫ : ৪৮)। পাল রাজত্বের সময় "অষ্টসহস্রিকা" মহাযানী ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত পবিত্র রত্নাকার গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। পালরাজা ও সমসাময়িক রাজন্যবর্গ মহাযান ধর্মের অনুসারী ছিলেন বটে, কিন্তু তারা মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্র যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই খ্রিঃ ১০ম-১২শ শতকে রচিত বৌদ্ধ চর্যাপদ ও দোঁহাকোষ গভীর ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুভূতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।

বর্তমান বিশ্বে বাংলা এক সমৃদ্ধ ভাষা। এটি আজ বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলা ভাষার এ বন্ধুর পথযাত্রায় যাঁদের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয় তাঁরা 'চৌরাশি সিদ্ধা'খ্যাত বৌদ্ধতান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য। তাঁরা দোঁহা, গীতিকা ও সাধনভূমির গ্রন্থাদি প্রণয়ন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহান ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সময়ে পণ্ডিত শীলভদ্র, শান্তিদেব, শান্তিপাদ, কমলশীল, সরোরুহ বজ্র (পদ্মবজ্র), শান্তরক্ষিত, কুক্কুরিপাদ, শবরীপাদ, নাগবোধি, জেতারি, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, প্রজ্ঞাভদ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা প্রমুখ বাঙালি বৌদ্ধপণ্ডিতগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ তথা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কালচক্রের নিষ্ঠুর আবর্তে এই মহামনীষীদের অধিকাংশ গ্রন্থ হারিয়ে গেলেও তাঁদের জীবনচর্চা, আদর্শ ও কর্ম কৃতিত্ব আজও আমাদের এবং অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের পথের দিশারী হয়ে থাকবে।

অতীত ও বর্তমান সময়কালে মূলত বৌদ্ধরাই ধ্যান-সমাধি এবং বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চায় অধিক অগ্রসরমান ছিলেন; মূলত তাঁরাই ধ্যান ও জ্ঞানের নানা বিদ্যায় পারদর্শী এবং শিক্ষা দীক্ষায় চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। এ সময়ে পঞ্চবিদ্যা পাঠের ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চবিদ্যা পাঠ হলো- ১. শব্দবিদ্যা- ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব, ২. শিল্পস্থানবিদ্যা-শিল্পবিদ্যা ও কারুশিল্প, ৩. চিকিৎসাবিদ্যা রোগ নিরাময়শাস্ত্র, ৪. হেতুবিদ্যা-যুক্তিবিদ্যা, ৫. অধ্যাত্মবিদ্যা-দর্শনশাস্ত্র ও অধিবিদ্যা। তারই ধারাবাহিকতায় এবং পরম্পরায় বর্তমান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও বৌদ্ধরা বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থ রচনায় সেই ধারা বহাল রেখেছেন এবং সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে চলেছেন।

পূর্বেই বলেছি, প্রাচীন কাল থেকে অবিভক্ত বঙ্গে তথা বাংলাদেশে পালিভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ ছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী, পাল শাসনামলে। এরপর খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে বৌদ্ধধর্মের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। মূলত পাল রাজত্বের অবসানে বাংলায় সেন বর্মণ শাসকগণ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের

ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তৎপূর্বে গৌড়রাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে তুর্কী আক্রমণ বৌদ্ধদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে চরম আঘাত হানে। তাদের আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত বিরাট পাঠাগার আগুনের লেলিহান শিখায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। (P.V. Bapat, 1997 : 389)। বিশ্ববিদ্যালয়টির শুধু পাঠাগার পুড়ে শেষ হতে প্রায় এক মাসেরও অধিক সময় লেগেছে। উল্লেখ্য এ বিশ্ববিদ্যালয় যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড, ইতালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় সবে মাত্র যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ কয়েক শতক বুদ্ধচর্চা স্তিমিত থাকার পর অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম জেগে ওঠে। বৌদ্ধদের পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চা ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

বৌদ্ধ ইতিহাস মতে, বৌদ্ধধর্ম বা হীনযানের বিবর্তন (৪২৮-২০০ খ্রিষ্টপূর্ব), হীনযান থেকে মহাযান (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০-৫০০খ্রিষ্টাব্দ), মহাযান থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে অর্থাৎ বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান (৫০০-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-এর পরবর্তী রূপান্তর এমনই যে আনুমানিক দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক (১১৫০ খ্রি.-১৮০০খ্রি.) পর্যন্ত বৌদ্ধতত্ত্ব ও কৃষ্টি ভারত বাংলাবাসীর প্রাত্যহিক ধর্মচর্চা এবং বুদ্ধ নামটি এদেশ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত উপাদান হতে বুদ্ধ বা 'বৌদ্ধ ভারত' সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তারই সমর্থনে বৌদ্ধ সাহিত্যিক উপাদানসমূহ প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয় পণ্ডিত Rhys Davids-এর Buddhist India গ্রন্থে। এ শতক থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ ব্যাপকভাবে পালি ভাষা, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ, আলোচনা ও গবেষণা করেন। তবে বাংলাদেশের বুদ্ধবাণী চর্চার স্বর্ণযুগ হলো ঊনবিংশ শতক। এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের পথপ্রদর্শক এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯১৯ শতকে ১৪তম লুইসের রাজদূত সিমন ডেলা লওবেরে (Simon de li lioubere) ফরাসি ভাষায় বুদ্ধের জীবন ও কিছু জাতক কাহিনি পালি থেকে অনুবাদ করেন। তখন থেকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বুদ্ধ ও বুদ্ধবাণীর কিছুটা ধারণা লাভ করেন।

বলতে গেলে ঐ দু'শ বছরের পূর্বে ও পরে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে যে সকল মনীষী আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir Willam Jonles) অন্যতম। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক কক্ষে উইলিয়াম জোন্সের সভাপতিত্বে ত্রিশজন সদস্যের উপস্থিতিতে "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" (Asiatic Society of Bengal) প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। সোসাইটির মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ কোম্পানির প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা। (সৌমিত্র বড়ুয়া, ২০০৫ : ১৫)।

এশিয়াটিক সোসাইটির ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত গবেষকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মদর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) ভারতীয় পণ্ডিত যিনি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রায় একশ বছর পর সভাপতি (১৮৮৫) নিযুক্ত হন।

১৮৭৮ সনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পুরাতত্ত্ববিদ রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সান্নিধ্যে আসেন। এ দু'জন পণ্ডিত প্রাচীন বৌদ্ধবিদ্যা পুনরুদ্ধারে অশেষ অবদান রাখেন। আঠারো শতকের শেষের দিকে উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপসহ সারা বিশ্বে বুদ্ধের জীবন, বাণী ও আদর্শকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছিল। বিশিষ্ট ইউরোপীয় পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার (F. Max Mullar) বুদ্ধবাণীকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং নিজেকে একজন বুদ্ধানুরাগী হিসেবে ঘোষণা করেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্রায়ন হটন হডসনের (Brian Houghton Hodson) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতি। তিনি নেপালি পণ্ডিত অমৃতানন্দের সহায়তায় হস্তলিখিত পুঁথিপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তিনি নেপাল থেকে তা এশিয়াটিক সোসাইটি, ফ্রান্সের বিবলিওথিকা ও লন্ডনের ইন্ডিকা অফিসের গ্রন্থাগারে প্রেরণ করেন। ফ্রান্সের প্রদত্ত পুঁথিপত্রের উপর ভিত্তি করে মনীষী ই. বার্নফ (E. Bornouf) বৌদ্ধধর্মের এক ইতিহাস লিখেন এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরিক সূত্র ফ্রান্স ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সময় ইংরেজ রেসিডেন্সির ডাক্তার রাইট (Doctor Wright) ফেলে দেয়া পুঁথিপত্র কুড়িয়ে নিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেন। এদিকে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত পুঁথিপত্রের এক সূচি তৈরি করেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তা The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থ নামে ১৮৮২ সালে প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি The Antiquities of Orissa, An Introduction to Lalita Vistara (১৮৭৭) ও অষ্টসহস্রিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক সী সী বেন্ডল (Prof. Bendle) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিপত্রের এক সূচি প্রকাশ করেন। তিনি 'শিক্ষা সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থখানিও অনুবাদপূর্বক প্রকাশ করেন। ফরাসি মনীষী সৈনার্ত 'মহাবস্তু অবদান", পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'স্বয়ম্ভু পুরাণ', বৌদ্ধ গ্রন্থসূচি (১৯০৫), বৌদ্ধগান-দোঁহাকোষ (চর্যাপদ ১৯০৭) এবং অধ্যাপক সিলভা লেভি (Prof. Silve Levi) 'সূত্রালংকার' গ্রন্থের ফরাসি অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। (জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, ১৯৯৯ : ১০৪-১০৫)।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক স্বর্ণালী অধ্যায়। ঐ শতকে বৌদ্ধিক জাগরণের সর্বব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বুদ্ধচর্চার নবযাত্রা সূচিত হয়। ঐ সময়ে পালি সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চা এবং বৌদ্ধ বিষয়ক নানা গ্রন্থ, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, জীবনীসহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতে মহামানব বুদ্ধের জীবন, বাণী এবং তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা নিয়ে রীতিমতো ব্যাপক চর্চা শুরু হয়, যার ভিত্তিমূলে ছিল বুদ্ধ এবং তার জীবন সাধনার সর্বজনীনতা। ঐ শতক জুড়ে বাঙালির চিন্তা চেতনা, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে সাহিত্য সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে বাংলার অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, "উনিশ শতক বাঙালির মননে ও চিন্তনে নাড়া দিয়েছিল। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত সেসময়ের ঐতিহ্যপন্থী চিন্তাধারা ও আন্দোলনগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে।" উনিশ শতকে বাঙালি রেনেসাঁসের ধারাগুলো হলো ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, বিদ্যাসাগর,

অক্ষয়কুমার প্রমুখের বামপন্থী চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন। বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও সাহিত্যের আশ্রয় করে এই আন্দোলনসমূহ বিকশিত হয়। বিশেষ করে বুদ্ধ জীবন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎকর্ষের প্রতি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগ্রত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে।

বিশিষ্ট গবেষক সুবোধরঞ্জন রায় বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের বুদ্ধচর্চার নব সূচনায় বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী বুদ্ধজীবনের সহনীয়তাই বেশি প্রেরণা যুগিয়েছিল। বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ক. মহামুনির ইহলৌকিক চিন্তা ভাবনা, খ. তাঁর জীবন কাহিনির সৌন্দর্য ও মাধুর্য, গ. কল্যাণধর্মী ও মানবতাবাদী দর্শন, ঘ. বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা, ঙ. ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, চ. প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় প্রেম প্রদর্শন ও অহিংসাবাণীর আহবান এবং ভারতীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এদেশের পণ্ডিত মহলকে প্রবলভাবে মোহমুগ্ধ করা প্রভৃতি।

এক কথায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখার লেখক, গবেষক, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সর্বসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত রচনা করেন 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' (১৮৮২); কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৮৩); গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধচরিত নাটক' (১৮৮৭); কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোক চরিত ও পরিশিষ্টে অশোক চরিত নাটক' (১৯৮৭); মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ কাব্য' (১৮৮৫); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯), ডাক্তার রামদাস সেনের 'বুদ্ধদেব তাঁর জীবন ও ধর্ম্মনীতি'(১৮৯২); বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'থেরীগাথা', কালীবর বেদান্ত বাগীশের 'শংকর ও শাক্যমুনি'(১৯০০); সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১); কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার 'জগজ্জ্যোতি' (১৮৯৭), শরৎচন্দ্র দেবের 'শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৯৮); ব্রজগোপাল নিয়োগীর 'মহাপরিনিব্বান সূত্র' (১৯০১); অম্বিকাচরণ সেনের 'বৌদ্ধধর্ম ও নিব্বান ধর্ম প্রবন্ধ' (১৯০৬-১৯১০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়।

ইতিহাস পর্যালোচনায় এবং গবেষণায় আবার এও দেখা যায় যে, পালি ও বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার সূচনা হয় এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে। বিশেষত উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষক পণ্ডিত মহলে ঔৎসুক্য হয়েছিল উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বুদ্ধের বাণীকে অবিকৃতভাবে রক্ষা করেছে। মহামতি সম্রাট অশোক থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী, তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেসময় দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে সংঘ নিয়ন্ত্রিত কঠিন আচার ও কৃচ্ছ্রতা পালনের থেরবাদী নিয়মবিধি বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ভারততত্ত্ববিদদের অগোচরে ছিল। এই বিদ্যার আবিষ্কার ও অন্বেষণের অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করেছিল আলেকজান্ডার চোমা ডি কোরাস (Alexander Csoma de Koros 1784-1842) এবং ব্রায়ান হটন হডসন (Brian Houghton Hodson 1880-1894)। তিব্বতি অনুবাদের বিশাল সংগ্রহ পর্যালোচনা করে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের প্রায় দশ হাজার পুঁথির সন্ধান দিয়েছিলেন আলেকজান্ডার চোমা। তিব্বত থেকে

তিনি ৩২০ টি তিব্বতি পুঁথির অনুলিপি তৈরি করে আনেন। সেক্ষেত্রে তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় উদ্ঘাটনে তাঁর অবদান অতুলনীয়। (সত্যজিৎ চৌধুরী, ১৯৮৪ : ২৩)।

আলেকজান্ডার চোমা ডি কোরাস তিব্বতি লেখা কঞ্জুর (Bkanhgyur) ও তঞ্জুর (Bsytanhgyur) থেকে ১৮৩৬-১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে 'শাক্যপুত্র গৌতম' নামে একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এদিকে মাইকেল জিন প্রামকোস ওরে (Mickel Jean Framcois Ozray) তাঁর গবেষণাকর্ম 'জার বুদ্ধউ (Zur Buddhow)' নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ প্যারিস থেকে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বস্তুত এ মূল্যবান সংগ্রহই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের আরো সুযোগ করে দেয়। ফলে পশ্চিমাপণ্ডিত ওইন্টারনিচ, ই. বার্নফ, ফৌজবল, এইচ. কার্ন. ওল্ডেনবার্গ, পৌজিন, রীচ ডেভিডস, ডব্লিউ. স্টিভ, মিস আই, বি হরনার, কে. আর নরমেন, তুচ্চি, কোন্‌জে, বেরেউ, ফাউলার, টমাস ম্যান, হেরম্যান হেসে, রোসেন বার্গ, ওভার মিলার, স্টেরভার্স্কি, এ.বি. কীথ, কুইন, গিবসন, থমাস বেস্টর গর্ডি, কর্নেল অলকট, গায়গর, ই লেমোট, এডুইন আর্নল্ড প্রমুখ গবেষকগণ প্রভূতভাবে পালি, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও ইতিহাস চর্চায় এগিয়ে আসেন। এতে বাঙালি বৌদ্ধরাও পালি ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ লেখার প্রেরণা লাভ করেন।

উল্লেখ্য, পালি বিশেষজ্ঞ টি ডব্লিউ রীচ ডেভিডস ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে পালি টেক্সট সোসাইটি (Pali Text Society of London) প্রতিষ্ঠা করে রোমান অক্ষরে পালি ত্রিপিটক ও ইংরেজি অনুবাদ, টীকা গ্রন্থ, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যেগুলো বর্তমানে বৌদ্ধ দেশসমূহে পালি ভাষা শিক্ষার একমাত্র আন্তর্জাতিক মাধ্যম। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যানুরাগী শরৎচন্দ্র দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি' আত্মপ্রকাশ করে। একই উদ্দেশ্যে মিশনারি প্রতিষ্ঠান 'তর্কালংকার মহাবোধি সোসাইটি' ১৮৯১ সালে বিশ্বব্যাপী কর্মতৎপরতা শুরু করে। অনাগারিক ধর্মপাল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চট্টগ্রাম জেলার প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ ও ঐতিহ্যের গ্রাম উনাইপুরা, সে গ্রামে জন্মজাত কৃপাশরণ মহাস্থবির ১৮৯২ সালে কলকাতায় 'বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন' স্থাপন করে বাঙালি বৌদ্ধদের পথিকৃৎ হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতমানের বৌদ্ধ সাময়িকী 'জগজ্জ্যোতি' তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গুণালংকার মহাথের ও সমন পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদনায় ১৯০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে ঐ শতাব্দীতে অবিভক্ত বঙ্গে তথা বাংলাদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধদের সামগ্রিক উন্নয়ন সমৃদ্ধিতে প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সংকলন করেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাঁরা পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চায় প্রথমে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে নোয়াপাড়ার ফুলচন্দ্র বড়ুয়া (ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ), আবুরখীলের রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), বৈদ্যপাড়ার নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-১৮৯৬), হোঁয়ারাপাড়ার অগ্রসার মহাথের (১৮৬০-১৯৪২), আবুরখীলের কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার (১৮৭০-১৯০৮) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে রচিত ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার বাংলা ভাষার প্রথম ও অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ 'থাদুথাং'; যেটি বর্মি ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদ করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। অনেকের ধারণা অজ্ঞাত লেখকের 'মঘা খমুজা'ই আধুনিক বাংলাভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ। (বেণীমাধব বড়ুয়া, ১৮৯২-১৯৯২ : ৯৯)। এর রচনাকাল আনুমানিক ১৮৫০ খ্রি.। আশা দাশও মনে করেন, প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে অজ্ঞাত লেখকের রচিত 'মঘাখংমৌজা' বাংলাভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ। তবে "বৌদ্ধ রঞ্জিকা" বাংলাভাষায় রচিত গৌতমবুদ্ধের প্রথম জীবনীগ্রন্থ, যেটি ১৮৯০ সালে রচিত হয়। (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ : ৩৬৫ এবং দাশ, ১৯৬৯ : ২৩০ ও ৬৪৯-পাদটীকা)।

ফুলচন্দ্র বড়ুয়া আরও যেই দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন তা হলো- পাদিমুখ (১৮৮০-পাতিমোক্ষ) ও বেশ্বন্তর জাতক। হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দি ও পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়ার পাদিমুখ (সূত্র সংকলন), ভিক্ষু পাতিমোক্ষও সে সময়ের বহু আলোচিত আদি গ্রন্থ। কাশী মুন্সীর সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থ গৃহী নিত্য কর্তব্য, উবস শীল (উপোসথ শীল) ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়।

সেসময় শরৎচন্দ্র বড়ুয়ার বৌদ্ধ পরিণয় (১৮৮২), বৌদ্ধ নীতিশিক্ষা (১৮৮৩), বৌদ্ধ মঙ্গল গ্রন্থ তিনটি সাড়া জাগিয়েছিল। তবে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে অভিধর্ম হতে অনূদিত ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়ার 'অভিধম্মার্থ সংগ্রহ' (১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের একটি সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ। এর আগে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বিষয় কোনো গ্রন্থ আর রচিত হয়নি। তাঁর কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল শ্রামণ (১৯৩১), নির্বাণ দর্শন, কর্মস্থান (১৯৪২) এবং চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস, মহাসতিপট্ঠান সুত্ত (অপ্রকাশিত) ও শিশু চিকিৎসা। ১৯০৫ সালে রচিত 'চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস' মূল্যবান গ্রন্থটিকে দেড়শো বছর পূর্বের বৌদ্ধধর্মের পরিচয় লাভের একটি অনন্য দলিল বলা যেতে পারে। ঐ সময়ে এ গ্রন্থগুলো অতি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মরাজ বড়ুয়া ছিলেন বহুগুণের অধিকারী, শক্তিশালী একজন দক্ষ লেখক।

বস্তুত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪) পালিভাষা, সাহিত্য শিক্ষাকল্পে ছ'বছর সিংহলে (শ্রীলংকায়) এবং তিন বছর শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ড) অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ভারততত্ত্ববিদ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন- "পালি ভাষায় তাঁর কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বাংলা সাহিত্যেই বা তাঁর চিরস্থায়ী দান কি তা বিচার করতে গেলে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সুত্ত নিপাতের' পদ্যানুবাদ 'সূত্র নিপাত'ই যথেষ্ট।" (বেণীমাধব বড়ুয়া, ১৮৯২-১৯৯২ : ১০২)। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে ধর্ম পুরাবৃত্ত (১৮৮৩), সুত্তনিপাত (১৮৮৭), সিগালোকবাদ (বঙ্গানুবাদ, ১৮৮৯), হত্থসার (১৮৯৩), শ্যামাবতী, জ্ঞানসোপান, মাতৃদেবী, সত্যসার প্রভৃতি। পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার পদ্যে রচিত অমূল্য গ্রন্থটি 'হত্থসার' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া এ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন, "'হত্থসার' পড়ে বাংলার বৌদ্ধ নরনারী তাদের অবশ্য নিত্য প্রতিপাল্য ধর্মের মহিমা ও উন্নত নৈতিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যতদিন 'হত্থসার' নামটি থাকিবে ততদিন ধর্মরাজের পুণ্যস্মৃতি বাংলার বৌদ্ধ সমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে।"

এরপর আর এক কবি প্রতিভা নবরাজ বড়ুয়ার (১৮৬৬-১৮৯৬) গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশে থেরবাদ প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল বৌদ্ধলংকার, নীতিরত্ন, প্রসেন্নজিতোপাখ্যান, প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা, অভিদানপ্পদীপিকা, বুদ্ধ পরিচয়, উবোকশীল, শিক্ষাসার, প্রকৃত সুখী কে এবং পালি ব্যাকরণ প্রভৃতি। ধর্মরাজ বড়ুয়া, নবরাজ বড়ুয়ার পূর্ববর্তী; কিন্তু দু'জনেই একজন চৌত্রিশ বছর বয়সে, অন্যজন উনত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের জীবন দীর্ঘ না হলেও বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে তাঁরা উভয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দু'জনই আদর্শ চরিত্রের, সদ্ধর্মে গভীর আস্থাশীলতার এবং গ্রন্থ রচনায় ও মহৎকর্মে উভয়েই লোকশিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯০৮) বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের অদ্বিতীয় কবি। তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর কাব্যিক গুণে সে সময়কার বড় বড় কবিরা বিমুগ্ধ হন। ইংরেজ কবি স্যার এডুইন আর্নল্ড বুদ্ধকে নিয়ে 'দি লাইট অফ এশিয়া' (১৮৭৯) এবং যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে 'দি লাইট অফ দি ওয়ার্ল্ড' (১৮৯০) নাম দিয়ে দু'খানি চরিতকাব্য লিখেছিলেন; সেই দু'টির প্রথমটি বাংলা পদ্যানুবাদরূপেই রচিত হয়েছিল নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' (১৮৯৫) বা চৈতন্য চরিত। ভগবান বুদ্ধ শুধু 'এশিয়ার আলো' এবং যিশুখ্রিষ্টই 'জগতের আলো' আর্নল্ডের এই তুলনাগত প্রভেদে ব্যথিত হয়ে কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া লিখেছিলেন, "বুদ্ধ শুধু এশিয়ার আলো নয়, বুদ্ধই জগতের আলো।" তাই তিনি 'জগজ্জ্যোতি' (১৯০৮) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং দি লাইট অফ এশিয়া চরিতকাব্যের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। কবি নিজের সম্পাদনায় বৌদ্ধ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর 'জগজ্জ্যোতি' কাব্য প্রকাশ করেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) তাঁর সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন, "সর্বানন্দ"! তুমি তোমার 'জগজ্জ্যোতি' লিখিবে জানিলে আমি আমার 'অমিতাভ' লিখিতাম না।" (জগজ্জ্যোতি, কলিকাতা : ২০৭)। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো শ্রী শ্রী বুদ্ধচরিতামৃত, পালি অভিধান, ঋষি সন্দর্শন ও বুদ্ধকীর্তন প্রভৃতি।

এ ক্ষণজন্মা কাব্যপ্রতিভার কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। এ সময়কার আর এক সংঘমনীষা ধর্ম ও সমাজহিতৈষী এবং পালি ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম গুণী লেখক ছিলেন অগ্রসার মহাস্থবির (১৮৬০-১৯৪৫)। তাঁর প্রধান গ্রন্থ হল 'বুদ্ধভজনা' (১২৫৫ মগাব্দ)। অপরাপর গ্রন্থগুলো হলো গাথাসংগ্রহ (১২৫৬ মগাব্দ), পালি শব্দসংগ্রহ (১২৬০ মগাব্দ), পালি-বাংলা অভিধান, পূজাবলী, ধম্মপদট্ঠকথা প্রভৃতি।

এ প্রসঙ্গে বাংলায় বুদ্ধকীর্তন এবং বৌদ্ধগান রচিয়তাদের নামও স্মরণ করতে হয় পথ প্রদর্শক হিসেবে। বৌদ্ধধর্মের জটিল ও দুরূহ তত্ত্বকথা সাধারণ মানুষকে বোঝানোর সহজ উপায় হলো বৌদ্ধ গান বা বৌদ্ধ কীর্তন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বা সহজিয়ারাই ছিলেন এর পথিকৃৎ। দেহতত্ত্ব, অসার, অনিত্য জীবন, এত মায়া মোহ কেন ইত্যাদি জীবনদর্শন ও অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় তারা পরিবেশন করতেন দ্বারে দ্বারে দোহার মাধ্যমে, গানের সুরে। ঐ পরম্পরা এগুলো পরবর্তীকালে নানা ধর্মে কীর্তন, ভজন, লালন, আউল, বাউল, ফকির দরবেশের গানে পরিণত

হয়েছে। বলতে গেলে বুদ্ধজীবন নাটক ও কীর্তনের সূত্রপাত ওখান থেকেই। বৈষ্ণব সাধুগণও এ পন্থী এবং মধ্যযুগের ধর্মসাধকেরাও এর দ্বারা প্রভাবিত। এজন্যই বৌদ্ধ সংস্কৃতকবি অশ্বঘোষ ভিক্ষু হয়েও গ্রামে গঞ্জে ধর্মীয় গান ও নাটক মঞ্চস্থ করে ঘুরে বেড়াতেন। মূলত বাংলায় বৌদ্ধগান ও অধ্যাত্ম গীতিগাথার ধারা বহু প্রাচীনকালের। ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির ইতিহাসে ঋক্‌বেদ ও সামবেদের পরই কিন্তু পালি থের-থেরীগাথার স্থান। এই গীতি-গাথাসমূহে তালপুট ও আম্রপালীর গাথাগুলো সুর, তাল ও লয়যুক্ত অধ্যাত্মভাবের গান হিসেবে পরিবেশিত হতো। পরবর্তীতে চর্যাপদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য যে সিদ্ধাচার্যগণ এ গান রচনা করেছেন। যোগ ও তন্ত্রসাধনা এবং বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা নিয়ে রচিত চর্যাপদের শ্লোকগুলো সহজিয়া বৌদ্ধভিক্ষুগণ গানের সুরে সরস জীবনের উপাদান ও অসামান্য বাণীরূপে প্রচার করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সেসময় কিংবা গত পঞ্চাশ-ষাট দশকেও কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালি বৌদ্ধগণের ঘরে ঘরে পঠিত হতো দিনের পর দিন, আর রাতের পর রাত। সেই ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের জন্য এবং বৌদ্ধভাবধারা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার বৌদ্ধ সমাজে বুদ্ধসংকীর্তন, বৌদ্ধগান ও নাটক রচনা আরম্ভ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সর্বানন্দ বড়ুয়া ছিলেন পথপ্রদর্শক যিনি শ্রী শ্রী বুদ্ধচরিতামৃতকে বুদ্ধকীর্তন ও বৌদ্ধগানের প্রথম বাংলা সুরে এনেছিলেন। হেফ মগধ (ঠেগরপুনি) সেসময় বেশ্বন্তর জাতকের কাহিনি অবলম্বনে এবং সেকালের যাত্রার ধরনে উইচান্দ্র নাটক লিখেছিলেন। আধুনিককালে তারই অনুকরণে কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি (মহামুনি পাহাড়তলি) পঞ্চাঙ্ক নাটক বেশ্বন্তর রচনা করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বম্ভর বড়ুয়া (আবুরখীল) অনেকগুলো 'বুদ্ধ সংকীর্তন' লিখেন যেগুলো মুদ্রিত হয়নি। ঐ সময়ে ব্রাহ্মসংকীর্তনের প্রভাবে বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী ও পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া কতকগুলো বুদ্ধ সংকীর্তন রচনা করেন। রাঙ্গুনীয়া গ্রামের গুরু দাস কবিরাজও দু'একটি সংকীর্তন রচনা করেন। অন্যদিকে কবিয়াল ফনী বড়ুয়ার কবিগীতি ও কবিতা ছিল বৌদ্ধ জাগরণের প্রতীক যেখানে দেশ, জাতি, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির চিন্তন ও মননের খোরাক পাওয়া যায়। তিনি বাংলার বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীলের সহযোদ্ধা ছিলেন।

অনুরূপভাবে মতিলাল তালুকদার গান ও কীর্তনযুক্ত নাটিকা 'শীলরক্ষিত' লিখেছিলেন। পাহাড়তলি নিবাসী মাস্টার মোহনচন্দ্র বড়ুয়া বুদ্ধের জন্ম, বিবাহ, সন্ন্যাস ও মারবিজয় এ চার স্তরে বিন্যস্ত করে স্বরচিত 'বুদ্ধ সংকীর্তন' গ্রন্থ ছাপিয়েছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গি ও সুর সমস্তই বৈষ্ণব ধরনের, বলতে গেলে অবিকল নিমাই সন্ন্যাসের মতো। ১৯৫০ ঐ সময়ের চট্টগ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে রচনাটি যাত্রার অনুরূপ মঞ্চস্থ করা হতো, সাড়াও পেয়েছিলেন যথেষ্ট।

বৌদ্ধ সঙ্গীতাচার্য (পাঁচখাইন) উপেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিভিন্ন সুরে ও রাগরাগিণীতে বৌদ্ধগান লিখেন। অনেকটা বাংলা থিয়েটারের অনুকরণে; তাঁদের রচিত কীর্তনগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও স্বস্তি এই যে শাক্যমিত্র বড়ুয়া (চট্টগ্রাম) প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীগণ এই সংকীর্তনের ধারাকে ধরে রেখেছেন। বৌদ্ধ ভক্তিমূলক গান ও সংকীর্তনের তাঁর বেশ কিছু ক্যাসেট রয়েছে যা খুবই ভাবগম্ভীর ও শ্রুতিমধুর। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাতকড়ি বড়ুয়া, মুক্তিবিকাশ বড়ুয়া ও সুবোধচন্দ্র বড়ুয়ার নামও উল্লেখযোগ্য। মুক্তিবিকাশ বড়ুয়া বৌদ্ধ

ভক্তিগীতিকে বাউল সংগীতের আঙ্গিকে রচনা করে 'বৌদ্ধ বাউল গান' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও বুদ্ধকীর্তন পরিবেশন করেন। খড়গপুর থেকে সুবোধচন্দ্র বড়ুয়া 'বুদ্ধপ্রশস্তি' নামে বৌদ্ধসঙ্গীতের অন্য একটি সংকলন এবং শিলিগুড়ি থেকে জ্ঞানজ্যোতি স্থবির 'সিদ্ধার্থচরিত' নামে পালাকীর্তন প্রকাশ করেন। বর্তমান সময়ে নিশীথা বড়ুয়াসহ অন্যান্যরা বেশ কিছু বুদ্ধ কীর্তনের সিডি বের করেছে, যা বেশ ভাল, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকমূলক।

রাঙ্গুনিয়ার বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ছিলেন মূলত কবি ও দার্শনিক। তিনি বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক গ্রন্থে কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (১৯৪৪), প্রতীত্যসমুৎপাদ, ধর্মপদ, রূপারূপ বিভাগ এবং উপোসথ সহচর প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় ব্রতী হন। অভিধর্ম পিটকের সারাংশ নিয়ে রচিত এবং আচার্য অনুরুদ্ধকৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ অভিধম্মার্থ সংগ্রহ গ্রন্থটি তাঁর চিন্তা ও মননের একটি চমৎকার দার্শনিক গ্রন্থ বলে বিবেচিত। তিনি বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং 'সংঘশক্তি' নামক বৌদ্ধ পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট এসব গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের (১৮৭৮-১৯৭০) মতো এত বড় পণ্ডিত, শীলবান, সুবক্তা, গ্রন্থপ্রণেতা সেই সমকালীন সমাজে ছিল অত্যন্ত বিরল। তিনি লেখক, অনুবাদক, অক্লান্ত কর্মী, সমাজ সংগঠক, সর্বত্যাগী সাধক এবং সমালোচকও ছিলেন। তিনি বাংলার বৌদ্ধধর্ম ও সমাজকে একশত বৎসর এগিয়ে দিয়েছেন। তদানীন্তন বার্মায় (মায়ানমারে) ১৯৫৪-১৯৫৬ ইংরেজিতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গীতির প্রেক্ষাপটে তথাকার সরকার তাঁর প্রজ্ঞা ও মেধার জন্য তাঁকে 'অগ্গমহাপণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে 'সংঘশক্তি' নামক বৌদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তিনি এটির জনক। ত্রিপিটক প্রচার প্রসারে এবং পালি ও বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় এর অবদান অতুলনীয়। তাঁর রচনা ও সম্পাদনায় সেই বৌদ্ধ মিশনপ্রেস থেকে নিম্নের গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়; যেমন- পালি পঠমো সিক্ষা, চট্টগ্রাম, ১৯১০; পাতিমোক্ষ আর্যসত্য পরিচয়, সতিপট্ঠান ভাবনা, রেঙ্গুন, ১৯৫১; ধম্মপদং, কলকাতা, ১৯৫৩; ধর্মপদং, ১৯৫৩; ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, ১৯২৮; দান মঞ্জুরী, ১৯২৪; রত্নমালা বিশোধন, কুড়ি সহস্রাধিক পালি-বাংলা অভিধান, মিলিন্দপ্রশ্ন (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৯৩১; খুদ্দক পাঠো, পালি কর্মবাচা, ১৯৪৮; থেরগাথা, ১৯৩৫; অঙ্গুত্তর নিকায় গাথা, ১৯১৯; সম্বুমিত্র, সংঘরাজ ধর্মধারী পূর্ণাচার চন্দ্র মোহন মহাস্থবির, ১৯১০; সদ্ধর্ম রঞ্জিকা, রত্নমালা বিশোধনী, ১৯২০; ষড়ায়তন সূত্র, ১৯৫৩; ছ-ছক্ক সুত্ত, গণক মোগ্গলান সুত্ত, বিসাখুপোসথ সুত্ত, বহু ধাতুক সুত্ত, সলায়তন বিভঙ্গ সুত্ত, বিসুদ্ধিমগ্গো (শীল নির্দেশ) Buddhism in Brief, 1935; সংযুক্ত নিকায়ো, ১৯৩৬; পুন্নাচারী ধর্ম্মাধারী জীবন চরিত (আচারিয়া চন্দ্রমোহন মহাস্থবির), লোকনীতি, ১৯৩২; তেলক্টাহ গাথা, ১৯১৯; বুদ্ধের যোগনীতি, কলকাতা, ১৯৫২; সুত্তদেসনা, ১৯৪৭; বিদর্শন ভাবনা, ধর্ম সংহিতা (৪খণ্ড), ১৯১৯-১৯২০; সুত্তনিপাত, বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়, ১৯৩৮; অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, কলকাতা, ১৯৫২; প্রবাস সুহৃদ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, ১৯৩১; আর্যসত্য পরিচয়, ১৯৫১; নারকীয় দুঃখ

বর্ণনা, ১৯৩০; প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতি, ১৯৫২; মহাসতিপট্ঠান ভাবনা, ১৯৫১; পালি পঠন শিক্ষা, ভিক্ষু কর্তব্য, ১৯২০; গৃহী কর্তব্য, ১৯১২ প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে মিশন প্রেসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তখন থেকে নিয়মিত প্রকাশনা কার্যগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন বোয়ালখালী থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামের স্বনামখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক নবরাজ বড়ুয়ার সহোদর।

ঐ সমকালের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বংশদীপ মহাস্থবির (১৮৮০-১৯৭১) বাংলা ভাষায় পালি সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি শুধু চীবরধারী শীলবান ভিক্ষু ছিলেন না, বরং পালি ভাষায়ও দক্ষ সুপণ্ডিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর ভূমিকা সম্বলিত তাঁর পালি সুবুত্তিক, কচ্চায়ন ব্যাকরণ (১৯৪০), বালাবতার (১ম ও ২য় খণ্ড, পুনঃ মুদ্রণ ১৯৯৫), পদমালা গ্রন্থগুলো সেকাল ও একালের উচ্চ শিক্ষার্থীদের পালি ভাষায় জ্ঞানাহরণের পথ সুগম করে দেয়। এছাড়া ধর্মসুধা, বুদ্ধভাবনা, প্রজ্ঞাভাবনা, ভিক্ষুপাতিমোক্ষ (১৯৩৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তাঁর সমসাময়িক চট্টগ্রামে জন্মজাত পণ্ডিত প্রবর জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির (১৮৮৭-১৯৭৪) পালি ভাষা ও শিক্ষার প্রসারে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর 'পালি প্রবেশ' (১৯৩৭) পালি ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে অসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত। এ গ্রন্থটি কলিকাতা, দিল্লি, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির পাঠ্যগ্রন্থ। এতে পালি বুত্তোদয় (ছন্দ প্রকরণ) সংযোজনে গ্রন্থটির মূল্য আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর ক'টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; যেমন- পালি বাংলা অভিধান, পাতিমোক্ষ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি উনাইনপুরা লংকারামে সংরক্ষিত আছে। তিনি শুধু একজন পালি ভাষাবিদ ছিলেন না, জীবনের সর্বাংশে বিদর্শন সাধকও ছিলেন। বলতে গেলে, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বংশদীপ মহাস্থবির, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির এ তিনজন মনীষী বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারে যেমন ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি পালি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁরা অবিভক্ত বঙ্গে পালি ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনাদি অনন্তকাল ধরে।

ভিক্ষু শীলভদ্র (১৮৮৪-১৯০৫) বুদ্ধচর্চায় আর এক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগে তিনি কম্বোডিয়ার অঙ্গোরবাত মন্দিরে উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহীনাম ছিল কমলকৃষ্ণ রায়। বুদ্ধবচনের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার ফলে তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। পালি ভাষায় যেমন তাঁর দখল ছিল তেমনি তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে দীর্ঘনিকায় (৩খণ্ড), থেরীগাথা (১৯৫৭), সুত্তনিপাত (১৯৪৮), ধর্মপদ, ধর্মচক্র প্রবর্তনসূত্র (১৯৫১), বাঞ্ছিতের সন্ধানে, বুদ্ধবাণী ও বৌদ্ধনীতি শিক্ষা প্রভৃতি। এ গ্রন্থগুলোর পাণ্ডিত্যে তিনি বৌদ্ধসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন, আগামীতেও থাকবেন। বৌদ্ধতত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮) ছিলেন এশিয়ার সর্বপ্রথম ডি.লিট। তিনি প্রতিথযশা বৌদ্ধতত্ত্ববিদ। সুনীতিকুমার পাঠক তাঁর বাংলাভাষায় বৌদ্ধসাহিত্যে (১৩৫১-১৪০০ বঙ্গাব্দ) এক বিহঙ্গম পরিচারণ প্রবন্ধে বলেন, 'ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যে ক'জন মনীষী ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে ভারত তথা বাংলাদেশের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া ছিলেন অগ্রগণ্য'।

(সুনীতি কুমার পাঠক, ১৯৯৫ : ৭৫)। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতি উদ্ধার করাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পালি সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সর্বক্ষেত্রে তাঁর বৌদ্ধিক জ্ঞান মানস, আর ইতিহাস অন্বেষা ছিল গবেষণামূলক। তিনি ১৮৮৮ খ্রিঃ ৩১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলি গ্রামে বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কালে এ বাঙালি মনীষীই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পালি ভাষা এবং বৌদ্ধধর্মের গবেষক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি অলংকৃত করেন। তিনি কৃপাশরণ মহাস্থবির এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টায় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর রীচ ডেভিডস ও মিসেস রীচ ডেভিডস এবং প্রফেসর এম ডব্লু টমাসের অধীনে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ভারত দর্শনের ওপর গবেষণা করে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ডি-লিট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি-লিট। এতে বঙ্গের বৌদ্ধসমাজ অত্যন্ত গৌরবান্বিত হয়েছিল। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'Indian Philosophy: its origin and growth from vedas to the Buddha'. এ গবেষণায় তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতীয় ধর্ম দর্শন প্রচারকদের মতবাদে অনেক নতুন তত্ত্ব সংযোজন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ গবেষণা গ্রন্থটি 'A History of Pre-Indian Philosophy' নাম দিয়ে ১৯২১ সালে প্রকাশ করে।

জ্ঞানচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, শিলালিপি, ভাস্কর্য, প্রত্নতত্ত্ব এবং বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে ইংরেজিতে ১৮টি গ্রন্থ, বাংলায় ৭টি গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকায় ইংরেজিতে ৮৬ টি প্রবন্ধ ও বাংলায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মৌলিক গবেষণা ও কৃতি মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি বাংলাভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এমনকি ত্রিপিটক গ্রন্থের অনুবাদকর্মও সম্পাদন করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো হলো - লোকনীতি (১৯১২), মনিরত্নমালা (১৯১৩), বৌদ্ধ গৃহীবিনয় (১৯১৩), মহাসতিপট্ঠান সুত্ত (১৯১৪), বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি (১৯২২), বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ, ১ম ভাগ (১৯৩৬), মধ্যম নিকায় ১ম খণ্ড (অনুবাদ ১৯৪০), ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ এন্ড হিজ গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৯৩৮), প্রাকৃত ধর্মপদ (১৯২১) প্রভৃতি। তিনি 'ইন্ডিয়ান কালচার', 'বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়া' ও 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

বেণীমাধব বড়ুয়ার ভূমিকা সম্বলিত শ্রীধর বড়ুয়ার 'বৌদ্ধবিদ্যাপীঠ (১৯৪০) শীর্ষক বৌদ্ধশিক্ষা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় একটি অমূল্য গ্রন্থ। এছাড়া বঙ্গাক্ষরে বাংলা ভাষায়, রচিত ও অনূদিত পালি, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কিত ব্যাকরণসহ নানা গ্রন্থগুলোকে বিভিন্ন ধারায় দেখানো যায়। যেমন- সৌরীন্দ্রমোহন মুৎসুদ্দির 'পালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়' এবং প্রজ্ঞালোক স্থবিরের 'মিলিন্দ প্রশ্ন ও স্থবির গাথা' এবং জ্যোতিপাল ভিক্ষুর 'উদান', মুনীন্দ্রপ্রিয় (প্রজ্ঞালোক) ভিক্ষুর 'মহাবর্গ', বংশদীপ মহাস্থবিরের 'কচ্চায়ন', 'বালাবতার' ও 'পাতিমোক্ষ' এবং আর্যবংশ ভিক্ষুর 'সুবোধালঙ্কার', দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ

মহাস্থবিরের 'ভক্তিশতক' গ্রন্থগুলো মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। বলতে গেলে ধর্মতিলক ভিক্ষুর 'সারসংগ্রহ' ও 'কায়বিজ্ঞান' এবং প্রজ্ঞালোক স্থবির কৃত 'গৃহী কর্তব্য', 'ভিক্ষু কর্তব্য', 'দান মঞ্জরী', 'ধর্ম সংহিতা' প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত গ্রন্থ। কবিধ্বজ গুণালঙ্কারের 'ধর্মপ্রসঙ্গ', কালীকুমার মহাস্থবিরের 'চন্দ্রকুমার জাতক', কবিরাজ তারকাবন্ধু বড়ুয়ার 'নাগলীলী' এবং বিমলানন্দ ভিক্ষুর 'বেশান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থগুলো তৃতীয় ধারার অন্তর্গত। প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর 'বুদ্ধের অভিযান', বংশদীপ মহাস্থবিরের 'প্রজ্ঞাভাবনা', সুবলচন্দ্র বড়ুয়ার 'নামরূপ', ধনঞ্জয় বড়ুয়ার 'কর্মফল' এবং জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের 'পালি প্রবেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধচর্চার চতুর্থ ধারার সাথে যুক্ত।

অন্যদিকে নারায়ণ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দি লিখিত এবং 'শনিবারের চিঠি'তে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের শ্যামল ও কজ্জ্বল গল্প বইয়ের সমালোচনা প্রভৃতি পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি রচিত 'বৌদ্ধনাটিকা', অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়ার 'পরশমনি' (ছোট নাটক), মোক্তার কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি প্রণীত বেস্‌সান্তর নাটক ও কবিতা এবং পণ্ডিত অনন্তকুমার বড়ুয়া রচিত 'সম্বোধি' শীর্ষক কবিতাটি রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া বি-এল, নিবারণচন্দ্র বড়ুয়া বিএ এবং পুলিনবিহারী চৌধুরী রচিত কবিতা, উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দির মাতৃভাষা ও মানবধর্ম, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের অন্ধের দৃষ্টি এবং জ্যোতির্মালা দেবীর (জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী) সন্ধানে, বিলাত দেশটা মাটির ও শকুন্তলার স্বপ্ন এই তিনটি উপন্যাস ষষ্ঠ ধারার অন্তর্গত। বিদ্যাবিনোদের অন্ধের দৃষ্টি বস্তুত তাঁর আত্মজীবনী; এতে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য অল্প। জ্যোতির্মালার কবিতাগুলোর কল্পনা, বর্ণনা, ভঙ্গি যেমন সুন্দর, তেমনি ভাবগুলো কেমন জানি অস্পষ্ট।

একটি কথা বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে যে, পাল আমলের চারশত বছরে বৌদ্ধ সাহিত্য, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির যেই আভা ও গৌরবনীয় অধ্যায় ছিল মাঝখানে দীর্ঘকাল নিভে গেলেও পরবর্তীতে আবার জাগৃতির আলো ছড়ায় অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমে। ঐ থেকেই বাংলার বৌদ্ধসমাজে এবং বুদ্ধভক্ত বাঙালিদের মনে বুদ্ধ বিষয়ক চিন্তার অনেক বিকাশ ঘটে। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ বাঙালির জনজীবন ও সংস্কৃতিকে করেছে বহুভাবে প্রভাবিত। এরই প্রেক্ষিতে এপার ওপার দুই বাংলার গবেষক, অধ্যাপক, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও প্রাজ্ঞ স্থবির মহাস্থবিরগণ পালিভাষা ও সাহিত্য এবং বৌদ্ধধর্ম চর্চায় সমান আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এমন কি ভারতীয় বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্র চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রামদাস সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, বিমলা চরণ লাহা, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শরৎকুমার রায়, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালীদাস রায়, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, কৃষ্ণবিহারী সেন, মহাকবি নবীন সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাংলাভাষায় বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রাচীন বিদ্যা, পালি ভাষা সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, বৌদ্ধ শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে

সাহিত্য, কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি রচনা করে বৌদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেনও। এও উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধবিদ্যা সাহিত্যের শিক্ষাবিদ ও গবেষক নন, অথচ তাঁদের লেখনীতে বৌদ্ধ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনসহ নানাবিধ বুদ্ধজীবন চর্চা সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তবে এ কাজে যাঁরা নিবেদিত তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বা পরিসরে কাজ করেছেন। সকলের চিন্তা-লেখনী একই পর্যায়ে ছিল না, হওয়ার কথাও নয়। সাহিত্যকর্ম একদিকে স্থবির কিংবা বন্ধ্যা হয়ে থাকে না। লেখকদের নানা চিন্তায় এ সকল ক্ষেত্র বা বিষয়সমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে। রচনায় ভিন্নতা কিংবা ভিন্নমাত্রিকতা না থাকলে সেই রচনা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। সুতরাং সাহিত্যের এ বিষয়গুলোকে এভাবে দেখানো যেতে পারে। যেমন- ১. গদ্য ও পদ্য অনুবাদ, ২. অপর গ্রন্থের সংক্ষেপ কিংবা বিস্তার, ৩. সংগ্রহ, ৪.বিবিধ ব্যাখ্যা ও সন্দর্ভ, ৫. প্রতিবাদ ও সমালোচনা এবং ৬. মৌলিক রচনা। ঐ সব লেখক, গবেষক, কবি ও সাহিত্যিকদের হাতে উক্ত বিষয়গুলো পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সর্বতোভাবে।

ঐ দু'শবছরে বিশেষ করে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে এ সকল বিষয় নিয়ে আরও যে সকল বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- মহানায়ক অগ্রসার মহাথেরো (১৮৬০-১৯৪৫) (পূর্বগুজরা হোয়ারপাড়া সুদর্শন বিহার), পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (আবুরখীল), পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া (বৈদ্যপাড়া), কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬), সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৩৮-১৯২৭), সংঘনায়ক ধর্মদর্শী মহাথের, সমন পুন্নানন্দ স্বামী (১৮৭০-১৯৩১), রাজগুরু ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির (১৮৬৪-১৯৫৫), অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির (১৮৭২-১৯৩৯), ডা. ভগীরথ বড়ুয়া (১৯৫৬-১৯০৪), আচার্য পূর্ণাচার ধর্মধারী চন্দ্রমোহন (১৮৭৭-১৯০৮), বিমলানন্দ মহাস্থবির (১৮৮১-১৯৪৯), প্রজ্ঞানন্দ স্থবির (১৮৯৫-১৯৬১), বুদ্ধপ্রিয় ভিক্ষু (১৮৮০-১৯৬৫), গুণালংকার মহাথেরো (১৮৯০-১৯৬৩), ধর্মরত্ন মহাস্থবির (১৮৯৩-১৯৬৭), দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির (১৮৯৫-১৯৮৭), ধর্মতিলক মহাস্থবির (১৮৯০-১৯৪৩), পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯০১-২০০১) প্রমুখ কৃতিগণ।

অন্যদিকে সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির (১৯০০-২০০০), জিনরতন মহাস্থবির, জিনবংশ মহাস্থবির (১৯০০-১৯৯০), ধর্মকীর্তি মহাথের (সিংহলি হলেও বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী), আনন্দমিত্র মহাথের (১৯০৮-১৯৯৯), ধর্মপাল মহাথের (১৯২৫-২০০৯) (ভারত), আর্যবংশ মহাথের (১৯১৫-১৯৯৪), জ্ঞানলোক মহাথের (ভারত), দার্শনিক প্রিয়ানন্দ মহাথের (১৯২৩-২০০০), অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী (১৯১৪-১৯৮৯), শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (১৯০৪-১৯৯৭), বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির (১৯০৩-১৯৯৮), বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির (১৮৯৫-১৯৮৭), শান্তপদ মহাস্থবির (১৯১৫-১৯৮৭), সুগতবংশ মহাস্থবির (১৯১০-১৯৯৮), ভিক্ষু শীলভদ্র (১৮৮৪-১৯০৫), কবিরত্ন প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, ড. বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির, অমৃতানন্দ মহাথের, প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, জ্যোতিপাল মহাথের (১৯১৪-২০০২), সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের (১৯০৯-১৯৯৪), ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের (১৯৩০-২০০৮) প্রমুখের নাম গৌরবের সাথে উচ্চারিত হয়।

গৃহীদের মধ্যে আরও কৃতবিদ্য অধ্যক্ষ প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়া (১৯১৮-১৯৯৪), প্রফেসর ললিতকুমার বড়ুয়া, প্রফেসর সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া, প্রফেসর রণধীর বড়ুয়া (১৯১৮-১৯৮৮), প্রফেসর ড. রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া (১৯৩৩-১৯৯০), ড. অরবিন্দ বড়ুয়া (১৯০২-১৯৭৫), গিরীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (১৮৯১-১৯৬০), শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (১৯০৭-২০০১), নীলাম্বর বড়ুয়া (১৯১৫-১৯৯১), ড. জিনানন্দ ভিক্ষু (১৯১০-১৯৮৯), ভিক্ষু অনোমদর্শী (জন্ম: অজ্ঞাত-১৯৭৯), শাক্যবোধি মহাস্থবির, অধ্যাপক মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া (১৮৯৮-১৯৮৩), উকিল উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি (১৮৮১-১৯৬৫) প্রমুখ পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদের নামও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

অন্যদিকে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী (১৯০৬-১৯৭৯), শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৮৯-১৯৫৩), কবিয়াল ফণী বড়ুয়া (১৯১৩-২০০১), বিজয়কৃষ্ণ বড়ুয়া (১৯২৭-?), সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া (১৯১৯-১৯৯০), ড. দীপক কুমার বড়ুয়া (১৯৩৮-), ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, ড. সুকোমল চৌধুরী (১৯৩৯-)সহ অনেকে বৌদ্ধ সাহিত্য সাধনায় এবং গবেষণায় নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। পালি শিক্ষার প্রসারে নীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দি, ভুপেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি (১৯০৬-), লোকেন্দ্রলাল বড়ুয়া, নতুনচন্দ্র বড়ুয়া (১৯০৪-১৯৮৫), নীলাম্বর বড়ুয়া (১৯১৫-১৯৯১) প্রমুখ শিক্ষকগণ পালি পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অনুবাদ গ্রন্থ লিখে শিক্ষার্থীদের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা পালিসহ বৌদ্ধবিদ্যার (বুড্ডিস্ট স্টাডিজ) অনুশীলন ও পঠন পাঠনের সুযোগ পেয়েছে। বৌদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় ভূমিকা রেখেছেন সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া (১৯২১-১৯৭০), অধ্যক্ষ জ্যোৎস্নাবিকাশ চৌধুরী (১৯৩৬-২০০১), অরুণবিকাশ বড়ুয়া (১৯৪১-১৯৯৫), ডা. সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া (১৯৪৪-২০০৪), জগতজ্যোতি বড়ুয়া (১৯৫২-১৯৯৯), সাহিত্যিক বিমলেন্দু বড়ুয়া (১৯৩৩-২০০৬) প্রমুখ আরো অনেকেই। তাঁরা পালিভাষা, সাহিত্য চর্চা, গবেষণা, ত্রিপিটকের গ্রন্থ অনুবাদ, রচনা, সম্পাদনা ও সদ্ধর্ম প্রচার প্রসারে এবং মানব কল্যাণে অশেষ অবদান রেখে গেছেন। পরবর্তীতে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সংঘরাজ ধর্মসেন মহাথের (১৯২৮-২০২০), সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের (১৯৩৩-২০১২), পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের (১৯৩০-২০১৯), অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির (১৯৪০-২০২০), সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের (১৯২৮-২০২০), রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের, ড. শাসন রক্ষিত মহাথের (১২৮৯ শকাব্দ/১৯২৯-২০১২), সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) (১৯২০-২০১২), ড. সত্যপাল মহাথের (বুদ্ধগয়া), ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু প্রমুখ পণ্ডিত ভিক্ষুগণ। প্রকৌশলী বিদর্ভরঞ্জন বড়ুয়া (১৯০৪-১৯৮১) বৌদ্ধদের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থের লেখক, গ্রন্থটির নাম 'যন্ত্র আবিষ্কার পরিচিতি'। তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাহাড়ী মালঞ্চ, ভারত মালঞ্চ ও পীলগ্রিমস্ পোয়েমস্ ইত্যাদি। ১৯১১ সালে জন্ম গ্রহণকারী নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া পেশাগতভাবে সিভিল সার্ভিসের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখালেখি বন্ধ হয়নি। তাঁর লেখাগুলো সে সময়কার নালন্দা, দেশ, উদ্বোধন, সংঘসাথী, সংঘশক্তি, জয়গুরু ও জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত হতো।

বর্তমান শতকে এপার-ওপার বাংলায় ভিক্ষুদের মধ্যে এখনো যাঁরা সাহিত্য চর্চা ও লেখালেখিতে আছেন বা পূর্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের

(১৯৪০-), উ. পঞ্ঞাজ্যোতি থের, ভদন্ত রতনজ্যোতি মহাস্থবির (মোহনপুর, পশ্চিমবঙ্গ), আচার্য ভিক্ষু করুণা শাস্ত্রী (আসাম), ড. করুণানন্দ থের, ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাস্থবির (কলকাতা), ড. বোধিপাল ভিক্ষু (কলকাতা), ভদন্ত বিনয়শ্রী মহাস্থবির (শান্তি নিকেতন), ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাস্থবির (পশ্চিমবঙ্গ), ধুতাঙ্গ সাধক প্রজ্ঞাবংশ থের (আমেরিকা), ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু (বুদ্ধগয়া), ড. সংঘপ্রিয় থের, ড. জিনবোধি থের, ড. রতনশ্রী ভিক্ষু, ভদন্ত উপানন্দ থের, ড. জ্ঞানরত্ন থের, ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, ড. সুমনাপাল ভিক্ষু (কলকাতা), শীলরত্ন প্রমুখ ভিক্ষুগণ। আর গুণী লেখক সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁরা ছিলেন এবং এখনও আছেন তাঁরা হলেন- সাংবাদিক ডি পি বড়ুয়া, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (কলকাতা), ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, ড. প্রণবকুমার বড়ুয়া, ড. সুকোমল বড়ুয়া, ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, অধ্যাপক বাদলবরণ বড়ুয়া, ড. রণজিত কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া, ড. তপনজ্যোতি বড়ুয়া, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া (চ.বি.), সাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া, সাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া, ছড়াকার সুজন বড়ুয়া প্রমুখ কৃতি লেখকগণ।

বাংলা ভাষায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধ বিষয়ক রচনা ও সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন

স্মর্তব্য যে, অবিভক্ত বঙ্গের বাঙালির কাছে চৌদ্দ'শ সালের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতির পরিচয় কেবল ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সম্বল নয়, বরং দু'বঙ্গের বাঙালির গৌরবময় সোনালিকাল পর্বের রত্নবিশেষ। তাই বারো'শ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধসাহিত্য, শিল্প, পুরাতত্ত্ব, কৃষ্টি, সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ ও উনবিংশ এ দুই শতকের বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ বাঙালির জনজীবন ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে। এ দুই শতাব্দীকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বুদ্ধের জীবনকথা বা বুদ্ধ শিষ্য-শিষ্যদের কাহিনি ও জীবনকথা, বুদ্ধের আদর্শ, উদারতা, মানবতা, বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব মৈত্রী, অহিংসা মতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধভক্ত লেখক, পাঠক, গবেষক ও সুধীজন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

এসব লেখায় লেখকগণ ব্যক্তিগত জাত-পাত, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র এবং ধর্ম ও ধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে অধিকভাবে বৌদ্ধ চেতনায় ঋদ্ধ হন। তাঁদের মননশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থরচনা বাংলা সাহিত্যের দিকদর্শন, বুদ্ধচর্চার নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায় এবং বৌদ্ধ চিন্তাচেতনার সার্থক প্রতিফলন ঘটে। অতএব আজ স্পষ্ট যে, বৌদ্ধ বিষয়ক রচনাসমূহ কেবল অতীতকালের গৌরবগাঁথা নয়, বরং আধুনিক তথা সাম্প্রতিক জগতের সমকালীন বিষয়বস্তুও বটে। সেদিক থেকে বিচার করলে বৌদ্ধ বিষয়ক রচনাসম্ভারসমূহ দু'শত বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে বহুমুখী বিস্তার লাভ করেছে নিঃসন্দেহে। এছাড়া জন্মগতভাবে বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মানুসারী নয়, অথচ বৌদ্ধ বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের বুদ্ধ ও বৌদ্ধিক চিন্তা এবং পালি ও বৌদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা আমাদের সাহিত্য জগতকে আরও বেশি করেছে আলোকিত। এ মূল্যায়নকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; ১. প্রগতিশীল চিন্তাধারার লেখক-লেখিকা, সাহিত্যিক-গবেষক কিংবা

বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে রচনাসমূহ এবং ২. সংস্কৃতিসেবী, সংগঠক, প্রাচীনবিদ্যা প্রেমী ও বিদর্শন সাধকদের সাহিত্য সম্ভারসমূহ।

এছাড়া প্রায় শতবছরেরও পূর্বকাল থেকে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে ভিক্ষু ও গৃহী যাঁরা বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে লিখেছেন এবং ১৯৪৭ ভারত-বাংলা বিভক্তি কিংবা স্বাধীনোত্তর অর্থাৎ ১৯৭১ এর পর থেকে যে সকল বৌদ্ধ লেখকের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এখনো লিখে চলেছেন তাঁদের রচনাবলিকে প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে বিভাজন করা যায়; যথা : (১) ধর্মীয় ও বৌদ্ধ সমাজজীবন বিষয়ক লেখক। এ ধারার লেখকগণ সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, বৌদ্ধ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, বৌদ্ধ জাতীয় সমস্যা ও বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী লিখেছেন; (২) গবেষণা বিষয়ক লেখক, যাঁরা তত্ত্ব ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক, তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সাহিত্য ও বৌদ্ধবিদ্যার নানা বিষয়কে গবেষণাসমৃদ্ধ করে মৌলিকত্বের প্রমাণ দান করেন; (৩) সার্বজনীন: এ শ্রেণির লেখকদের জীবন-জিজ্ঞাসা কোনো ধর্ম নয়; এদের জীবনানুভূতি ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বাইরে। আপামর জনসাধারণের পাঠযোগ্য গ্রন্থই তাদের বিষয়বস্তু, যেমন- গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, নৃত্য ও গান বিষয়ক রচনাবলিকে আলোচ্য ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে; (৪) পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ বিষয়ক লেখক যাঁরা নানা সময়ে গ্রন্থ রচনা করেন, অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন এবং (৫) মিশ্র ধারার লেখক অর্থাৎ ধর্মীয় ও সার্বজনীন ভাবধারার সমন্বয়ে এ ধারার লেখকবৃন্দ তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন এবং অনেকে তা এখনো অব্যাহত রেখেছেন। (শিশির বড়ুয়া, ১৯৯৯ : ৩১)।

স্মর্তব্য যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ধর্মীয় ও সার্বজনীন এ দু'ধারার লেখক ছিলেন সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন- অনিল বড়ুয়া (উপন্যাস), অমিতাভ বড়ুয়া (উপন্যাস), উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, কিরণচন্দ্র মুৎসুদ্দি (মাস্টার), অধ্যক্ষ প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়া, অশোক বড়ুয়া, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, ড. রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া, অধ্যাপক মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়াসহ আরো অনেকে। উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া (উপাধি প্রাপ্ত লেখক), অনিল বড়ুয়া, অমিতাভ বড়ুয়া ও বিশ্বেশ্বর চৌধুরীকে সার্বজনীন লেখক বলা যায়। অশোক বড়ুয়া, সুগত বড়ুয়া, ড. সুনন্দা বড়ুয়া, শিশির বড়ুয়া হলেন মিশ্র ধারার।

ভাষা-সাহিত্য-গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতি লেখায় ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়া, অপু বড়ুয়া, দর্পণ বড়ুয়া, দীপক বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়াকে চিহ্নিত করা যায় সার্বজনীন লেখক হিসাবে। অনুরূপ লেখক জগদানন্দ বড়ুয়া, ডা. সুরেশচন্দ্র বড়ুয়া, জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া, বিমলেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ লেখকগণের লেখার মধ্যে দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও জীবনী; তৎসঙ্গে ভ্রমণ কাহিনীও। তাই তাঁদেরকেও মিশ্রধারার লেখক বলা যায়। ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, সুব্রত বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়া প্রমুখ বরেণ্যগণ জাতীয়ভাবে বহু পদক, পুরস্কার ও সম্মাননাপ্রাপ্ত জাতীয় লেখক; অন্যরা বৌদ্ধধারার লেখক, যেমন- অধ্যাপক মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘ কর্তৃক সাহিত্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। বিশেষ করে বৌদ্ধ সমাজের লেখক ও সাহিত্যিকগণ বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বেশি লেখালেখি

করেন, এখনো এসব বিষয় নিয়ে লিখে চলেছেন। অন্যদিকে বৌদ্ধ সমাজের উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন - কবি ফুলচন্দ্র বড়ুয়া, পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া, রামচন্দ্র বড়ুয়া, কবি ধনঞ্জয় বড়ুয়া, কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া, কবি বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, বিমলবিনোদ বড়ুয়া, শশাঙ্কমোহন বড়ুয়া, গৌতমপ্রসাদ বড়ুয়া, সুবোধচন্দ্র বড়ুয়া, নির্মলচন্দ্র বড়ুয়া, মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া, জ্যোতির্মালাদেবী চৌধুরী। এছাড়া অন্যান্য আরও যাঁরা কবিতা, ছড়া ও কাব্য চর্চা করেছেন তাঁরা হলেন- নিরঞ্জন প্রসাদ বড়ুয়া, বিমলেন্দু বড়ুয়া, কবি অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, অরূপরতন চৌধুরী, অলককুসুম বড়ুয়া, সঞ্জীব বড়ুয়া, অরুণবিকাশ বড়ুয়া, উৎপলকান্তি বড়ুয়া, ধনিরাম বড়ুয়া, সুপলাল বড়ুয়া প্রমুখ।

অতএব সার্বিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বৌদ্ধ শাস্ত্র তথা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক রচনাগুলো যাঁরা ধর্ম-বর্ণ-গোত্রে অবৌদ্ধ অথচ বৌদ্ধ চেতনায় ঋদ্ধ এসব লেখক-গবেষকদের হাতে তাঁদের ঐ সকল রচনাগুলোকে নানা পর্যায়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে;

যেমন: ক. বুদ্ধ ও তৎকালীন জীবনচর্যায় কল্পচিত্র সম্পর্কিত। যেমন-কৃষ্ণকুমার মিত্রের বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত সার (১৮৮৩), সাধু অঘোরনাথের শাক্যমুণি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব (১৮৮২), শরৎচন্দ্র দেবের শাক্যমিত্র প্রতিভা (১৮৮৮), শরৎ কুমার রায়ের বুদ্ধের জীবন ও বাণী (১৯১৪), শ্রী নীলকমল দাসের বৌদ্ধরঞ্জিকা (১৮৯০), অরুণকান্তি সাহা রচিত ও কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত অমিতাভ বুদ্ধ, সাহিত্যিক আবুল ফজলের মানবপুত্র বুদ্ধ, হারম্যান হেসের সিদ্ধার্থ, উ নু রচিত ও হেরম্বচন্দ্র অনূদিত বুদ্ধ, দীপ্তি ত্রিপাঠীর হে অনন্তপুণ্য, উত্থানপদ, বিজলী ফিরে এলো, কানাইলাল হাজরার আদিবুদ্ধ (১৯৯৩), কালীদাস রায়ের তথাগত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বুদ্ধদেব (১৯৫৬), কৃষ্ণবিহারী সেনের বুদ্ধদেব চরিত (১৮৯১), অশোক চরিত (১৯৮৭), মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বুদ্ধচরিত, চারুবসুর অশোক বা প্রিয়দর্শী (১৯১১), গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব চরিত (১৮৮৭), অশোক (১৯১১), জীবনকৃষ্ণ শেঠের কাব্যগ্রন্থ বুদ্ধ তথাগত, মনোরঞ্জন রায়ের গৌতম বুদ্ধ (১৯৫৭), মণি বাগচীর গৌতমবুদ্ধ (১৯৫৭), মহেশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধ প্রসঙ্গ (১৯৫৭), রমানাথ সরস্বতীর বুদ্ধদেব চরিত (১৯৮০), যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর শ্রী শ্রী বুদ্ধ ও যশোধরা (১৯৫৭), রাধা গোবিন্দ বসাকের মহাবস্তু অবদান (৩ খণ্ড, ১৯৬৩-১৯৬৮), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গৌতম বুদ্ধ, চিত্রা দেবের বুদ্ধদেব দেখতে কেমন ছিলেন, শান্তি প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের বুদ্ধ তথাগত, ড. আশা দাশের জাতকে রামকথা ও ভারত কথার স্বরূপ সন্ধান (১৯৯৪), জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোকসাহিত্য (১৯৯৫), বুদ্ধ পদামৃত মাধুরী, অমূল্য সেনের বুদ্ধকথা, ধীরেন্দ্রনাথ ধরের সিদ্ধার্থ (ছোট নাটিকা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস ও শিল্প সংস্কৃতির রূপরেখা সম্পর্কিত। যেমন- অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম (১৯৬৬), অলকা চট্টোপাধ্যায়ের অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, চুরাশি সিদ্ধার কাহিনী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদ্ধধর্ম (১৯০১), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধগান ও দোহা (১৯১৬), রামদাস সেনের বৌদ্ধধর্ম ঐতিহাসিক রহস্য (১৯৮৬), শাক্য

সিংহের দিগ্বিজয় বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচনা, পালিভাষা ও তৎসমালোচনা, বুদ্ধদেবের দন্ত, বুদ্ধদেব (১৮৯১), ড. অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম' (১৯৮৯), নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ সংগঠন কর্তৃক সম্পাদিত বাংলায় বৌদ্ধধর্ম (২০০৭), বারিদবরণ ঘোষের বুদ্ধ ও বৌদ্ধ (১৯৯৪), বিদ্যারণ্য স্বামীর বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম (১৯৮৪), সরসীকুমার সরস্বতীর পালযুগে চিত্রকলা (১৯৭৮), ড. দীনেশ চন্দ্র সরকারের অশোকের বাণী (১৯৮১), নারায়ণ সান্যালের অপরূপ অজন্তা, অমূল্যচন্দ্র সেনের অশোকলিপি, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পাল অভিলেখ সংগ্রহ (১৯৯২), ড. সাধনচন্দ্র সরকারের বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য (১৯৯৭), রঞ্জিতকুমার সেনের বৌদ্ধদর্শন, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ ন্যায়, অশোককুমার দত্তের বৌদ্ধ জ্যোতিষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত (১৮৯১), সুকুমার দত্তের বাংলায় গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কথা, ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়-এর যৌথ রচনায় গৌড়বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বৌদ্ধযুগের প্রভাব (২০১৭) প্রভৃতি।

গ. ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে ত্রিপিটক ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সম্পর্কিত। যেমন-বিজয়চন্দ্র মজুমদারের থেরীগাথা, উদান, বুদ্ধচরিত, বারিদবরণ ঘোষের হিউ এন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ভারত (১৯৮৮), বিমলচন্দ্র দত্তের বৌদ্ধ ভারত (১৯৮১), বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের বৌদ্ধদের দেবদেবী (বঙ্গাব্দ ১৩৬২), লেখকের নিবন্ধ তিব্বত (১৯৫৮), দালাই লামার স্বদেশ ও স্বজন (অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত), অপর্ণা ভট্টাচার্যের সিকিম, বিদর্শন ভাবনা ও বৌদ্ধ ধ্যান-সমাধি বিষয়ক রচনা, সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কার মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম প্রভৃতি।

ঘ. ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে বৌদ্ধবিদ্যা, বাংলা সাহিত্যের বিস্তার সম্পর্কিত। যেমন-বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ পুনঃ মু. ১৯৯৫), শশীভূষণ দাশগুপ্তের বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (১৩৯০ বাংলা), নবচর্যাপদ (১৯৮৯), তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের চর্যাগীতি (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ড. সুমঙ্গল রানার চর্যাগীতি (১৯৮১), এস, এম, লুৎফর রহমানের বৌদ্ধ চর্যাপদ (১৯৯০), প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্য (১৯৯৬), নীল রতন সেনের চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয় (১৯৭৪), মনীন্দ্র মোহন বসুর চর্যাপদ, ভক্তি দে'র বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের চীনে বৌদ্ধসাহিত্য, ড. বাণী চট্টোপাধ্যায়ের পালি সাহিত্যে নারী (১৯৯০), অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবচর্যাগীতি, আশা দাশের রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসাহিত্য, রাধারমণ জানা'র পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন, জাহ্নবীচরণ চক্রবর্তীর চর্যাপদের ভূমিকা, সত্যব্রতের চর্যাগীতি পরিচয় (১৯৬০), রবীন্দ্রনাথ রায়ের মৈত্রেয় জাতক, সমরেশ মজুমদারের শরণাগত (১৯৮৬), বিশ্বনাথ রায়ের শতাব্দীর সূর্য (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), চিত্রিতা দেবীর একটি সুন্দর মুহূর্ত (১৯৯৪), প্রবোধ চন্দ্র সেনের ধর্মবিজয়ী অশোক (১৯৪৭) প্রভৃতি।

ঙ. প্রাচীন বৌদ্ধবিদ্যার সমকালীন বিকাশ ও নাট্যকলাচর্চা সম্পর্কিত। যেমন- অঞ্জলি রায়ের ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া (সুকুমার সেনগুপ্ত এই গ্রন্থের ভুমিকা লিখেছেন), স্বপনকুমার বিশ্বাসের ভারতীয় সমাজ উন্নয়নের ধারা, ড. আম্বেদকর (ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ভূমিকা সম্বলিত), সোমেন ভুঞার রাজার ঘন্টা, দস্যু অঙ্গুলিমাল, নৃত্যনাট্য বাসবদত্তা, অভিসার, অমল রায়ের বুদ্ধ ও গোপা, বুদ্ধ ও সুজাতা শ্রুতি নাটক, শহীদুল্লাহ মৃধার মহাস্থবির শীলভদ্র, নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের বীর রাজার কুমার জীবনচিত্রের রচনা এখানে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বর্তমান সময়েও বেশ কিছু বৌদ্ধ নাটক-নাটিকা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ চোখে পড়ে। তন্মধ্যে সাইমন জাকারিয়ার প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক (২০০৭) অন্যতম।

চ. বৌদ্ধশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ ও শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যান সম্পর্কিত। যেমন- রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ললিত বিস্তর (১৯৮৭) ও The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (১৮৮২), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Discovery of Living Buddhism in Bengal (১৮৯৭), চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য অনূদিত ধর্মানন্দ কোশাম্বীর ভগবান বুদ্ধ, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত বোধিচর্যাবতার (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), মৈত্রীভাবনা, গোপালদাস চৌধুরীর বোধিচর্যাবতার (২য় ভাগ ১৯৩৪), শরৎচন্দ্র দাশের বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, বিজয় চন্দ্র মজুমদারের বুদ্ধচরিত, চারু বসুর ধর্মপদ (১৯০৪), বিধুশেখর ভট্টাচার্যের পালি প্রবেশ (১৯৫১ ২য় সং), ভিক্ষু পাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), ঈষানচন্দ্র ঘোষের জাতক মঞ্জুসা (১৯৭৮), জাতকমঞ্জরী (১৯৩৪), জাতক (১-৬ খণ্ড; ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের জাতক সমগ্র, ধর্মপাল ভিক্ষুর জাতক নিদান (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), গীতা চৌধুরীর বুদ্ধের একযান, হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মূল মাধ্যমিক শাস্ত্র অনুবাদ, Comparative Study in Pali & Sanskrit Alankaras প্রভৃতি।

ছ. ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কিত। যেমন- বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংস্কৃতি ও সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর আব্দুল মামুদ খানের বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও আরাকানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বিমলচন্দ্র দত্ত বৌদ্ধ ভারত (১৯৭৩), নলিনীরঞ্জন দাশগুপ্তের বাংলায় বৌদ্ধধর্ম (১৩৫৫বঙ্গাব্দ), ড. নলিনাক্ষ দত্তের Early Buddhist Monarchism (1924), Buddhist Monks and Monasteries of India (1962), অলকা চট্টোপাধ্যায়ের Atisa and Tibet (1967), শ্রী শরৎকুমার রায়ের বৌদ্ধ ভারত (১৩৩১), বিমলাচরণ লাহা'র বৌদ্ধযুগে ভূগোল (১৩৩৫), প্রবোধ চন্দ্র বাগচি'র বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য (১৯৫২), ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদের Mahasthan (1964), এ কে এম শামসুল আলমের Maynamati (1982), এস এ কাদের Paharpur, ড. মণিকুন্তলা হালদার (দে)'র বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (১৯৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধ ইতিহাস যেমন আজো রচিত হয়নি তেমনি বৌদ্ধ সাহিত্য তথা বৌদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার ইতিহাসও পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয়নি। কারণ বহু মূল্যবান তথ্য ও উপাদান কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ তথা বাঙালি সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-সাহিত্য ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়। তাইতো বাঙালির ইতিহাস সচেতনতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একদিন আক্ষেপ করে বলেছেন, "বাঙালির ইতিহাস নাই। কে লিখিবে এই ইতিহাস? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালি তাহাকেই লিখিতে হইবে।"

অতএব, কৃতজ্ঞতাবোধে বলা যায়, দেশ-বিদেশে প্রকাশিত এসব গ্রন্থসমূহ ও লেখক, গবেষক ও পণ্ডিতগণ তাঁদের রচনায় শুধুমাত্র বৌদ্ধবিদ্যা, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং পুরাতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেনি, বরং বাংলা-ভারত উপমহাদেশ তথা বিশ্বসাহিত্য ও ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করেছে। আরও অনেক লেখকের বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে যেগুলো নানাভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত ও বিকশিত করেছে; যা আগামী গবেষণাকর্মে বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশে পালি ও বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান

অবিভক্ত বঙ্গে ১৮৯৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলা হয়। এর পরবর্তী সময়ে পূর্ব বঙ্গে তথা বাংলাদেশে পালিতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পালির পঠন-পাঠন শুরু হয়। তবে ঐ সময়ে অবিভক্ত বঙ্গে যে সকল কলেজে পালি শিক্ষা চালু ছিল তন্মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ, কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, মহারাজ মনীন্দ্ররাজ কলেজ, রিপন কলেজ, আগরতলা রামঠাকুর কলেজ প্রভৃতি।

বাঙালি বৌদ্ধদেরকে পালিভাষায় শিক্ষিত ও ধর্মানুরাগী করার জন্যে পাহাড়তলী মহামুনিতে সর্বপ্রথম পালিটোল প্রতিষ্ঠিত (১৯০২-১৯৩৬) হয়। পরে রাঙ্গুনিয়া রাজানগর, পটিয়া (বর্তমানে চন্দনাইশ) ও সাতবাড়িয়া এবং উনাইনপুরাতে পালিটোল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ সময়ে চকরিয়ার হারবাং (১৮৬৮), সাতবাড়িয়া, মহামুনি পাহাড়তলীতে তিনটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন চকরিয়ার গুণমেজু মহাথের, সাতবাড়িয়ার নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, রাউজানের ডা. ভাগীরথ চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ। এ সময় এ্যাংলো পালি উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালে সারানন্দ নামক সিংহলী ভিক্ষু পাহাড়তলী মহামুনিতে পুনরায় পালি টোল প্রতিষ্ঠা করেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবিরের সহযোগিতায় ১৯১৫ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের মাধ্যমে সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ত্রিপিটকের বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্মে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় উক্ত পরিষদ তিনভাগে বিভক্ত হয়, যথা- বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ), আসাম সংস্কৃত সভা (আসাম) এবং ইস্ট পাকিস্তান সংস্কৃত সভা। ঐ থেকেই এ অঞ্চলে সংস্কৃত-পালি টোলের সকল পরীক্ষা ইস্ট পাকিস্তান সংস্কৃত সভার অধীনে অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৪৮ সালে এ বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হলেও মূলত এটিই ছিল একটি "এডভাইজরি বোর্ড (Advisory Board)"। ১৯৬২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'পাকিস্তান সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড'- যা বাংলাদেশ স্বাধীনের পর নামকরণ হয় বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড। প্রথম থেকেই এর কার্যালয় ছিল ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার কমপ্লেক্সে, এখনো ওখানে আছে। বর্তমান এ বোর্ডে অনুমোদিত পালি টোল ও কলেজ সংখ্যা ৯৪ এবং সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮৬২, আর শিক্ষকের সংখ্যা ৩৫৩ জন। দুর্ভাগ্য অন্যান্য বোর্ডের মত এ বোর্ডটিকে এখনো আলাদা স্থানে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা গেল না।

বিদ্যা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে এ দেশের বৌদ্ধরা প্রথম থেকেই শিক্ষানুরাগী ও ঋদ্ধ ছিলেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতক ছিল বৌদ্ধদের নানামুখী জ্ঞানান্বেষণের যুগ। তখন থেকেই এ দেশের বৌদ্ধদের জন্যে একটি শিক্ষার স্তর তৈরি হয়েছিল। তবে স্মর্তব্য যে, অন্যান্য পেশার তুলনায় শিক্ষকতা পেশায় বৌদ্ধরা অধিক অগ্রসর ও আলোকিতও হয়েছিলেন।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পালি খোলা হয়। এ কলেজ থেকে ভারততত্ত্ববিদ ড. বেণীমাধব বড়ুয়া পালিতে অনার্সসহ বি এ পাস করেন এবং ১৯১৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাশের অস্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০১ সালে সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম পালিতে এম.এ. পাস করেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজে এবং চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম পালি শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯০৮ সালে মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পালি বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন । তিনিই ছিলেন বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম স্নাতক ডিগ্রি লাভকারী। এ সময় পালির অধ্যাপক ছিলেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাসাগর কলেজে পালির প্রথম অধ্যাপক ছিলেন অমূল্য চন্দ্র ঘোষ। ১৯০৯ সালে রেবতী রমন বড়ুয়া পালিতে অনার্সসহ বি এ এবং ১৯১৬ সালে পালিতে এম, এ ডিগ্রি নেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বলা বাহুল্য মহৎ শিক্ষানুরাগী, সদ্ধর্মপরায়ণ ও সমাজ হিতৈষী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কানুগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৩৫ সালে প্রস্তুতি এবং ১৯৩৬-১৯৩৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে **সুরেন্দ্রনাথ কলেজে** (বর্তমান রিপন কলেজ) বি.এ (পাস) পর্যন্ত, ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামের **কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে** উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক, বি.এ (পাস) পর্যায়ে পালি বিভাগ খোলা হয়। এ কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া প্রথম পালির অধ্যাপক ছিলেন। পরে মার্তণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া ও মনীন্দ্র লাল বড়ুয়া অধ্যাপক ছিলেন।

মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া ১৯১২ সালে সার্কেল স্কুল পাঠ শেষে মহামুনি এ্যাংলো পালি ইনস্টিটিউশনে (Anglo Pali Institution) ভর্তি হন এবং ১৯১৮ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে ১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পালি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯২৫ সালে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে কানুনগোপাড়াস্থ স্যার আশুতোষ কলেজে তিনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন।

বাঙালি বৌদ্ধদের স্বনামধন্য শিক্ষক খ্যাতিমান পালি পণ্ডিত ও গবেষক অধ্যক্ষ প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়া ১৯৩৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে অনার্সসহ বি.এ ও ১৯৪১ সালে পালিতে এম.এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য

তিনি বিলেত গমন করেন এবং ১৯৫৫ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিসিস গ্রুপে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

স্মর্তব্য যে, চট্টগ্রাম কলেজ বৃহত্তম চট্টগ্রাম এলাকার প্রথম প্রাচীন কলেজ। এ কলেজটি ১৮৩৬ সালে চট্টগ্রাম জেলা স্কুল নামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে দীর্ঘ ৩৩ বছর বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। ১৯১০ সালে কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি কলেজরূপে স্বীকৃতি পায়। এরপর থেকে এর উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম বহুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ঐ কলেজে ইংরেজি, বাংলা, দর্শন, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি সংস্কৃত-পালি বিষয়েও পড়ানো হয়। ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম পালির অধ্যাপক হন ধর্মবংশ মহাস্থবির (প্রাণকৃষ্ণ ভিক্ষু) ও মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া (১৮৮৩-১৯৬৫)। পরে শিক্ষা প্রশাসন ক্যাডারে সরোজ ভূষণ বড়ুয়া পালির অধ্যাপক হন। ধর্মবংশ মহাস্থবির ১৯০৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পালিতে বিএ অনার্স পাস করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি প্রথম গ্রাজুয়েট হন।

১৯৪৩ সালে অধ্যক্ষ প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন প্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে। ১৯৪৭ সালে ঐ কলেজের পালির অধ্যাপক এবং ১৯৬৪ সালে ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ঐ কলেজে ১৯৫০ সালে অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়া, পরে অনোমদর্শী ভিক্ষু পালি পড়ানোর জন্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া এম. এ (পালি), বি. এড. লাভ করে চট্টগ্রাম কলেজে পালির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁদের মাধ্যমেই প্রথম চট্টগ্রামে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পালি শিক্ষার প্রচলন হয়।

১৯২৬-২৭ সালে নোয়াখালী জেলার **ফেনী কলেজে**ও পালি ভাষার পঠন-পাঠন শুরু হয়। ঐ কলেজে পালির প্রথম অধ্যাপক ছিলেন ললিত মোহন বড়ুয়া। ১৯৩২ সালে **কলিকাতা সিটি কলেজে** নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া পালির অধ্যাপক হন। বিদ্যাসাগর কলেজে পালি শিক্ষা শুরু হয় ১৯০৫ সালে। ১৯৩৪ সালে নীরোধ রঞ্জন মুৎসুদ্দি **ঐ কলেজে** পালির প্রথমে খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং পরে পূর্ণকালীন অধ্যাপক ছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে পালি শিক্ষার প্রসারে নীরোধ রঞ্জন মুৎসুদ্দি কঠোর পরিশ্রম করেন। ১৯৩৪ সালে **মনীন্দ্রনাথ কলেজে** পালি বিভাগ খোলা হয়। প্রভাস চন্দ্র মজুমদার সেখানে অধ্যাপনা করেন।

১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে চট্টগ্রাম পালি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পালি ও বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির।

১৯৩২-৩৩ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম সিটি কলেজে পালি বি. এ (পাস) কোর্স চালু হয়। দেবব্রত চক্রবর্তী ঐ কলেজে পালির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৩২ সালে। নোয়াপাড়া কলেজে পালি বিভাগ চালু হয় ১৯৬৯ সালে, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ভদন্ত বনশ্রী ভিক্ষু দীর্ঘকাল ঐ কলেজে শিক্ষকতা করেন। পরে প্রভাষ কুসুম ও আশুতোষ বড়ুয়া নিয়োগ লাভ করেন। রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয় ১৯৭৬ সালে। প্রথমে ভদন্ত দেবানন্দ ভিক্ষু

১৯৭৭ সালে, ১৯৯৬ সালে শান্তি কুমার চাকমা ও ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম ঐ কলেজে পালি পড়ানোর জন্য নিযুক্ত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি চর্চার উৎস বিচার

বাংলাদেশে পালি ও বৌদ্ধ বিদ্যা চর্চার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান গৌরবের। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ। বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রথম থেকেই এ বিভাগ যেভাবে বিভাজিত হয় তা হলো : স্যান্সক্রিটিক স্টাডিজ এন্ড সংস্কৃত ও বাংলা ১৯২১, সংস্কৃত ও বাংলা ১৯৩১, সংস্কৃত ১৯৩৭, বাংলা ও সংস্কৃত ১৯৫০, সংস্কৃত ও পালি ১৯৭০, সংস্কৃত ২০০৭। প্রথম পর্যায়ে (১৯২১-১৯৩৭ খ্রিঃ) বাংলাকে সঙ্গে নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ নামে ছিল এর পরিচিতি। একক সত্তায় সংস্কৃত বিভাগরূপে এর কার্যক্রম চলতে থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৩৭-১৯৫০)। পুনরায় বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'বাংলা ও সংস্কৃত' বিভাগ নামে তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৫০-১৯৭০)। এরপর চতুর্থ পর্যায় শুরু হয় ১৯৭০ সালে 'সংস্কৃত ও পালি' বিভাগ নামে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, ২০০৭ সালের ৬ মার্চ পূর্বের সংস্কৃত ও পালি দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয় এবং পালি বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভাগের নামকরণ করা হয় 'পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ' (১৪-০৪-২০০৭)।

প্রথম বছরেই ঐ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে পালিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করা হয়। দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে গবেষণা ও বিস্তারের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে ঐ বিভাগের অধীনে Centre for Buddhist Heritage and Culture নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শিক্ষার্থীদের পালি ও বৌদ্ধবিদ্যা অধ্যয়নে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ দানে বিভাগে নানা ট্রাস্ট ফান্ডও গঠন করা হয়। তন্মধ্যে অন্যতম "ডাঃ গণেশচন্দ্র বড়ুয়া-শিক্ষয়িত্রী বুদ্ধিমতি বড়ুয়া ট্রাস্ট ফান্ড (২০১০)"। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগী ও ভাল রেজাল্ট করার লক্ষ্যে এম. এ. শেষ পর্বের প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারীকে "বৌদ্ধতত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া স্বর্ণপদক (২০১৪)" প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ ফাণ্ড থেকে বৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। অনার্সে প্রথম স্থান অধিকারীকে স্বপন বড়ুয়া চৌধুরীর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত "বংশদীপ মহাস্থবির স্মৃতি স্বর্ণপদক (২০১৪)" প্রদান করা হয়। বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র বিজয় স্মারক বক্তৃতাও চালু করা হয় ২০১০ সাল থেকে। তিনি ছিলেন এ বিভাগের জ্ঞানসমৃদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও আলোকিত শিক্ষক। বর্তমান বিভাগীয় সেমিনারের নামকরণ করা হয় অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া সেমিনার রাইব্রেরি, বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কক্ষের নামকরণ করা হয় অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া বিভাগীয় সভাকক্ষ এবং ক্লাশ রুমের নামকরণ করা হয় অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া লেকচার হল। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

২৬ নভেম্বর ২০২১ সালে ঐ তিনটি ফলক উন্মোচন করেন। বিভাগে দরিদ্র, অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থ তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১৯৬৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৬৮ সালে বাংলা বিষয়ে এম.এ প্রথম পর্বে পালি (আংশিক) এবং পালি (সাবসিডিয়ারি) কোর্স পড়ানোর জন্য মি. রনধীর বড়ুয়াকে বাংলা বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন প্রফেসর এম ইন্নাস আলী। ঐ সময়ে বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটি পালি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার জন্য আবেদন করা হয় এবং দেশ-বিদেশে পালির ইতিহাস, ধর্মদর্শন ও বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চার গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগের অধীনে পালি প্রথম পর্ব প্রিলিমিনারি কোর্স চালু হয় এবং পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে আরবি ও ফারসি বিভাগসহ পালি ও সংস্কৃত বিষয় নিয়ে 'প্রাচ্যভাষা' (Department of Oriental Language) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। তখন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম এ গফুরকে। তিনি বহু ভাষাবিদ এবং পণ্ডিত শিক্ষক ছিলেন।

বিভাগটি স্বতন্ত্র হবার পরপরই বাংলা বিভাগে পাঠদানরত শিক্ষক অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়া প্রাচ্যভাষা বিভাগের সাথে যুক্ত হন। সে সময়ে (১৯৭৩) অধ্যক্ষ প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়া ঐ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন যিনি প্রথমে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পালি শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী ঐ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাযান ধর্মদর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়নপূর্বক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তখন স্বতন্ত্র ঐ বিভাগের পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাঠদান করার জন্য এই তিনজন শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী ১৯৭৭ সালে প্রাচ্যভাষা বিভাগ থেকে আরবী ও ফারসী বিভাগকে পৃথক করা হয়। ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে পালি বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু করা হলে উক্ত বিভাগের (পালি ও সংস্কৃত বিষয়) সভাপতি নিয়োগ দেয়া হয় অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়াকে। বর্তমান এ বিভাগে এম.ফিল. ও পিএইচ. ডি. ডিগ্রিও প্রদান করা হচ্ছে। ঐ বিভাগেও আর্থিক সহায়তাদান ও শিক্ষর্থীদের উচ্চ শিক্ষায় প্রেরণা দেয়ার জন্য স্বর্ণপদক ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে (১৯৯২) কলেজ পর্যায়ে বি.এ পাস ও সাবসিডিয়ারি কোর্স পরীক্ষায় পালি ছিল। এর পূর্বে ঐসব পরীক্ষাসমূহ নেয়া হতো বিভিন্ন বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে। যেমন চট্টগ্রাম বিভাগের সব কলেজের পরীক্ষা নেয়া হতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ঠিক একই রকম ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রজেক্ট শুরু হয় ইস্কাটনের একটি ভাড়া বাসায়। তখন সেখানেই পালি বি.এ পাস, সাবসিডিয়ারি ও মাস্টার্স প্রিলিমিনারি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন কলেজে এম. এ কোর্স চালু হলে ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষুকে পালির প্রভাষক হিসেবে নিয়োগদান করা হয়। ২০০৭ সালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান পালির সহকারী অধ্যাপক ড. জগন্নাথ

বড়ুয়া ২০০৫ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বর্তমান ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্বরত।

বলতে গেলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, ভাষা, কৃষ্টি, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিকাশে পালি ও বৌদ্ধ বিদ্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখানে বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন, চাক প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষার্থী ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরাও পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অধ্যয়নরত আছে।

বিদর্শন সাধনা বা ধ্যান কেন্দ্রগুলোও পালি, বৌদ্ধ বিদ্যা ও বৌদ্ধধর্ম বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে বিংশ শতকে ডা. রাজেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী (১৮৮৭-১৯৫২), আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির (১৮৮৭-১৯৭৪), প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া (ধর্মবিহারী ভিক্ষু ১৮৯২-১৯৭২), গুণানন্দ মহাস্থবির (১৮৯০-১৯৬৩), সুমনাচার মহাস্থবির (১৮৯৩-১৯৬৮), বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির (১৩০০-১৩৯৬ বঙ্গাব্দ) বোধিপাল শ্রামণ (১৩২৫-১৪১০ বঙ্গাব্দ), দীপা মা ননীবালা বড়ুয়া (১৯১১-১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ), অনাগারিক মুনীন্দ্র জী (১৯১৫-২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ), ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির (১৯৩০-২০১০, বুদ্ধগয়া) প্রমুখ বিদর্শন আচার্যগণ অবিভক্ত বঙ্গে, রেঙ্গুন তথা বাংলাদেশ ও বিশ্বের নানা দেশগুলোতে ধ্যান সমাধিসহ শিক্ষা-দীক্ষা এবং পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার প্রভূত উপকার সাধন করেছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের ভিক্ষু ও গৃহী সমাজের মধ্যে সাধক প্রবর সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে, ১৯২০-২০১২)–এর সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর বহু শিষ্য প্রশিষ্যগণ বর্তমান ধ্যান সমাধিতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের উত্তরসূরিগণও বাংলাদেশে নানা ধ্যান ও সাধনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধ সমাজকে অধ্যাত্ম সাধনা ও নানা মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

সর্বশেষ বলতেই হয় পালি ভাষা ও বেদ্ধেবিদ্যার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিক্ষা-সংস্কতি। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধে ঐতিহ্যের অংশ। এছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষসহ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানার জন্য পালি ও বৌদ্ধে বিদ্যার মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন নালন্দার ধারাবাহিকতায় প্রাচীন বাংলার সোমপুর মহাবিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, শালবন মহাবিহার, পণ্ডিত মহাবিহার প্রভৃতিই ছিল বৌদ্ধে শাস্ত্র ও ধর্ম-দর্শন চর্চার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। এর মাধ্যমেই এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্ম-দর্শন, ভাষা-সংস্কতি প্রভৃতি সমগ্র এশিয়া, দূর প্রাচ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে বিস্তার ও চর্চার সংযোগ ঘটে।

টীকা

১. 'রাখাইন রাজোওঁয়ে'। এটি আরাকান শাসনের ইতিহাস। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে ১৬৬৬ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে কিছু বিরতি থাকলেও চট্টগ্রামের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়ে শঙ্খ নদীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকান শাসকের অধীনে ছিল। অন্যদিকে 'রাজমালা' হলো ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস।

২. 'মঘা-খমুজা'। এর অর্থ 'মঘা শাস্ত্রজ্ঞতা', পূর্বে এটি ছিল হস্তলিখিত একটি পুঁথি। এটি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। এটি অনুবাদ গ্রন্থ হলেও মূল গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করা হয়নি। তবে দুই পুস্তকে দু'ধরনের শব্দ ও বানান লক্ষণীয়। হস্তলিখিত পুঁথিতে দেখা যায় 'মগ'। যেমন 'আদেশিলা মগাশাস্ত্র বাঙ্গালা করিতে'। আবার ছাপানো গ্রন্থে আছে 'মঘা শাস্ত্রজ্ঞতা', 'মঘা শাস্ত্র' ইত্যাদি।

৩. 'তাধুবাইন'। এটি নানা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন- তাধুয়াইং, থাধুবাইং, তাধুআইং, থাদুত্তাং, থাতুত্তোয়াং, থাডুথাঙ, থাতডোয়াং প্রভৃতি। এ সম্পর্কে প্রবন্ধের ৩ ও ১০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা আছে। পালি ভাষায় রচিত এটি বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ। এটির বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ হলো 'বৌদ্ধরঞ্জিকা'। তবে এটির ভাষা বাংলা হলেও এতে বর্মী, আরাকানী, চাকমা, চট্টগ্রামের কিছু আঞ্চলিক শব্দ এবং বাংলার সংমিশ্রণে গড়া এক ভাষা, যা আর্কাইক ল্যাংগুয়েজ (Archaic Language) বলে অভিহিত হতে পারে।

৪. 'মঘা শাস্ত্র'। 'আরাকানের শাস্ত্র', 'বর্মী শাস্ত্র' নামে আখ্যায়িত।

৫. 'জেন্তে'। এটি আঞ্চলিক অপভ্রংশ শব্দ। এর অর্থ হলো- জানতে বা বুঝতে।

৬. 'ফুল নামে'। তাঁর পূর্ণ নাম ফুল চন্দ্র বড়ুয়া। তিনি চট্টগ্রাম রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মঘাশাস্ত্র অভিজ্ঞ। তাঁর হাতেই 'থাদুত্তাং' গ্রন্থ গদ্যে রচিত হয়। এঁর গদ্য থেকে পদ্যে রচনা করেন নীলকমল দাস।

৭. 'লোতক'। আরাকানি কথ্য ভাষার অপভ্রংশ শব্দ। এর বুৎপত্তিগত শব্দ হলো- লুথোয়াক > লোথক > লোতক। আরাকানি ভাষায় 'লু' অর্থ লোক বা ব্যক্তি। আর 'থোয়েক' অর্থ চলে যাওয়া, ফিরে যাওয়া বা চীবর পরিত্যাগ করা। সুতরাং যিনি ভিক্ষুধর্ম ও চীবর ত্যাগ করে পুনরায় 'গৃহী' হন, তাঁকে 'লোতক' নামে অভিহিত করা হয়।

সহায়কপঞ্জি

১. আবদুল হক চৌধুরী (১৯৮৬)। *কক্সবাজার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. সুকোমল চৌধুরী (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা।

৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮২)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা।

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৯৮৮)। *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা।

৫. *ইতিহাস* (১৪০৪ বাংলা)। ৩১ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বাংলাদেশের ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা।

৬. বিপ্রদাস বড়ুয়া ও দিলীপ কুমার বড়ুয়া (২০০৫)। *বৌদ্ধ রঞ্জিকা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

৭. রেবত প্রিয় বড়ুয়া, সংগ্রাহক ও সম্পাদক (২০১৯)। *তাধু বাইন*, রচনা: পণ্ডিত গৌরমণি বড়ুয়া মাস্টার, চট্টগ্রাম।

৮. সুকোমল বড়ুয়া (২০১৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধ : ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা।

৯. অনোমা (২০০১)। বনশ্রী মহাথের, *পালি ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)*। ২৫ বছর পূর্তি স্মারক; চট্টগ্রাম ।

১০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (২০০৩)। *বাংলার ইতিহাস*, অধুনা প্রকাশ, ঢাকা।

১১. জ্যোতিপাল মহাথের (১৯৯০)। *চর্যাপদ*, চট্টগ্রাম।

১২. *নালন্দা* (২০০১)। কলিকাতা।

১৩. আলী ইমাম (১৯৯৬)। *প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধবিহার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

১৪. ভিক্ষু সুনীথানন্দ (১৯৯৫)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষুজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৫. P.V. Bapat, ed. by (1997). *2500 years of Buddhism* : Reprint, New Delhi.

১৬. সৌমিত্র বড়ুয়া (২০০৫)। *ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ মনন ও মনীষা*, আবির প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

১৭. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া (১৯৯৯)। *আত্ম অণ্বেষা : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৮. সত্যজিৎ চৌধুরী (১৯৮৪)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ* (তৃতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ভারত।

১৯. The Bouddha Dharmankur Sabha (1892-1992)। বেণীমাধব বড়ুয়া, *বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান* (প্রবন্ধ), The Bengal Buddhist Association Calcutta।

২০. দীনেশ চন্দ্র সেন (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা।

২১. আশা দাশ (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, ক্যালকাটা বুক হাউস , কলিকাতা।

২২. *জগজ্জ্যোতি*। ১ম ভাগ ৯ সংখ্যা। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা।

২৩. *জগজ্জ্যোতি* (১৯৯৫)। সুনীতি কুমার পাঠক, বাংলাভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য (১৩৫১-১৪০০): এক বিহঙ্গম পরিচারণ (প্রবন্ধ), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা।

জি. সি. দেবের সমন্বয়বাদ ও সমকালীন ফলিত দর্শন

সন্তোষ কুমার পাল*

সারসংক্ষেপ : মানবতার প্রতি দায়বদ্ধ চিন্তকমাত্রই বোঝেন যে দর্শন কেবল আরাম-কেদারায় বসে অধিতত্ত্বের বীজ বোনা নয়। ভ্রান্ত বিশ্বাস তথা বিভ্রান্তিকর মতাদর্শে জেরবার জনসাধারণের প্রয়োজনে দর্শন যদি কোনোভাবে ফলদায়ী না হয়, তাহলে কিসের দার্শনিকতা? কেনই বা তাদের প্রদত্ত কর (tax)-এ এই বিশুদ্ধ শৌখিনতা সহ্য করা হবে? মার্কস থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী দার্শনিক সকলেরই বক্তব্য –

"Philosophers must descend into the concrete world of human practice and belief, sweat and toil like the rest of humanity within market – place of ideas and images to fine meanings and uncover truths" (Kurtz, 1986: 7). ঠিক একই কথা বলেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব (যিনি জি. সি. দেব নামে অধিক পরিচিত)। তিনিও মনে করেন, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ নেই এমনতর তত্ত্বালোচনা শুধুই বিমূর্ত বিশ্লেষণ, এবং এরকম দর্শন কখনো প্রকৃত দর্শন হয়ে উঠতে পারে না। জি. সি. দেব ঠিক পাঁচ দশক আগে যে জীবনমুখি সমন্বয়বাদী দর্শনের কথা বলে গেছেন, বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্যে তার চর্চা শুরু হয়েছে, আজকে যা ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে সত্যিকারের ফলিত দর্শন (Applied Philosophy) - এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। বস্তুত জি. সি. দেবের শহিদ হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরই এই ফলিত দর্শনের বিকাশকাল। ভারতীয় উপমহাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ প্রমুখের যে সমন্বয়বাদী দর্শন, তার যে ঐতিহ্য তারই সর্বশেষ প্রতিনিধি অধ্যাপক দার্শনিক জি. সি. দেব। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ফলিত দর্শনের বর্তমান অবয়বের একটি পরিচিত দেয়ার চেষ্টা করব, তবে তা অধ্যাপক দেবের সমন্বয়বাদী দর্শনের সূত্র ধরেই। আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক দেব প্রমুখ মানবতাবাদী বাস্তবানুগ দার্শনিকের

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনমুখি চিন্তা-কর্ম-আচরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজকের এই ফলিত দর্শন পল্লবিত হয়েছে। দর্শনের এই ফলমুখি চরিত্র যে শুধু নীতিশাস্ত্রেই প্রকাশিত তা নয়, অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, এমনকি যুক্তিবিদ্যার মধ্যেও তা কার্যকরভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবহারিক উপলব্ধির সুযোগ আছে, এমন সব বিষয় সম্বন্ধে যে দার্শনিকীকরণ, তার ব্যাপক চর্চা বর্তমানে শুরু হয়েছে।

(১)

শহিদ অধ্যাপক জি.সি. দেবের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন উচ্চ মাপের মানুষ, যথার্থ মানবতাবাদী, সর্বজনীন প্রেম ও প্রজ্ঞার এক বিরল প্রতিমূর্তি। একইসঙ্গে এক অনন্য সাধারণ দর্শন-চিন্তক তথা অধ্যাপক, সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনকে পৌঁছে দিতে যিনি কৃতসংকল্প ছিলেন। তাঁর মেধা, চিন্তন ও কর্ম বিমূর্ত তাত্ত্বিকতা বা দশটা-চারটের সীমায় বাঁধা পুঁথিগত অধ্যাপনার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না, তা মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের রসে এতটাই জারিত ছিল যে একজন সাধারণ রিক্সাচালকের সঙ্গে করমর্দন না করে তার রিক্সায় উঠতেন না। এহেন দর্শনবেত্তা যে তাঁর দর্শনচর্চা তথা অধ্যাপনাকে ব্যবহারিক জীবনে 'চর্যা'-র স্তরে নিয়ে যাবেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, আমাদের জ্ঞান যদি বিশ্বপ্রেমের দ্বারা প্রণোদিত না হয় তাহলে তা যথার্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নয়। প্রেমে জারিত জ্ঞানই কেবল সত্যকে সার্থক প্রকাশ করতে পারে, যে সত্য মানুষের মর্মে লাগে, কর্মে লাগে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' তথা সমতার দৃষ্টিতে মানুষকে দেখার যে বিশ্ববীক্ষা আমরা তাঁর চিন্তনে-আচরণে-দর্শনে পাই তা অনন্য-সাধারণ মনে হয়। তাঁর 'কমনমেনস্ ফিলোসফি' -র যে ধারণা তাই ফলিত দর্শনের অবয়বে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। শ্বেতশুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সাদাসিধে জীবনবোধে অভ্যস্ত এই অধ্যাপক সর্ব্বোচ্চ মানের চিন্তনস্তরে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারতেন, এবং বাস্তবে সেই উচ্চচিন্তার প্রকৃত প্রয়োগে ছাত্র-ছাত্রীসহ জনসাধারণকে তিনি প্রভাবিত করতে পারতেন। আমরা সাধারণ শিক্ষককুল ছাত্র-ছাত্রীদের কত কীই না পড়াই। তাঁর কিছুটাও তাদের মর্মস্থলে প্রবেশ করে কী না সন্দেহ। আমার বিষয়ালোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের চেতনার জগতে অনুরণন ঘটাতে পারল কি না তার খবর আমরা রাখি না। কিন্তু অধ্যাপক দেবের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুকরণীয়, কি ছাত্র-ছাত্রী, কি সহকর্মী, কি সাধারণ মানুষ - সকলের কাছেই পৌঁছাতে পারতেন, ধর্মান্ধ নির্বোধ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কালবেলায় হত্যা না করলে আমরা আরও অনেক কিছুই তাঁর কাছ থেকে পেতে পারতাম। বিমূর্ত দর্শনবেত্তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে দর্শন মানে কেবল অধিতত্ত্ব বা পরাজগতের আলোচনা নয়, বা নিছক রসকষহীন ধারণাগত বিশ্লেষণ বা তত্ত্বালোচনাও নয়। বরং সঠিক এক সর্বজনীন মানবতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের কল্যাণের জন্য দর্শনের প্রয়োগই দর্শনচর্চার সার্থকতা। জীবন-বিমুখ দর্শন আলোচনার ব্যাপারে পল কুর্টজের মতোই তিনি সংশয়ী ছিলেন। একইসঙ্গে যাবতীয় 'ঘৃণার মতদর্শ'কে বাতিল করে মানব-প্রেমের দর্শন রচনায়

তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি এ ও জানতেন যে বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি ধারণা বা তত্ত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ছড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়, রাডারহীন জাহাজের মতোই তা সমুদ্রের দিক-বিদিক ঘুরে বেড়াবে, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে না। দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ যদি মূর্ত জীবনের সঙ্গে সঠিকভাবে যুক্ত হয় তবেই তা সার্থকতা লাভ করে।

জি.সি. দেব যে কোনো ধরনের চরমপন্থী ভাবনা, একরোখা অভিমত বা বিচারহীন মতাদর্শের বিরুদ্ধে খর্গহস্ত ছিলেন। একইসঙ্গে, আজকের পরিভাষায় যাদেরকে আমরা বিসংবাদী দ্বৈততা (Exclusive binary) বলি, তার বিরোধী ছিলেন। বস্তুত, আমরা বিভিন্ন পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বৈততা দেখি, যেমন- বিজ্ঞান-দর্শন, ভাববাদ-বাস্তববাদ, অধ্যাত্মবাদ-বস্তুবাদ, যুক্তি-বিশ্বাস, আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদ, ইত্যাদি। এইসব বিরোধকে তিনি সমন্বয়ের আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: 'If we yield extremism and one-sidedness we shall never be able to make the curly tail of the dog straight, to set our house in order and reach stable equilibrium so far as humanly possible. (Dev, 1980: 558)'

আমরা এবার অধ্যাপক দেবকে অনুসরণ করে তার সমন্বয়বাদী বিচারধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আমরা প্রথমে ভাববাদ-বাস্তববাদের কথিত বিরোধকে বোঝার চেষ্টা করব। ভাববাদের মূল কথা হল, প্রকৃত সত্য অন্য কোনো ভাবের জগতে অবস্থান করে, যা সবসময় চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক-গম্য নয়। আমাদের প্রকৃত মন তার নাগাল পায় না। তাই ভাবের জগতের আলোতেই আমাদের জগৎ ও জীবনকে বুঝতে হবে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম: এই ভাবের জগতই প্রকৃত সত্তার জগৎ, আমরা যে জগতে আছি তা আসলে ঐ জগতের ছায়া মাত্র। ঠিক বিপরীত অভিমত বাস্তববাদ। এমতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই সত্যিকারের জগৎ। যা কিছুই আমরা খুঁজি না কেন তা এই বাস্তব জগতের মধ্যেই খুঁজতে হবে। অধ্যাপক দেব এই দুটি পরস্পর বিপরীত অভিমতকে একদেশদর্শী ও চরম বলে সমালোচনা করেন, এবং এর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। অনেকখানি বিবেকানন্দের মতো তিনি মনে করেন, বাস্তব জগৎ মিথ্যে নয়, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা আমাদের আরেক জগতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাকে আমরা 'ভাবের জগৎ' বলি। কিছু চিরন্তন আদর্শ, নিয়ম নীতির আকর এই ভাবজগৎ আমাদের সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। তবে অধ্যাপক দেব মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই ভাবজগৎ যেন 'বিচারহীন ভ্রান্ত ভাবনার আবাসস্থল না হয়ে ওঠে। একই রকমভাবে তিনি অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের এক ... ... দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, বস্তুবাদ যেমন সত্য, অধ্যাত্মবাদও তেমনি সত্য। ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বলেন, মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার রসদ আমরা বস্তুজগৎ থেকেই পাই। এই জগতকে যথাযথ কর্ষণ করতে পারলে তবেই আমরা বাঁচব, সকলের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্য-বাসস্থান- এর ব্যবস্থা করতে পারবো। এই বিষয়ে তিনি মার্কসীয় বস্তুবাদী চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি মনে

করিয়ে দিচ্ছেন যে মানুষের মন শুধুই বস্তুতে তৃপ্ত নয়। তার এক অনন্যবৃত্তি রয়েছে যা তাকে দেশকালের বস্তুজগতকে ছাড়িয়ে সুদূর অমৃতলোকে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে সকলে সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে, মনুষ্য-জীবনের চরম অর্থ খুঁজে পায়। মানুষের এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তাকে অসীম মহত্ত্বে স্থাপন করতে পারে। এভাবে তিনি অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে গেছেন।

অনুরূপ জগতকে ও জীবনকে দেখার পরস্পর বিপরীত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হই আমরা: নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ। নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থিত ব্যক্তিজগতের কোনো কিছুতে আশার আলো দেখতে পায় না। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথ্বীতে কোথায় আশা! দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও বৈষম্যে ভরা এই মানব সমাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনার মতো মহামারীর এই জগতে, কোথায় শান্তি, কোথায় ভালো কিছুর আশা! অধ্যাপক দেব অবশ্য বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি। অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনকে দেখলে অনেক আশার বিন্দু আমরা খুঁজে পাবো। তাছাড়া, নৈরাশ্য কোনো কাজের কথা নয়। তাকে অতিক্রম করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আশার কোন বিন্দুকে বাস্তবায়িত করতে দুঃখ-কষ্ট-হতাশাকে অতিক্রম করে আলোর পথযাত্রী হওয়াই মানুষের লক্ষ্য। একইরকম ভাবে বিমূর্তবাদ ও ঈশ্বরবাদের মধ্যে তিনি সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তিবাদী হয়েও তিনি, অনেকখানি কান্টের মতো, বিশ্বাসকে সঙ্গী করেছেন। অনুরূপভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার মধ্যে সম্মিলন ঘটাতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

প্রসঙ্গত, অধ্যাপক দেব, সর্বধর্ম-সমভাবের যে ধর্মনিরপেক্ষতা তার একনিষ্ঠ সমর্থক। ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা তথা জঙ্গিবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও তিনি 'হিন্দু' পরিচয় দেওয়ার চেয়ে নিজেকে 'মানুষ' পরিচয়ে পরিচিত করতে বেশি স্বস্তি বোধ করতেন। বাঙালির বিশেষ জাতিসত্তাকে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি উগ্রধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস সংকীর্ণ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর হাতেই তিনি শহিদ হন। তাঁর সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল গীতার কর্মযোগ তথা অধ্যাত্মবাদে স্থিত হয়েও বৌদ্ধদের ইহজাগতিকতায় তিনি আস্থাশীল ছিলেন। একইসঙ্গে যিশুখ্রিষ্টের প্রেমের দর্শনে তিনি বিশ্বাস করতেন, মধ্যপন্থী মুসলিম দর্শনও সুফিসন্তদের বিচারধারার অনুসারী ছিলেন। তবে যেকোনো ধর্মের সম্পূর্ণ বহিবাদী ব্যাখ্যা তাকে পীড়িত করতো। উগ্র জাতীয়তাবাদসহ এ ধরনের যাবতীয় ভাবনাকে তিনি 'ঘৃণার দর্শন' (Philosophy of hatred) বলে বিচার করেছেন। বিপরীতে প্রেম সম্বন্ধিত জ্ঞানের দর্শনকে জীবনের ধ্রুবতারা করেছেন। বস্তুত, বিবেকানন্দের নব্য হিন্দুধর্ম, গৌতমবুদ্ধের বাস্তববাদী মানবতা, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সমতার দর্শন ও খ্রিস্টের প্রেমের বাণী- এসব কিছুর এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁর দর্শন চিন্তার মধ্যে আমরা পাই। সর্বদা মধ্যমপন্থার অনুসারী অধ্যাপক দেব বিজ্ঞান যুক্তি ও মানবতায় বিশ্বাস রাখতেন।

পক্ষপাতহীনতা, সর্বজনীনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু মহামতি মার্কসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক অর্থনীতিতে তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। দরিদ্র জনসাধারণের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার যে অঙ্গীকার এবং একসঙ্গে সামাজিক সমতার যে প্রত্যয় মার্কসবাদে রয়েছে তা তিনি গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, তাঁর সর্বসাধারণের যে দর্শন (Common Man's philosophy) - এর মধ্যে ফলিত দর্শনের পূর্বাভাস আমরা লক্ষ করতে পারি। সম্বন্বয়ধর্মী ফলিত দর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'আলু-দর্শন' - এর কথাও এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য: 'In the absence of a better term, I do feel tempted to call this potato- Philosophy, not in order to take away from its importance, but to emphasize that ideal successful man and woman of the future must have the capacity, the gift to lose their distinctive identity in it and mix up with every curry that is delicious and wholesome.' (Dev, 1980: 460) আমরা মনে করতে পারি, অধ্যাপক দেবের মতো দার্শনিকদের বাস্তববাদী ও জীবনানুগ দর্শন চিন্তার সূত্রধরেই আজকের ফলিত দর্শন (Applied Philosophy) যথার্থ অবয়ব লাভ করেছে।

(২)

দর্শনকে কীভাবে জনসাধারণের কল্যাণে তাদের জীবনযন্ত্রণার নিরসনে প্রয়োগ করা যায় সেই তাগিদ থেকেই এই ব্যবহারিক তথা ফলিত দর্শনের উদ্বোধন। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, দর্শনমাত্রেই ফলমুখী কিন্তু তা আশূদ্র জনসাধারণকে সদর্থকভাবে প্রভাবিত করে না। বিপরীতে বৃহত্তর জনসাধারণের পৌঁছানোর অঙ্গীকার উদ্বুদ্ধ আজকের ফলিত দর্শন আমাদের সামনে নতুন আলোর সঞ্চার করেছে এই নতুন দর্শন-ভাবনা। প্রথমেই বলে রাখি, আমরা এতদিন বেশি বেশি করে ফলিত নীতিশাস্ত্র (Applied Ethics) -এর কথাই বলে এসেছি, মনে করে এসেছি যে ফলিত নীতিশাস্ত্রই ফলিত দর্শন। কিন্তু এই বিচার সঠিক নয়। ফলিত দর্শনের প্রধান ও সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা নিঃসন্দেহে ফলিত নীতিশাস্ত্রই, কিন্তু ফলিতদর্শন = ফলিত নীতিশাস্ত্র এ ভাবনা ঠিক নয়। ফলিত দর্শনের আরোও অনেক শাখা ও ক্ষেত্র রয়েছে। আছে ফলিত অধিবিদ্যা (Applied Metephysics), আছে ফলিত জ্ঞানবিদ্যা (Applied Epistemology), রয়েছে ফলিত যুক্তিবিদ্যা (Applied Logic), এরকম আরও অনেক ক্ষেত্র। আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিভিন্ন সমস্যা, উদ্বেগ তথা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা উপস্থিত হয় তাদের সমাধানের জন্য কিছু নৈতিক নিয়ম বা কর্তব্যের আদর্শই যথেষ্ট নয়। সেসবের সার্থক সমাধানের জন্য অধিবিদ্যা তথা সত্তাতত্ত্ব, জ্ঞানবিদ্যা তথা ফলিত যুক্তিবিদ্যারও সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই বাস্তবতার উপলব্ধি আজকের ফলিত দর্শন, যার ফলিত নীতিবিদ্যা ছাড়াও আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা রয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবনের অনেক সমস্যারই পক্ষে-বিপক্ষে অনেক দাবি-প্রতিদাবি থাকে, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিক চরিত্রের এবং

তাই দর্শনসুলভ স্পষ্টতা ও মর্মভেদী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিবিন্যাসের সুযোগ এসে পড়ে। শুধু তাই নয়, দার্শনিকের মধ্যে যাঁরা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বিচার বিশ্লেষণকে কাজে লাগাতে আগ্রহী হন তাঁদেরকেই আমরা ফলিত দর্শনের সাধক বলব।

প্রথমেই যে প্রশ্নটি এ পর্যায়ে সামনে আসে তা হলো ফলিত দর্শন কাকে বলবো, প্রথম পর্যায়ে আমরা বলতে পারি, খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণায় কাতর আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় জীবনের বাস্তব সমস্যার সম্যক অনুধাবন ও নিরসনকল্পে দর্শনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্যানধারণা, তত্ত্ব ও নিয়মনীতির সার্থক প্রয়োগ। বিপরীতে দর্শনের শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের যা পড়ান, অধ্যাপক তাঁর গবেষকদের যা নির্দেশনা দেন তা বিশুদ্ধ দর্শন, কেবল দর্শনের জন্যই দর্শনচর্চা, অনেকখানি 'Art for art's sake' এর মতোই। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-গবেষকের গুটিকতক মানুষের বাইরে এই দর্শনচর্চার তেমন কোন প্রভাব আমরা দেখি না। (যদিও অনেকে মনে করেন এই বিশুদ্ধ দর্শনচর্চা থেকে কিছু ভাবনা তথা বিচারধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমাদের সমাজের উপর এসে পড়ে!) আমরা হুসালের প্রভাসতত্ত্বের আলোচনা করি, হাইডেগারের সঙ্গে তাঁর দর্শন-পদ্ধতির তুলনা করি, হিস্টগেনস্টাইনের 'পিকচার থিয়োরি' পড়াই, শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তুলনা করি। সেমিনারে একের পর এক বক্তা স্ট্রসনের 'Philosophical Logic' -এর পর্যালোচনা করেন। কিন্তু যতই তাতে জ্ঞানালোকের বিচ্ছুরণ ঘটুক না কেন, কলেডা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চারদেওয়ালের মধ্যে সেসবের অনুরণন সীমাবদ্ধ থাকে। জনসাধারণ, যাদের করের টাকায় এসব আলাপ-আলোচনা সংঘটিত হয় তাদের কাছে এসবের ছিটে-ফোঁটাও পৌঁছায় বলে মনে হয় না। জনসাধারণ ভাবিত, আমার ভারত দারিদ্র্যে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন, দেখছে ধনবৈষম্য বাড়ছে। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন শিল্পপতির মুনাফা এই করোনাকালেও কি 'অশ্লীল' গতিতে বাড়ছে! এসব কিছুর মধ্যে আমরা ভাগ্যবান কয়েকজন 'দর্শনের জন্য দর্শনে'র চর্চা করে চলেছি দর্শনের নিজস্ব উন্নয়নস্বার্থে। বিশুদ্ধ দর্শন জগতের মূল কারণ, জীবনের চরম অর্থ তথা পরমাগতি ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনায় নিয়োজিত থাকে। সংকীর্ণ পরিসরের এই আলাপ-আলোচনায় থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়, তত্ত্ব তথা নিয়মনীতির বেরিয়ে আসে নিশ্চয়ই, যা ঐ বিশুদ্ধ সাবেকি দর্শনকে সমৃদ্ধ করে। বিপরীতে, ফলিত দর্শন আপামর জনসাধারণের জীবনযন্ত্রণা তথা উদ্বেগে নিজেকে যুক্ত করতে চায়, তাদের বিচার-বিবেচনার হারিয়ে যাওয়ার স্রোতকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। এই ইহজাগতিক সমস্যাগুলিকে সাবেকি দর্শন অবজ্ঞা করে এসেছে, এসব 'আমাদের বিষয় নয় বলে এড়িয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে কিছু প্রতিবাদ অবশ্য উঠেছে দর্শনের জন্য দর্শন' ভাবনার বিরুদ্ধে। হিউম, ডিউই ও মার্কসের সঙ্গে জি.সি দেব প্রমুখ মানবদরদী দার্শনিকের প্রতিবাদ আমরা দেখেছি। তবে সেসব খুচরো প্রতিবাদ সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। আজকের ফলিত দর্শন এসব কিছুর সার্থক-পরিণতি বলে আমার মনে হয়।

ফলিত দর্শনের একটি সুসংবদ্ধ পরিচয়দানের প্রচেষ্টা আমরা সাম্প্রতিকালে লক্ষ করি কাসপার লিপ্পার্ট-রাসমুজেন - এর 'The Nature of Applied Philosophy' (লিপ্পার্ট-রাসমুজেন, ২০১৭: ৩-১৭) -প্রবন্ধে। লিপ্পার্ট-রাসমুজেন ফলিত দর্শনের ৭টি মানদণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ফলিত দর্শনের স্বরূপ নিরুপণে তিনি যে সাতটি মানদণ্ডের সন্ধান দিয়েছেন সেগুলি এরকম: (১) প্রতিদিনকার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে তথা দ্বিধাদ্বন্দ্বে দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance); (২) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশ্নকে তুলে আনা ও তার উত্তর খোঁজার ক্ষমতা (Specificity); (৩) দ্বিধাদ্বন্দ্বে পরিশ্রান্ত জীবনের বিবেক-যন্ত্রণায় কী করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ (Practicality); (৪) আমাদের ইহজগতে নির্দিষ্ট কোনো পরিবর্তনের সূচনা করার সামর্থ্য (Activism); (৫) সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া (Factuality); (৬) সরাসরি দর্শনের জগতের মানুষ নন এমন জনসাধারণকে সুবিধা প্রাপক হিসাবে অঙ্গীকৃত করার ক্ষমতা (non-philosopher audience); (৭) দর্শন-সুলভ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ (adequate methodology)। ফলিত দর্শনের ধারণাটি অনেকখানি নির্দিষ্ট হবে যদি আমরা লিপ্পার্ট-রাসমুজেনের এই মানদণ্ডগুলি খতিয়ে দেখি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি বলেছেন 'Philosophy is applied if, and only if, it is relevant to important questions of everyday life' (P.4) অস্যার্থ, সেই ধরনের দর্শন-চর্চাকে ফলিত দর্শন বলা যাবে যদি এবং কেবল যদি তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বিবেচনায় প্রসঙ্গিক হয়। আজকের মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা পরিবেশ-সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যায় জেরবার। এসব সমস্যাকে বুঝতে ও সমাধান খুঁজতে যথার্থ কাজে আসে যে দার্শনিকতা তাই ফলিত দর্শন। (কিছু গা-জোয়ারি দর্শনবেত্তা আছেন যাঁরা অবশ্য উদাসীন ভঙ্গিতে বলে চলেন, দর্শন-এর সবকিছুই কাজে লাগে!) অবশ্য একথা ঠিক ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী হাঙ্গার-ইনডেক্স-এ একদম পিছিয়ে পড়া ভারতের ক্ষুধাতুর জনসাধারণকে চাল বা আটা কিনে দিতে পারে না দর্শন। কিন্তু কেন তাদের ঘরে আজ চাল নেই তার হাল-হকিকত বুঝতে দর্শন সাহায্য করতে পারে। দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অনেক কারণ আছে, তেমনি সাবেকি নীতি দর্শনের ভ্রান্তদর্শী ধ্যানধারণাও এর কারণ হয়, দরিদ্রতম মহনাগরিকদের সাহায্য করা বৈভব প্রাচুর্যে থাকা নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব বা আবশ্যিক কর্তব্য - সেকথা সাবেকি নীতিদর্শন বলেনি। তাঁরা এক কর্তব্যাধিকর্ম (Supererogatory act) বলেই গণনা করেছেন। কিন্তু আজকের নীতিদার্শনিকরা এই ধরনের ভ্রান্তদর্শী ধ্যানধারণাকে পরিশুদ্ধ করে নতুন করে দারিদ্র্যের দর্শন করার চেষ্টা করছে। আজকে ধান্দার পুঁজিবাদ কীভাবে ধনবৈষম্যকে নতুন করে বাড়িয়ে তুলেছে তার জন্য পুঁজিবাদের রাষ্ট্রনীতি তথা বিশ্বায়নের প্যাঁচ-পয়জার জানা দরকার। তেমনই অদূর অতীতে দিল্লির রাজপথে ঘটা নির্ভয়া কাণ্ড বা উত্তর প্রদেশের ইথারসের ঘটনা কেন একই রকমভাবে ঘটে চলেছে তা বোঝার জন্য সাবেকি পুরুষ-বীক্ষা তথা পুরুষতন্ত্রের শব-ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়। জি.সি

দেব কথিত 'ঘৃণার দর্শন' সাধারণ ভাষায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ তা আজকের কথিত সত্যোত্তর (Post-truth) যুগে কীভাবে আমাদের চিন্তকর্মের জগৎকে গ্রাস করেছে তার বিচার বিশ্লেষণে যে দর্শন সামনে থাকে তাই ফলিত দর্শন। অন্যদিকে বিগত শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে 'হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট'- এর কথিত সাফল্য তথা আবিষ্কার কীভাবে আমাদের মানবিক, নৈতিক ও আইনি চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করছে তা তুলে ধরতে যে দর্শন প্রাসঙ্গিক তাই ফলিত দর্শন।

দ্বিতীয়ত, সেই দর্শনচর্চাকে আমরা ফলিত আখ্যা দেব যদি এবং কেবল যদি তা অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা বা নীতিবিদ্যার মতো কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা করতে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি আমি বাকক্রিয়া কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাই তাহলে তা হবে বিশুদ্ধ দর্শন। কিন্তু যদি প্রশ্ন তুলি অবমাননাকর বাকক্রিয়া কাকে বলে (যা কোন নির্বাচনের আবহে আজকালের নেতা নেত্রীরা হামেশাই করে থাকেন! তাহলে তা হবে ব্যবহারিক দর্শনের প্রশ্ন। অনুরূপ, নারীর প্রতি বৈষম্যের কোন বিষয় অধ্যয়নে গিয়ে যখন 'স্ট্যান্ড পয়েন্ট এপিস্টিমোলজি'তে প্রবেশ করি, তখন তা হবে ফলিত জ্ঞানতত্ত্ব বা ব্যবহারিক দর্শন।

তৃতীয়ত, সেই দর্শনকে আমরা ফলিত দর্শন বলব যদি এবং কেবল যদি তা দর্শনের কোনো একটি প্রাসঙ্গিক শাখায় আমাদের ঠিক কী করা উচিত - এরূপ নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে পারে। যেমন - প্রাণদায়ী প্রয়োজন ছাড়া আমরা প্রাণীহত্যা করবো কি না, বা ছাগল-গোরুর মাংস খাবো কি না – এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়ার যে প্রচেষ্টা পিটার সিঙ্গার তথা টম রেগান করেছেন তা ফলিত নীতিবিদ্যা তথ্য ব্যবহারিক দর্শন। এই ধরনের প্রশ্নের নঞর্থক উত্তরের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে সিঙ্গার কি না করেছেন! পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষজনের নিরামিষ রেসিপি পর্যন্ত তৈরি করে দিয়েছেন। যা এ পর্যন্ত কোনো দার্শনিককে করতে দেখা যায়নি।

এখানে মনে হতে পারে, এ তো ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র! তাহলে আবার ফলিত দর্শনের কথা বলার কি দরকার! আপাত দৃষ্টিতে 'ফলিত নীতিশাস্ত্র = ফলিত দর্শন' এরূপ মনে হতে পারে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, যখন প্রাণীহত্যার কথা বলা হচ্ছে, তখন আমাদের কি করা উচিত তা যেমন ফলিত নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন তেমনি প্রাণের মর্যাদার বিষয়টি আধিবিদ্যক তথা সত্তাতাত্ত্বিক প্রশ্ন। এর মীমাংসা করতে আমদের অধিবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। একইরকম, ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদার বিচার না করে নীতিবিদ কি সিদ্ধান্ত করতে পারেন ভ্রূণহত্যা উচিত কি না? অধিকন্তু, বেশকিছু প্রশ্ন বা আনুষঙ্গিক বিষয় আছে যেগুলি ঠিক নীতিআদর্শ সম্পর্কিত নয়। যেমন আমরা নানা ধরনের আচার-বিচার তথা বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হই এবং যেমন খুশি কাজে নেমে পড়ি। এখন এসব বিশ্বাসের জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্য কতটা তার বিচার করতে গেলে

আমাকে তো জ্ঞানবিদ্যার সাহায্য নিতেই হবে। আর এই জ্ঞানবিদ্যা যেহেতু আমাদের বাস্তব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তাই তা ফলিত জ্ঞানবিদ্যা। অর্থাৎ যে কথাটি আমরা বলতে চাই তা হলো, ফলিত দর্শনমানে কেবল ফলিত নীতিবিদ্যা নয়, বরং আরও অনেক কিছু (যার মধ্যে ফলিত অধিবিদ্যা, ফলিত যুক্তিবিদ্যা, ফলিত রাষ্ট্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত)।

চতুর্থত, কোনো দর্শনকে আমরা ফলিত দর্শনরূপে স্বীকৃতি দেব যদি এবং কেবল যদি তা এই জগতে কোন একটি পরিবর্তনের উচ্চকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত হয়। বলাবাহুল্য, কোনো বিচার-আচার, তত্ত্ব বা মতাদর্শ বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত হলে তবেই প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে। দর্শনের শ্রেণিকক্ষে আমরা কত কি মহান তত্ত্ব, ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি। কিন্তু সেসব আমাদের বাস্তব জীবনকে কতখানিই বা স্পর্শ করে। হেগেলের দর্শনতত্ত্বের আলোচনা আমরা অনেকেই করে থাকি। কিন্তু তাঁর দ্বান্দ্বিক চিন্তাধারাকে মহামতি মার্কস যখন জগতের বাস্তব পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হলেন তখনই জন্ম নিলো ফলিত দর্শনের, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন-চিন-কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার মূর্ত পরিণাম। অনুরূপ, কোনো নারীবাদী যখন জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকে নারীমুক্তির সোপান হিসাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন, তখনই তা নারীবাদী দর্শন তথা ফলিত দর্শনের অভিধা পায়। আমাদের এই সমাজব্যবস্থার কঠোর কঠিন জীবনের কিছু পরিবর্তনের আশায় যখন দর্শনের প্রয়োগ হয় তখন তা ফলিত দর্শনের রূপ লাভ করবে।

পঞ্চমত, কোনো দর্শন ফলিত দর্শনের আখ্যা পেতে পারে, যদি এবং কেবল যদি তা বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তথ্য প্রমাণ, বিশেষ করে, সমকালীন বিজ্ঞানের তথ্য-প্রমাণগুলিকে সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করে দর্শনচর্চায় অগ্রসর হয়। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ দর্শন প্রধানও অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ শাস্ত্র, যা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা তথা যুক্তি দিয়ে ধারণাগত সার্বিক তথা চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। ফলিত দর্শন কিন্তু বাস্তব ঘটনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা তথা বিজ্ঞান সমূহের শেষতম সত্যগুলির উপর ভিত্তি করে দর্শন চর্চা করে। যেমন, আজকের মনোদার্শনিকরা মনে করেন, স্নায়ুবিজ্ঞানের বাস্তব গবেষণাকে পাশে সরিয়ে রেখে মনোদর্শনের আলোচনা কখনও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। প্রসঙ্গত, পিটার সিঙ্গার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বাস্তব তথ্য তথা ঘটনার দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সাবেকি দার্শনিকেরা প্লেটোকে অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করেন যে দর্শন বিশুদ্ধ চিন্তনের বিচরণক্ষেত্র, বাস্তব জীবনের আপতিক তথ্য বা অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুলে তাকে বিপথগামী করা উচিত নয়। কিন্তু আজকের দর্শনবেত্তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য প্রমাণের উপর নজর রেখেই দর্শন আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। দার্শনিক কোয়াইনের 'ন্যাচারালাইজেশন অফ এপিস্টিমোলজি' এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ষষ্ঠত, দর্শন ফলিত দর্শন বলে গৃহীত হবে যদি গোষ্ঠী কথিত অর্থে দর্শনের জগতের বাইরের মানুষ হয়। লিপ্পার্ট-রাসমুজেনের ভাষায় "Philosophy is applied it and only if its intended audience is non-philosophers." (P.14) দর্শনের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে দর্শন আলোচনা তা বিশুদ্ধ দর্শন। এই ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে দর্শনকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টার মধ্যে দিয়েই ফলিত দর্শনের অভ্যুদয় ও অগ্রগমন। সাধারণ মানুষগণের দৈনন্দিন জীবনবোধ ও চিন্তা- চেতনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য যখন এই শাস্ত্রকে ব্যবহার করা হয় তখন তা ফলিত দর্শনের রূপ লাভ করে।

সপ্তমত, কোনো দর্শন ফলিত দর্শন-এর অভিধা পাবে যদি এবং কেবল যদি সাবেকি দর্শনের ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে গিয়েও দর্শনে অনুসৃত পদ্ধতিগুলির সার্থক অনুশীলন করা হয়। বলা বাহুল্য, বাস্তব জীবনের নানাবিধ সমস্যা থাকে এগুলি সমাধানের বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্র ও তাদের পদ্ধতি প্রকরণ রয়েছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যখন কোনো সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়, এবং তার সমাধান করার চেষ্টা হয় দর্শনের জগতে ব্যবহৃত বিশেষ পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেই, যেন তা হয় ফলিত 'দর্শন' হয়ে উঠতে পারে। যেমন সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ, দৃষ্টির অগোচরে থাকা পূর্বস্বীকৃতির উদঘাটন অবরোহ বা দ্বান্দ্বিক যুক্তি পদ্ধতি তথা চিন্তন-পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যখন জীবনের কোন বাস্তব সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তখন তা ফলিত দর্শনের চেহারা নেয়। বর্তমানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতিও দর্শনের প্রয়োগের ছাড়পত্র পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও অনেক নতুন নতুন বিচার-পদ্ধতি সামনে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেকোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হোক না কেন, তা পরিণামে যেন দর্শনই থাকে। তাই অনেকে মন্তব্য করেছেন, ফলিত দর্শন দর্শনই এবং তা সার্থক হবে যদি তা দর্শনের উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে। (ফলিত দর্শনের পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলার আছে। প্রবন্ধের পরিসরের সীমার কথা মনে রেখে তা থেকে এখন বিরত হচ্ছি। বারান্তরে সে প্রসঙ্গে আসা যাবে।) প্রসঙ্গত, অধ্যাপক লিপ্পার্ট-রাসমুজেনের প্রস্তাবিত এই সাতটি মানদণ্ড সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে এই সাতটি মাপকাঠি বা বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক বা পর্যাপ্ত বলে কেউ মেনে নাও নিতে পারেন। আমরা এর সঙ্গে কোন মানদণ্ড যোগ করতে পারি, বা এর থেকে কিছু বাদও দিতে পারি। তবে আমার মনে হয়েছে এই বিধরম থেকে ফলিত দর্শনের একটি পরিচয় পাওয়া যায় তাই লিপ্পার্ট-রাসমুজেনকে অনুসরণ করেই আমি ধারণাটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে একটি কথা: জি. সি. দেবের সমন্বয়বাদের সূত্র ধরে আমরা ফলিত দর্শনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছি। ফলিত দর্শনে বাস্তব পরিস্থিতি ও নিয়মনীতির সমন্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে তা আবশ্যিক। কিন্তু সমন্বয়ের নেশায় যেন আমরা ফলিত দর্শনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হই। ধান্দার পুঁজিবাদের সঙ্গে মানবিক সমাজতন্ত্রের খাড়াখাড়ি বিরোধ উপস্থিত স্থলে আমরা যদি সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিতে বিলম্ব করি তাহলে আমরা 'কমনমেনস ফিলোসফি' বা জনসাধারণের পক্ষে ফলিত দর্শন ইত্যাদি যাই বলি না কেন- তার থেকে অনেকদূরে পিছিয়ে যাবো না কি?

উৎসপঞ্জি

Kurtz, Paul. (1986). *The Transcendental Temptation: A Critique of Religion and the Paranormal*. Amherst: Prometheus Books.

Dev, G.C. (1980). *Works of Govinda Chandra Dev* (Collected & edited by Hasan Azizul Haq). Vol-1, Dhaka: Bangla Academy.

Lippert-Rusmussen, Kasper (2017). "The Nature of Applied Philosophy." *A Companion to Applied Philosophy* (Eds. Kasper Lippert-Rusmussen, Kimberley Brownlee and David Coady). Malden: Wiley Blackwell.

পাল, সন্তোষ কুমার (২০২১) : *ফলিত নীতিশাস্ত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: লেভান্ত বুকস্।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক : নবতর চেতনায় উজ্জ্বল

সৈয়দ আজিজুল হক*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিকেরা কোন নতুন চেতনাকে নিজ নিজ সত্তায় ধারণ করে তাঁদের লেখনীকে নতুন নন্দনভাবনায় আলোকিত করলেন, তারই স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। এই চেতনার স্বকীয়তা কোথায়, এই চেতনা কোন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে উৎসারিত, তারও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৭-এ যে পরিবর্তন বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে ঘিরে সূচিত হয়, তার রয়েছে নানা মাত্রা। চল্লিশের দশকে উত্থিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামোর দাবি সর্বমহল থেকে আদৃত হয়নি, বরং সম্প্রদায়গত স্বার্থের প্রশ্ন থাকায় তা কারো কারো কাছে বেশ নেতিবাচক বলেই পরিগণিত হয়। কিন্তু ওই দাবির মূলে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি যে সক্রিয় ছিল, তা অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে বা সচেতনভাবে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা সর্বব্যাপক আন্দোলনের তীব্রতার মধ্যেই অর্থনৈতিক মুক্তি বিষয়ক সত্যটি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়, তা জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয় সন্ধানের ক্ষেত্রে এ দেশবাসীকে পৌঁছে দেয় রেনেসাঁসপুষ্ট বা নবজাগরণধর্মী মানবতান্ত্রিক পরিসরে। পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিকেরা এই চেতনাকেই ধারণ করে উপন্যাস-কাঠামোয় এর মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত হয়েছে তারই সারসত্য।

বাংলাদেশের সাহিত্যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক একটি বিশেষ মাত্রা নিয়ে উপস্থিত। এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবেদন মোটেই একরৈখিক নয়; তা বহুরৈখিক, ব্যঞ্জনাময়, আর তার প্রভাব বহুদূরপ্রসারী। ১৯৪৭এ সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির বাস্তবতা দিয়েই এর তাৎপর্য পুরোপুরিভাবে অনুভবযোগ্য নয়। ১৯৪৭এর রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তন নতুন যে বাস্তবতা সৃষ্টি করে তা চেতনালোকের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে অন্য এক বাস্তবতারও জন্ম দেয়। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিনথেসিসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক নতুন বাস্তবতা ও জাগরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এর পেছনে ১৯৪৭এর পরিবর্তনের ভূমিকা নিশ্চিতভাবে আছে। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিনথেসিসের মাধ্যমে সৃষ্ট নবতর এক চেতনা। এই বহুকূলপ্লাবী চেতনাই বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণভোমরা, নতুন নন্দনচিন্তার উৎসবিন্দু। নিশ্চিতভাবে বিষয়টির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭-এর পরিবর্তনের পেছনে সক্রিয় ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের এক দীর্ঘ সংগ্রামের বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যান। সেই সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে এর সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন একটি দাবি। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু জনসমষ্টি, যারা প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনে এবং সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির চাপে পর্যুদস্ত ও পতিত, তারা এই নতুন দাবি উত্থাপন করল। এর পটভূমিতে সক্রিয় ছিল তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার এক করুণ কাহিনি। তা হলো, ঔপনিবেশিক শাসকের পাশাপাশি ওই শাসনের সুবিধাভোগীদের দ্বারাও একইভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়েছে তারা। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তারপর ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তারা ওই ব্যবধানকে আরো গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং এসব থেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের কাছে অনুমিত হয় যে, ঔপনিবেশিক প্রভুরা ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেও তাদের দুর্দশার অবসান ঘটবে না। উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও সর্বভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শে তারা সংখ্যালঘু হিসেবে একইরূপ শোষণ-পীড়নের শিকার হবে। এরূপ উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই উত্থাপিত হয় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামোর দাবি। এই দাবির মর্মার্থ হলো, সংখ্যালঘুর আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক মুক্তি, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিভেদমূলক শাসননীতির পরিণামেই যে এটা ঘটল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি একটি কারণ মাত্র; আরেকটি কারণ, সংখ্যাগুরুর অনুদারতা, তাদের বিদ্বেষমূলক আধিপত্যকামী মনোভাব।

১৯৪৭এর রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূলে এসবকিছুর ভূমিকা অনুধাবনীয়। আর এভাবে তৈরি হয় একটি অ্যান্টিথিসিস। কিন্তু ঘটনাধারা এখানেই থেমে থাকে না। নতুন রাষ্ট্রের দাবি পূরণের জন্য শুধু ভারতবর্ষই বিভক্ত হয়ে পড়ে না, ভাগ হয়ে যায় দুই প্রদেশ– পাঞ্জাব ও বাংলা। আর সেই বিভক্তিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার মতো বিশাল মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বাংলার বৃহদংশ যে নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রথমেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। যে অর্থনৈতিক মুক্তিকল্পে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাদর্শের দাবি মুখ্য হয়ে উঠেছিল, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেই অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাই রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে নতুন দাবি, নতুন সংগ্রাম, নতুন আন্দোলনে জাগ্রত হয় বাংলাদেশের মানুষ। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সিনথেসিসে পৌঁছায় এই সংগ্রাম। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। এর মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক এক রেনেসাঁসের জন্ম হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় নবজাগরণ। এই রেনেসাঁস কলকাতাকেন্দ্রিক উনিশ শতকীয় নবজাগরণের তুলনায় অনেক বেশি সমগ্রতাস্পন্দী, অনেক বেশি সর্বসম্প্রদায়স্পর্শী। দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির ভিত্তিতে ভারত-বিভক্তির বাস্তবতা অনেকের কাছেই নেতিবাচক বলে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জাতিসত্তার যে নতুন পরিচয় আবিষ্কৃত হয়, রেনেসাঁস-উদ্ভূত মানবতন্ত্রের যে চেতনা জাগ্রত হয়,

তা আমাদের জন্য খুবই ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। উপন্যাস বিশ্লেষক রণেশ দাশগুপ্ত লেখেন :

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো ৫২ সালের বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম একটি সমাজতান্ত্রিক গণবৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামের রূপও নিতে শুরু করলো। ধর্মনিরপেক্ষতার তাগিদও এতে সন্নিবেশিত হলো। বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানকে উপন্যাসের শিল্পরূপে পাবার জন্য একটা প্রত্যাশারও সৃষ্টি হলো অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। পঞ্চাশের দশকটি এদিক দিয়ে যেন 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ।' (রণেশ, ১৯৭৬: ২০৫)

রণেশ দাশগুপ্তের এ সংক্রান্ত মূল্যায়ন আরো তাৎপর্যবহ :

> ৪৮ সালেই বাংলা ভাষার দাবীতে ছাত্র জনতার খণ্ডবিদ্রোহ বাংলাদেশে আনলো অবাধ্যতার ঢেউ। ৫২ সালে এল নবজাগরণ। ৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাভাষার মর্যাদার দাবীতে বিপ্লবী গণ-অভ্যুদয় একদিকে যেমন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার সংগ্রামে গণমাতৃভাষার ভিত্তিতে সমাজের সমস্ত চাপাপড়া স্তরগুলিকে উঠিয়ে এনে এবং মুখর করে তুলে তাদের একত্রিত হবার পথ উন্মুক্ত করে দিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক গণ-আবেদনমূলক সৃষ্টিরও চাহিদা তৈরি করলো। তৈরি হলো গভীরতর এবং ব্যাপকতর অনুসন্ধিৎসা ও তার চাহিদা। (রণেশ, ১৯৭৬: ২০৬)

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে যে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে তারা সকলেই ছিলেন রেনেসাঁসের মর্মবাণী-পরিস্রুত। নতুন দেশ, নতুন চেতনা, নতুন জাতিসত্তার বোধ ও নতুন উদ্যমে তাঁরা ছিলেন উজ্জীবিত। সমালোচকের সমর্থনসূচক বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> ... রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আন্দোলন ২১শে ফেব্রুয়ারির মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের পটভূমিতে বাঙালীর চেতনা-চৈতন্যে এক নতুন মূল্যবোধের সঞ্চারে সক্ষম হয়। পঞ্চাশের দশকের ঘটনাপ্রবাহে আধুনিক মুসলিম মধ্যবিত্ত-মানসের স্বপ্নভঙ্গ ও নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের ধারায় নব্যশিক্ষিত তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এক স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।... সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে পৃথক এক ভাবমূর্তিতে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলিম মানসের মুক্তিপ্রয়াস স্পষ্টতর অভিব্যক্তি অর্জন করে।... তরুণ বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটায়। (মুহম্মদ রেজাউল, ১৯৮৯: ২৯৫-৯৬)

নবতর এই সমাজবাস্তবতাকে শিল্পরূপ দানের আগ্রহে সাহিত্য পরিমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করেন বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক। সত্যেন সেন (১৯০৭-৮১), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-৮৬), রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-৭১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আবদুল গাফফার চৌধুরী (জ.১৯৩৪), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), জহির রায়হান (১৯৩৫-৭২), শওকত আলী (১৯৩৬-

২০১৮), রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১) প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[১]এঁদের কারো লেখা প্রকাশিত হতে ষাটের দশক লেগে গেলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁরা যে পঞ্চাশের দশকেরই তার সমর্থনে হাসান আজিজুল হকের (১৯৮১ : ২২) বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> শহীদুল্লা কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও জহির রায়হান ঐতিহ্যের দিক থেকে পাঁচের দশকের লেখক। কিংবা, পাঁচের দশকের মাঝামাঝিতে লিখতে শুরু করেছেন আরো ক'জন নতুন লেখক... সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী,রাজিয়া খান, শওকত আলী–... এঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছেন নগরের দিকে– নির্মীয়মাণ শহরের দিকে এবং সাহিত্যের কেন্দ্রে আনার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তি।... সেই সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতা। আমার ধারণা এই তিনজন [প্রথম তিনজন] লেখকের সঙ্গে পশ্চিমা আধুনিক কথা-সাহিত্যের নিবিড় পরিচয় ঘটেছিলো।... এঁদের লেখাতেই আমরা প্রথম দেখা পাই সেই বিশিষ্ট লক্ষণ যাকে বলা যায় আধুনিকতা। (হাসান, ১৯৮১: ২৫)

হাসান আজিজুল হকের বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে বলা যায়, পঞ্চাশের দশকের কথাকাররা বিধৃত করলেন এই নতুন দেশকে ঘিরে নব চেতনায় উজ্জীবিত মানবমণ্ডলীর নতুন জাগরণমূলক স্পন্দনকে, তার নবগঠিত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত জাতিভাবনাকে। আর তা করার জন্য তাঁদের নিশ্চিতভাবে মনে রাখতে হলো পেছনের পটভূমিকে, চল্লিশের দশকে পরিপক্ব উপনিবেশবাদবিরোধী এক ব্যাপক সংগ্রামযজ্ঞকে। শুধু চল্লিশের দশকেই সীমাবদ্ধ থাকল না এ দৃষ্টি; উপনিবেশবাদের বিপক্ষে পরিচালিত গত দুশো বছরের সংগ্রামের স্বরূপকেও তাঁরা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হলেন উপন্যাসের পরিকাঠামোয়।

ভারতবর্ষের পটভূমিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বঞ্চনাকাতর জীবনের মর্মবেদনাকে তাঁরা উপলব্ধি করলেন। আর তা থেকে মুক্তিলাভের পথ সন্ধানের অভিযানকেও দেখলেন সত্যদর্শীর সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিতে। মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ বিশ্লেষণের পাশাপাশি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার বিপরীতে সংস্কারমুক্ত সংগ্রামশীল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ঘাটনও তাঁরা করলেন। ক্ষমতালিপ্সু পুরুষতান্ত্রিক ধর্মান্ধ মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে নারীর মানবোচিত জীবনবাদী সংগ্রামের ন্যায়পরতাকে তাঁরা যথার্থভাবেই চিহ্নিত করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন সামন্তবাদী ও বণিক সমাজের শোষণমূলক স্বার্থদ্বন্দ্বের পাশাপাশি তাদের ঐক্যের বিপরীতে নিম্নবর্গের মানুষের উত্থানের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে। তাঁরা লক্ষ করলেন প্রথাগত ধর্মের আচারনিষ্ঠ অন্ধত্বের বিপরীতে আমাদের লোকায়ত সমাজের উদারনৈতিক প্রাণবন্ত হৃদয়-উৎসারী মানবধর্মকে। গ্রামীণ পটভূমিতে নিম্নবর্গের জীবন যে ঔপন্যাসিকদের অন্বিষ্ট হয়ে উঠল সেদিকটি মহীবুল আজিজেরও দৃষ্টিভূত হয়েছে :

> উনিশশ' সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের পর সদ্য স্বাধীন দেশে বাংলাদেশের প্রধান ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয় বাংলাদেশের গ্রাম এবং সেখানকার সাধারণ

> মানুষ। এসব মানুষ রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পরিণতিতে সৃষ্ট স্বাধীন দেশেও পূর্বের মত নিম্নস্তরে অবস্থানরত। স্বাধীনতার ফলে তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় শুধু পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রের উদ্যোগের মধ্যে অবহেলিত গ্রামের নিম্নবর্গ উপন্যাসে স্থান পেল সমাজ-ইতিহাসের সমগ্রতায়। তাঁদের উপন্যাসের কাহিনী ঘিরে কেবল নিম্নবর্গ চরিত্রই এলো না, এলো সমাজ সংস্থানের বিচিত্র খুঁটিনাটিও, যাতে উপন্যাসের কল্পিত জগতে বাস্তবের একটা সামগ্রিক অবয়ব ফুটে ওঠে। (মহীবুল, ২০০২: ২৩৪)

ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভূত হলোএ অঞ্চলের দুশো বছরের রুদ্ধবিকাশ নগরজীবনের নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। সেই জীবনের আধুনিক প্রাণধারা, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রুচিশীল প্রবণতা, নর-নারীর প্রণয় আর বন্ধুত্বে বিকশিত কুসংস্কারমুক্ত সজীব জীবন-উত্থান তাঁদের উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে তুলল। পাশাপাশি নর-নারীর সম্পর্কসূত্রেই অতি আধুনিকতার নামে আবার ক্লেদময়, গ্লানিকর, বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ ও নৈঃসঙ্গ্যক্লিষ্ট জীবনধারার চিত্রও পরিবেশিত হলো। তবে উচ্চবিত্ত পর্যায়ে ভোগবাদী জীবনবৈশিষ্ট্যের বিপরীতে ত্যাগধর্মী আবেগদীপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অনন্য সব আখ্যানেও মহিমান্বিত এ কালের উপন্যাসের অবয়ব। শুধু প্রণয়াবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে তরুণ-তরুণীর ত্যাগ-স্বীকার কিংবা সংযম প্রদর্শন নয়, দেশপ্রেমে জীবন উৎসর্গ করার ঘটনাও এ কালের উপন্যাসকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। ক্রমবর্ধিষ্ণু কোলাহলকণ্টকিত নগর পরিমণ্ডলে বৈপরীত্যে ভরপুর দুই প্রন্থের জীবন-পরিসর সততার সঙ্গেই চিত্রিত হয়েছে।

উপনিবেশবাদী শোষণ-শাসন থেকে মুক্তির প্রেরণা এ কালের ঔপন্যাসিকদেরও সৃষ্টিশীলতার উৎস। এই মুক্তিচিন্তা ব্রিটিশ শাসকশক্তির বিরোধিতা থেকে ১৯৪৭-উত্তরকালে রূপান্তরিত হয় পাকিস্তানবাদী আধা-ঔপনিবেশিক শাসন- শোষণ-বিরোধী মনোভঙ্গিতে। এই রূপান্তরকে আমাদের এ কালের ঔপন্যাসিকেরা যথাযথভাবেই উপলব্ধি ও চিত্রিত করেছেন। এই অনুভবের পেছনে সক্রিয় ছিল বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের একাত্মতার বোধ। আর এই শোষণমুক্তির চিন্তাই তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে বৃহত্তর মানবমুক্তির প্রান্তরে।

গ্রামীণ পটভূমিতে উদারনৈতিক মানবিকতা

আমাদের একালের ঔপন্যাসিকদের কাছে গ্রামজীবনের আবহ চিত্রণের বিষয়টিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নগরজীবনের ব্যাপ্তির অভাব যেমন এর কারণ, তেমনি মধ্যবিত্ত পরিসর থেকে আগত লেখকদের গ্রাম-পটভূমি থেকে আগমনের বাস্তবতাও এক্ষেত্রে কার্যকর। আমরা এ পর্যায়ে চারজন ঔপন্যাসিকের চারটি উপন্যাসকে প্রতিনিধিত্বমূলক বিবেচনা করে তাঁদের অন্বেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করব।

আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) উপন্যাসে অন্বিষ্ট গ্রামীণ

জীবনের বাস্তবতাসূত্রে মূলত বাংলাদেশের সমাজজীবনেরই একটি সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। স্বামী-পরিত্যক্ত, নিঃস্ব ও নিঃসহায় এক নারীর কঠিন জীবনসংগ্রামের ও দারিদ্র্যের নির্মম আখ্যান হিসেবেই এ উপন্যাস তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল এই নারী শুধু নিজের জীবন নয়, দুই স্বামীর ঔরসজাত দুই সন্তানের জীবনরক্ষার এক কঠিন দৃঢ়পণ সংগ্রামেও ব্যাপৃত।

সমালোচক যথার্থভাবেই বলেন, এ উপন্যাস 'উন্মূলিত জয়গুন-পরিবারের জীবন-অন্বেষার কাহিনী' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ১৯)। উদ্ধারযোগ্য আরেক সমালোচকের বক্তব্যও: 'দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের পটভূমিকায় এদেশের সংগ্রামশীল নর-নারীর জীবনকে উপস্থাপন করে লেখক তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।' (মনসুর, ১৯৭৪:৮১)।

আমরা লক্ষ করি, মাতৃত্ববোধজাত এক অসাধারণ দায়িত্বশীলতা জয়গুনকে ভেতর থেকে শক্তি জোগায়, করে তোলে জীবনবাদী, সংস্কারমুক্ত। কিন্তু তার এই সংগ্রামের পথে প্রতিনিয়ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় ও সামাজিক নানা কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, নারীবিরোধী পুরুষতান্ত্রিক নির্মমতা। কিন্তু এই নারীর মাতৃত্বজনিত দায়িত্ববোধ এতই প্রবল যে, সকল প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও সে থাকে অনবদমিত, অকুতোভয়। পুরুষতান্ত্রিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধে নারীর এই অপরাজেয় মনোভঙ্গিই উপন্যাসটিকে মহত্ত্ব দান করেছে। এই উপন্যাসে স্পষ্টত ১৯৪৭--এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনাকালীন বাস্তবতা বিধৃত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল আর্থিক কল্যাণের এক গণস্বপ্ন, যা বিপুল আনন্দের কারণ হয়েছিল, কিন্তু দ্রুতই তা অচরিতার্থতায় পর্যবসিত হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্রমধারায় মানুষের, বিশেষ করে গরিবের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে; রক্ষিত হয় ধনীর স্বার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী, প্রশাসক ও জনপ্রতিনিধির স্বার্থ। এই পরিবর্তন বাংলার দুই অংশকে দুই রাষ্ট্রের অধীন করে তোলায় উন্মূলিত হওয়ার যে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয় তার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি জন্মভূমি ত্যাগ না-করার দৃঢ় মনোভঙ্গিও ব্যক্ত হয়েছে এ উপন্যাসে। সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ নিয়ে প্রচলিত ডিসকোর্সের বিপরীতে এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে নতুন সত্য, যেখানে দেশত্যাগীদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ভূতবিশ্বাসসহ নানাবিধ কুসংস্কারের অধীন মানুষের অপচিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতির জয় দেখিয়ে সমকালীন সমাজবাস্তবতাসহ মুক্তির দিকনির্দেশও করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রথাগত ধর্মের বিধান যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ সম্বন্ধে একটি ন্যায়সংগত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, বিশেষত রোজা নিয়ে। যে দরিদ্র মানুষ কোনোদিন একবেলাও পেটপুরে খেতে পায় না, সারাদিনে একবেলা কোনোরকম খেয়ে বেঁচে থাকে, তার ক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ হলে তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ অধিকসংখ্যক রোজা রাখার প্রয়োজন আছে কি? ধর্মীয় বিধান নিয়ে এই মানবিক ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নটি তৎকালীন রেনেসাঁসজাত ভাবনারই ফল। এই উপন্যাসের একটি শক্তির দিক হলো, গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ রূপ অঙ্কিত হয়েছে এতে। যে সংস্কৃতির মূলে রয়েছে মানুষের দীর্ঘ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার নির্যাস, রয়েছে সর্বধর্মের মিলনের সেতুবন্ধন, শ্রমজীবী পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবর্তে মনুষ্যধর্মের উৎসারণ।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-৮৬) আদিগন্ত (১৯৫৬) উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের শোষণ প্রক্রিয়ার এক নিষ্ঠুর মর্মচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-৭১) লালসালু (১৯৪৮) উপন্যাসে ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে শোষণযন্ত্রের নিবিড় সংযোগ লক্ষণীয়। কিন্তু এ উপন্যাসে একই চরিত্রের মধ্যে শোষক ও ধর্মতান্ত্রিক শক্তি মিলেমিশে একাকার। যিনি পীরসাহেব, তিনিই ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, তিনিই লম্পট, তিনিই খুনী, তিনিই প্রথাগত ধর্মের ব্যাখ্যাদাতা, সমাজের সর্বময় কর্তা। শোষকশক্তি, ধর্মতন্ত্র আর গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোর এই নিবিড় ঐক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অস্ত্রধারী অংশীদার পুলিশি ব্যবস্থা। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের রক্ষাকর্তারাই যখন মানবিক শক্তির বিনাশে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন নিষ্পেষণের রূপটি ভয়াবহতা লাভ করে। কিন্তু লেখক দেখান, ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে মানবিক বোধের ফল্গুধারাটি ক্ষীয়মাণ হলেও ব্যাপক বিস্তৃত পরিসরে প্রবহমান। পদ্মাতীরবর্তী পাবনা অঞ্চলে বাউল-বৈষ্ণব গানের ধারাকে কেন্দ্র করে লোকায়ত পরিসরে উদারনৈতিক মানবধর্মের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে, তার মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের মৌল সত্তাটি অনুধাবনীয়। এই সত্তার সঙ্গে গ্রামীণ পরিসরে ইসলামের আনুষ্ঠানিক ধারা যে বিরোধাত্মক হয়ে ওঠে তারই মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের নতুন রাজনৈতিক ভাবাদর্শের স্ফুরণ লক্ষণীয়। রাজনীতিযুক্ত বলেই প্রথাগত ধর্মের রক্ষণশীলতা আর তার রক্ষাকর্তাদের অধর্মাচরণ, দুর্বৃত্তপরায়ণতাই এর সমাজবিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্ট করে তোলে। অথচ বৃহত্তর লোকসমাজ জুড়ে অবস্থান করে ধর্মীয় সহনশীলতা, হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত স্নেহ-প্রণয়ময় এক মানবীয় সৌন্দর্য, যেখানে প্রথাগত ধর্মের ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে যায়। লেখক পঞ্চাশের দশকের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচনার সময় পূর্ববাংলার এই মৌল প্রবণতাটিকেই আবিষ্কার করেন। মেহের-সরলার প্রণয়ভাবনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক যন্ত্রণাভোগের মধ্যেও সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার পক্ষে তাদের দৃঢ়, অটল ওধৈর্যশীল প্রতিবাদী অবস্থান মহৎ জীবনের স্মারক হয়ে ওঠে। লেখক এ উপন্যাসে পরিণামে যে মানবতারই জয় দেখিয়েছেন তা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎসন্ধানী রাজনৈতিক পরিণতিরই নিশ্চিত ইঙ্গিতবহ। গ্রামীণ লোকায়ত সমাজের মধ্যেই তিনি আমাদের মানবতাধর্মী জাতীয় চেতনার নির্যাসকে অবলোকন করেছেন। সমালোচক মনসুর মুসার (১৯৭৪: ৬৫) ভাষায়, 'লেখকের মানবতাবাদী সহানুভূতি চরিত্রগুলোকে সজীব করে তুলেছে।'

আবদুল গাফফার চৌধুরীর (জ. ১৯৩৪) চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০; রচনাকাল ১৯৫২) উপন্যাসে অন্বিষ্ট হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী জীবনধারা। বিশেষত, বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বিশখালি নদীতীরবর্তী একটি ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জমিদার বংশের পরিণতিই এ উপন্যাসের উপজীব্য। বাংলাদেশে জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয়ের মূলে যে ডিসকোর্সটি প্রচলিত এখানেও তা অনুসৃত হয়েছে। আভিজাত্যগৌরব, প্রজাকল্যাণবিমুখতা, মদ্যপানসহ বাইজি-বিলাসিতায় অর্থ অপচয় প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উঠতি বণিকবৃত্তির নগদ মুদ্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজয়বরণ। লাঠিয়ালপোষণ আর দাসিদেহভোগও এই প্রক্রিয়ারই

অনিবার্য অনুষঙ্গ। তবে এই উপন্যাসের আখ্যানের স্বাতন্ত্র্যের দিক হলো, এখানে সামন্তশোষণের বিপরীতে বণিকের প্রজানুকূল্যের মধ্যেও ছিল শোষণের যে প্রবৃত্তি সেটি প্রজাদের কাছে শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়। আর তার পরিণতিতে লাঠিয়ালসহ প্রজাকুল এই দুই শোষকশক্তির বিরুদ্ধে জীবন রক্ষার লড়াইয়ের আগ্রহে সমষ্টিবদ্ধ হয়। সমালোচক এ উপন্যাসের মধ্যে তাই যথার্থভাবেই অবলোকন করেন 'মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সম্বলিত শ্রেণীচেতনার প্রতিশ্রুতি।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫ :১৯)।

কিন্তু উপন্যাসের উপসংহারে বিদ্রোহী প্রজাসাধারণকে শোষণের স্বার্থে সামন্ত ও বণিক পরিবার পূর্বশত্রুতা বিস্মৃত হয়ে সমঝোতার বন্ধনে আবদ্ধ হলে শোষিতের মুক্তির স্বপ্ন অচরিতার্থ থেকে যায়। লেখক দেখিয়েছেন, শোষকশ্রেণির কাছে শোষণের স্বার্থই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সমালোচক মনসুর মুসা (১৯৭৪: ১০৩) যথার্থভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, 'সামন্ত ও বুর্জোয়ারা পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে যদিও শত্রুতামূলক আচরণ করে, কিন্তু শোষণের ক্ষেত্রে তারা একতাবদ্ধ এবং মিত্রতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ।' শোষক ও শোষিতের বিপরীতমুখী অবস্থানের এই বাস্তবতার চিত্রাঙ্কনেই উপন্যাসটি তাৎপর্য লাভ করেছে। নতুন কালের পটভূমিতে সামন্তশ্রেণি ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যয়ক্লিষ্ট হলেও উদীয়মান বণিকপুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নতুন করে শোষণের কার্যকর কৌশল যে আঁটছে সেই সত্যই লেখক উন্মোচন করেছেন। বাংলাদেশে পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে শোষকশ্রেণির এই বাস্তবতাই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

তাসাদ্দুক হোসেনের (জ. ১৯৩৪) মহুয়ার দেশে (১৯৫৮) উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনধারায় বাংলাদেশের গ্রামীণ পটভূমির সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজবাস্তবতার নিবিড় সংশ্লেষ ঘটেছে। প্রকৃতঅর্থে এটি দিনাজপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের সাঁওতালদের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনেরই দুঃখ-যন্ত্রণার এক মর্মন্তুদ আখ্যান। তাদের অস্তিত্বরক্ষার কঠিনতর প্রাত্যহিক সংগ্রামের সঙ্গে মিশেছে প্রণয়সংক্রান্ত মহিমার পাশাপাশি তার অচরিতার্থতারও এক কঠিন নির্মম কাহিনি। সাঁওতাল জীবনের নানা বিশ্বাস, সমাজসংক্রান্ত নিয়মনীতি, নারীর স্বাধীনতা সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিকতার নিষ্ঠুর পীড়ন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জোতদার-জমিদারের শোষণ আর নারীলালসা। সাঁওতাল তরুণী মংলীর প্রতি প্রণয়কে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মংরু ও চুনুর জীবনে যে দুর্ভোগ নেমে আসে তার মূলে সক্রিয় থাকে শোষক- জোতদারপুত্রের মংলীর দেহভোগে ব্যর্থতাজনিত প্রতিহিংসাপরায়ণতা। সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ...সাঁওতাল পল্লীর মালিক জোতদার গফুর মিয়া প্রতাপশালী ব্যক্তি। সাঁওতালদেরকে বসবাসের জায়গা দিয়ে সে ও তার পুত্রেরা তাদেরকে ইচ্ছামত নিজেদের কাজে লাগাতে ও অত্যাচার-নির্যাতন করতে অভ্যস্ত।... সাঁওতাল যুবতী মংলীকে ধর্ষণে প্রলুব্ধ হয় জোতদারের বড় ছেলে 'পরহেজগার' আহাদ আলী। (মুহম্মদ ইদ্‌রিস, ১৯৮৫: ১৫০)

ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে এই সমালোচক আরো বলেন :

> ...জীবন-সংগ্রামে রত সাঁওতাল উপজাতির সামাজিক জীবন, দারিদ্র্য, তাদের কয়েকজনের খ্রীস্টান হিসেবে ধর্মান্তর গ্রহণ, তাদের আশ্রয়-দাতা জোতদার পরিবার কর্তৃক তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় দিকসমূহ আন্তরিকতার সঙ্গে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। এ গ্রন্থে লেখকের শ্রেণী-সচেতনতার পরিচয় অস্পষ্ট থাকেনি।... জোতদার পরিবারের নৈতিকতাহীন স্বরূপ এবং তাদের অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্যবোধকে লেখক অবশ্য তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপবিদ্ধ করেছেন। (মুহম্মদ ইদ্‌রিস, ১৯৮৮: ৩৭)

তেভাগা আন্দোলনের ফলে সাঁওতাল তরুণ-তরুণীদের মধ্যে স্বাধীন জীবনাকাঙ্ক্ষা ও নতুন যুগের সূচনা ইঙ্গিতময় হয়ে উঠলেও উপনিবেশবাদের প্রভাব এ উপন্যাসের উপসংহার-অংশকে করুণ রসে আর্দ্র করে তুলেছে। মংরু-মুংলী-চম্পার খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ আপাতদৃষ্টিতে প্রণয়জীবনের অচরিতার্থতাজনিত দুর্ভোগ থেকে মুক্তির একটি পথ হিসেবে প্রতিভাত হলেও এর মূলে সক্রিয় থাকে আরেক যন্ত্রণা। সেটি হলো, আপন সত্তা থেকে, মৃত্তিকামূল থেকে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অপরিসীম কষ্ট। উন্মূলিত করার এ উদ্যোগ নিয়েছে উপনিবেশবাদ। এখানে তা সফল করতে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাদানের কৌশল নেওয়া হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মকে সবচেয়ে ভালো ধর্ম, এর ঈশ্বর ও প্রবর্তককে সবচেয়ে মহান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটি উপনিবেশেবাদেরই একটি কূটকৌশলী প্রচারণা। ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের সবকিছুকে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও মহান বলে এবং উপনিবেশিতদের সবকিছুকে হীন-নীচ বলে প্রচার করে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারে সফল হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের পটভূমিতে উপনিবেশবাদী শোষণের এই বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া নবজাগরণের এই কালে প্রান্তবর্তী মানুষের জীবনযুদ্ধের মর্মবেদনার আখ্যান রচনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ।

নাগরিক মধ্যবিত্তের আধুনিক ভাবনা

গ্রামীণ জীবন-পরিবেশের পরই একালের ঔপন্যাসিকদের আরাধ্য হয়েছে নাগরিক জীবন-অনুষঙ্গী বিচিত্র-সব বিষয়। তাঁরা নিজেরা যেমন এই জীবন-পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ তেমনি তাঁদের মননজগৎ জুড়েও ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই জীবনেরই সর্বতোমুখী স্পন্দন। যে আধুনিক জীবনভাবনা ঔপন্যাসিকদের অন্বিষ্ট, যা দ্বারা তাঁদের মন পরিপুষ্ট, তার মূলসূত্র নিহিত এই জীবনস্পন্দনের মধ্যেই। এ অঞ্চলের নগরজীবন তখনও তত প্রসারিত ও সমৃদ্ধ না হলেও ওই জীবনের আধুনিক লক্ষণগুলোর রূপায়ণে লেখকরা ছিলেন আন্তরিক ও একাত্ম। পাঁচজন লেখকের পাঁচটি প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করব ওই কালের নগরকেন্দ্রিক আধুনিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের।

রশীদ করীমের (১৯২৫-২০১১) *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) উপন্যাসে যে নগরজীবনের চিত্র আমরা পাই তা চল্লিশের দশকের, কলকাতার; ঢাকার নয়, তবে ভাবনাটা পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় অবস্থানকালীন, স্মৃতিচারণমূলক। নতুন দেশ সৃষ্টির পটভূমিটি বিশ্লেষিত হয়েছে এই স্মৃতিচারণায়। শাকের-চরিত্রের উত্তম পুরুষের বয়ানে পরিস্ফুটিত হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে বিপর্যস্ত কলকাতার দৈন্য ও হাহাকারের বিপরীতে মুষ্টিমেয় বিত্তবানের আর্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতিহীন বিলাসী জীবনের আখ্যান। বিত্তবানের আভিজাত্যগৌরব, বিত্তহীনের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞার সমান্তরালেই প্রবলভাবে গতিশীল থেকেছে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধান-বিদ্বেষ। তবে উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত পর্যায়ে আভিজাত্যমণ্ডিত আত্মীয়তার চিত্রও লক্ষণীয়। বিত্তের গৌরবে নরনারীর সম্পর্কে ভোগাকাঙ্ক্ষার নৈতিকতাহীন বিলাসিতাও উভয় সম্প্রদায়ে সক্রিয়। অন্যদিকে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণামে শিক্ষা ও আর্থিক সংগতিতে পিছিয়ে-থাকা অভিশপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়টি যখন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি তুলেছে তখন বিপরীত সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী অগ্রসর-অংশের কাছ থেকে মুখোমুখি হয়েছে তীব্র প্রতিরোধের। তবে এ প্রসঙ্গে শাকেরের বয়ানে দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে বা মুসলিমবিদ্বেষী সাহিত্যিকদের তালিকায় যেভাবে রবীন্দ্রনাথকেও যুক্ত করা হয়েছে তা যথার্থ নয়, বরং ত্রুটিপূর্ণ। যথার্থভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাঙালিত্বের সীমানা থেকে মুসলিম বিতাড়নের, এবং সেই সঙ্গে হিন্দুত্ব ও বাঙালিত্বকে অভিন্ন করে দেখার একটি পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক ডিসকোর্সকে। ঔপনিবেশিক শাসনে বিপর্যস্ত সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষের মধ্যে জাগরণের লক্ষ্যে সচেতন হয়ে ওঠার যে রূপ চিত্রিত হয়েছে সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং সেটাই পঞ্চাশের দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর স্বরূপ অনুধাবনে আমাদের সহায়তা করে। শিল্পগতভাবে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার প্রশ্নে আবু রুশদের নোঙর বা সামনে নূতন দিন উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন, 'সেদিক থেকে রশীদ করীমের উত্তম পুরুষ অনেক বেশি সার্থক রচনা–' (হাসান, ১৯৮১: ১৬)।

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০) উপন্যাসটি চিত্রশিল্প ও চিত্রশিল্পীদের জীবন অবলম্বনে রচিত। বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রকলার যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৮এ জয়নুলের নেতৃত্বে ঢাকায় আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের শিল্পীদের সঙ্গে ছিল লেখকের বন্ধুত্ব, যাদের কেউ কেউ পঞ্চাশের দশকেই ইওরোপ থেকে চিত্রশিল্পে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসেছেন। উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে এদের স্পষ্ট ছায়া আছে। করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে জাহেদুল ইসলাম নামে বাংলাদেশের এক শিল্পীর একটি তৈলচিত্র প্রথম স্থান অর্জন করে। এই চিত্র সৃষ্টিসহ ওই শিল্পীর জীবনসূত্রেই বিকশিত হয়েছে এ উপন্যাসের আখ্যান। পঞ্চাশের দশকের ঢাকায় চিত্রশিল্পীদের জীবনসংগ্রাম এবং তাদের জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার সারাৎসার অন্বিষ্ট হয়েছে এখানে। একটি চিত্র কোন জীবনানুষঙ্গে সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কোন গভীর প্রণয়চিন্তা, ত্যাগধর্মে দীক্ষিত প্রলোভনহীন

কোন জীবনানুভূতি তার সবই উন্মোচিত হয়েছে এ আখ্যানে। লেখক প্রণয়ের এক ইতিবাচক, সহানুভূতিস্নিগ্ধ রূপ এখানে এঁকেছেন। সমালোচকের প্রাসঙ্গিক একটি যথার্থ মন্তব্য: 'জীবনের সুস্থতা আর কল্যাণের প্রতি আলাউদ্দিন আল আজাদের আকর্ষণ দুর্নিবার।' (বিশ্বজিৎ, ১৯৯১: ২১)

শিল্পীদের পর্যবেক্ষণসহ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যত বেশি জীবনসংলগ্ন, শিল্প হবে তত বেশি প্রাণবন্ত, সেই সত্যই পরিস্ফুটিত হয়েছে এখানে। তবে আরেক শিল্পী মুজতবার নগ্নিকা অনুশীলনের পাশাপাশি তার নারী সম্ভোগের বিচিত্র চিত্রও পরিবেশিত হয়েছে এ উপন্যাসে। পরিবেশিত হয়েছে নারীদেহ ভোগের প্রতারণাপূর্ণ রূপসহ নারীর বিত্ত-বৈভবের ভিন্নতর কাহিনিও। কিন্তু উপন্যাসে ওইসব কাহিনি এসেছে বাস্তবতার স্বার্থে, লেখকের সহানুভূতিসূত্রে নয়। লেখক এ উপন্যাসে প্রণয়ের মহিমান্বিত রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যে চিত্রটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ আখ্যান তার বিষয় যেমন তরুণী মা ও শিশু, তেমনি তার সমগ্র সত্তাজুড়ে তীব্র প্রণয়ঘন জীবনবোধেরই এক বিস্তৃত ও গভীর অনুরণন। পঞ্চাশের দশকের ঢাকাকেন্দ্রিক নবজাগরণ চিত্রশিল্পী ও ঔপন্যাসিকদের কোন মহৎ জীবনবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ও সৃষ্টিশীলতায় অনুপ্রাণিত করেছে তার বাস্তব প্রমাণসিদ্ধ আখ্যান হিসেবেও এ উপন্যাস তাৎপর্যমণ্ডিত।

সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) দেয়ালের দেশ (১৯৫৯; রচনাকাল ১৯৫৬) উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে। এই আধুনিকতার প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। প্রায় আড়াইশো বছর পরে ঢাকা কেবল প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পেয়ে ক্রমশ স্ফীত হতে শুরু করেছে। আর তারই মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। এই শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রথাগত ধর্মের নিয়মনীতি ও সামাজিক সংস্কারের অনুশাসনের চেয়ে হৃদয়ধর্ম মূল্যবান হয়ে উঠছে। এ উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র ফারুক-তাহমিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অভিরুচি নিয়ে পরস্পর প্রণয়ে আসক্ত হলেও বিয়ের ব্যাপারে পারিবারিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি তাহমিনা। কিন্তু তিন বছর পরে স্বামীর পুরুষত্বহীনতার বাস্তবতায় তাহমিনা পরিবার, সমাজ, প্রথাগত ধর্ম প্রভৃতির সর্ববিধ সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ফারুককে জীবনসঙ্গী হিসেবে বরণ করার এক সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফারুকের সংসারে পুত্রসন্তানের জননী হয়ে খুঁজে পায় সে নারীজীবনের সার্থকতা। পরিবার, সমাজ আর প্রথাগত ধর্মের বিধিবিধানের মানদণ্ডে ফারুক-তাহমিনার সংসারজীবন অবৈধ, অন্যায় ও সমালোচনাপূর্ণ হলেও হৃদয়ধর্মের দিক থেকে তারা নিষ্কলুষ, শুদ্ধচিত্ত ও অপাপবিদ্ধ। তারুণ্যের আবেগ প্রথাগত নীতিধর্ম বিসর্জনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেনি। বরং পরিমিতিবোধের পরাকাষ্ঠায় তারা প্রতিষ্ঠা করেছে নতুনতর নীতিধর্মের আদর্শ। বিবাহিত জীবন নিয়ে প্রথাগত ধর্ম ও সমাজের যে সংস্কারমূলক বিধান, যা পুরুষতন্ত্রের সুবিধা ও নিপীড়নধর্মী শাসনকেই মান্যতা দেয়, তাহমিনা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কামনা করেছে নারীর জীবনমুক্তি। সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> 'দেয়ালের দেশ'-এও সৈয়দ শামসুল হক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রসঙ্গকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মনোজগতের রহস্যময়তা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণ-নির্ভর জীবন-জটিলতার পরিচায়ক, এবং আধুনিক অস্থির অসুখী মানুষেরই সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকার গতানুগতিকতা-বিরোধীও বটে। অবদমিত মাতৃত্ববোধ সন্তানকামনায় প্রচলিত জীবনব্যবস্থাকেও অস্বীকার করে সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসবিরোধী অস্বাভাবিক পন্থায় উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে অগ্রসর হতে পারে, এবং মানসিক জটিল যন্ত্রণায় নিজস্ব উপলব্ধিতে সমাজসত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। (মুহম্মদ রেজাউল, ১৯৮৯: ৩৩৫)

এক্ষেত্রে তাহমিনা মানবিকতাকে বিসর্জন দেয়নি, গ্রহণ করেনি ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মর্যাদা দিয়েছে প্রণয়ের আর পূর্ণতা পেতে চেয়েছে জননীসত্তার আস্বাদ লাভে। তার মানবিকতা চূড়াস্পর্শী হয়ে ওঠে দেড় বছর পর স্বামী আবিদের আগমনসহ তার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রকাশে আবিদ ও ফারুক উভয়ের প্রতি অনুরাগ উপলব্ধির উদারতায়। নারীর এই সংস্কারমুক্ত ও প্রবল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণেই সার্থকতা লাভ করেছে এ উপন্যাস।

জহির রায়হানের (১৯৩৫-৭২) শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০) উপন্যাসে পরিস্ফুটিত হয়েছে নতুন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার মধ্যবিত্ত তরুণদের প্রণয় ও পরিণয়-ভাবনার একটি অগ্রসর দিক। কলকাতা নগরকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমিতে বিচার করলে এর তাৎপর্য অনুধাবন কঠিন হবে। দুইশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে বিপর্যস্ত ও অধঃপতিত পূর্ববঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর নতুন কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার নতুন গড়ে-ওঠা মধ্যবিত্তের মানস উপলব্ধির চেষ্টা করা হলেই কেবল উপন্যাসটি গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে।[২] উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদের সঙ্গে একাধিক তরুণীর সম্পর্কসূত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে এ ধরনের সম্পর্কের বিচিত্র ধরন ও মাত্রা। কোনটা বন্ধুত্ব, কোনটা প্রণয় আর কোনটা পরিণয়মুখী তার বৈচিত্র্য অন্বেষণে উপন্যাসটি তাৎপর্যদীপ্ত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নত রূপ থেকে বঞ্চিত একটি পশ্চাৎপদ সমাজ-কাঠামোয় নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেবল পরিণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেখানে প্রণয় একটি উন্নত ভাবনা, এবং বন্ধুত্ব তার চেয়েও উন্নত রূপাঙ্গিক। নতুন দেশের নতুন রাজধানীতে তা যে অঙ্কুরিত হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত ধারণ করে আছে এ উপন্যাস। আর এসব সম্পর্কের কোনোটাকেই প্রথাগত ধর্মীয় মানদণ্ডে বিচার করা হচ্ছে না। পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ের পরেও পূর্বপ্রণয়ীর সঙ্গে সম্পর্ককে পাপ-পুণ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না-করে মানবিক ঔদার্যে বিবেচনা করার আধুনিক সামর্থ্য দেখিয়েছে এ উপন্যাস। শুধু তাই না, পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে একটি অশিক্ষিতা নারীও নাগরিক পরিবেশে নিজ পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার স্বাধীন ও সাহসী সিদ্ধান্তগ্রহণ করে উপন্যাসের পরিণাম-অংশকে অসাধারণ নাটকীয় সংশ্লেষপূর্ণ আধুনিকতায় মণ্ডিত করেছে। অন্যদিকে নর-নারীর সম্পর্ক কোনো ক্লেদাক্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি, সৌন্দর্য-মাধুর্যে মহিমান্বিত থেকেছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায়ে বিবাহিত নারীর উচ্চাভিলাষ যে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়েছে তা নাগরিক জীবনাগ্রহের পরিণাম হিসেবেই বিবেচ্য।

নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের পরিপক্ব রূপায়ণে রাজিয়া খানের (১৯৩৬-২০১১) বটতলার উপন্যাস (১৯৫৯; রচনাকাল ১৯৫২) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ঢাকা, করাচি ও কলকাতার জীবন ও সমাজধারা। কেন্দ্রীয় চরিত্র করাচি বেতারের সংবাদপাঠক বাঙালি মঈনের জবানীতে এবং তারই জীবনসূত্রে গড়ে উঠেছে এর আখ্যানভাগ। ১৯৪৭-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভারতবর্ষে দুই দেশের উদ্ভব আর এক দেশের দুই অংশের মধ্যে দুস্তর ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানের পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। কিন্তু একটি মানুষের জীবন, প্রণয় ও পরিণয়ভাবনা তার মনোজগতে এই ব্যবধান কোনো রেখাপাত করেনি। শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যবধান কেন, কোনো ধর্মীয় ভিন্নতাও গুরুত্ব হারায়। সেখানে এক গভীর উচ্চতর মানবিক বোধের সর্বাত্মক জাগরণই মুখ্য হয়ে ওঠে। প্রাধান্য পায় হৃদয়ের সঙ্গে আরেকটি হৃদয়ের প্রতিশ্রুতির অলিখিত বন্ধন, ভোগবাসনার চেয়ে ত্যাগের মহিমা। করাচিতে অ্যংলো-ইন্ডিয়ান নারী, কলকাতায় ব্রাহ্মণকন্যা আর ঢাকা-চট্টগ্রামে মুসলিম আত্মীয়া সকলের প্রতিই তার স্নেহ-প্রণয়-পরিণয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ঊর্ধ্ব এক শাশ্বত মানবিক চেতনার সর্বজয়ী বিস্তার তাই লক্ষণীয়। মঈনের এই সর্বমানবিক বোধ গঠনে ১৯৪৭-পরবর্তী ঢাকার ভাষা আন্দোলনজাত নবজাগরণ ও নতুন জাতীয় চেতনার রয়েছে প্রত্যক্ষ প্রভাব। তারই আদর্শে লালিত মামাতো ভাই মন্টু বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনে শহিদ। মন্টুর কাব্যচর্চা ও প্রণয়ভাবনার মধ্যে লেখক অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন সংযম ও পরিমিতিবোধের সৌন্দর্য। তবে লেখক এর পাশাপাশি করাচি ও কলকাতার সমাজজীবনে বিদ্যমান কিছু সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের চিত্রও এঁকেছেন। তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে উচ্চতর নগরজীবনের নানা ক্লেদময়, গ্লানিকর ও ভোগক্লেশের বিচ্ছিন্নতাদুষ্ট ছবি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওই জীবনের সাক্ষাৎ পেলেও তা দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি। এ থেকেই লেখকের জীবনদর্শনের মূলসূত্রটি অনুধাবনীয়।

তবে সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন(১৯৮৫: ২৫) উপন্যাসটিতে লক্ষ করেন কেবল নেতিবাচকতার সুর। তাঁর ভাষায়, "বটতলার উপন্যাসে'র মঈন, সুমিতা, হেটি, শামসা, তরু, মিন্টু– সবাই যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপ। সবাই জীবনের সঙ্গতির সন্ধানী, শান্তির প্রত্যাশী– অথচ শূন্যতাবোধ তাদেরকে নিঃশেষিত করলো।'

উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিভাবনা

পঞ্চাশের ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ীই কেন্দ্রীভূত ছিল মানবপ্রবাহ ও তার সমাজের ওপর এবং সেই সূত্রে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তির ঘটনাধারার ওপর। এ কালের কথাকাররা সমকালীন পরিস্থিতির জটিলতা যেমন অনুধাবন করেছেন তেমনি তাঁরা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীত আন্দোলন সংগ্রামকে মূল্যায়নও করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ মুক্তির সংগ্রামকে করেছেন ইঙ্গিতময়, প্রতীকী তাৎপর্যে ভাস্বর। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশবিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থাৎ ১৮৫৭তে

সিপাহীদের মহাবিদ্রোহের আখ্যানের কথা। বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) চেয়ে এক বছরের জ্যেষ্ঠ হলেও ঔপন্যাসিক হিসেবে সত্যেন সেনের আবির্ভাব ঘটে মানিকের মৃত্যুরও পরে। সিপাহী বিদ্রোহের যে ঘটনা সমকালীন কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা অমনোযোগের শিকার হয়েছে, উপনিবেশবাদীদের প্রতি দ্বিধাযুক্ত মানসিকতার কারণে, তার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সত্যেন সেন নিজের প্রথম রচনা 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'তেই[৩] প্রকাশ করলেন বিউপনিবেশি চিন্তার সমৃদ্ধ এক ভাষ্য। এ নিয়ে এই লেখকের পূর্ব-বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য : 'এতে তাঁর ইতিহাসসচেতন, উদারনৈতিক ও সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি পক্ষপাতও স্পষ্ট। বইটি যখন লেখেন তখন ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ে স্পষ্ট হয়েছে আমরা নতুন এক ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের শিকার এবং আমাদের নতুনতর মুক্তির সংগ্রাম অনিবার্য।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৭ : ৯৬)। সাহিত্য-সমালোচক বেগম আকতার কামালের বক্তব্যেও রয়েছে এর সমর্থন :

> এই বই মহাবিদ্রোহের প্রকৃত চেহারাটা স্পষ্ট করে, এবং এর ব্যাপ্তি ও তাতে বহু মানুষের যুক্ততাকে তুলে ধরে। সত্যেন সেনেরও মতাদর্শ হল যে, এই সংগ্রাম ছিল আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপ্ত; সর্বশ্রেণী, পেশাজীবী সমন্বয়ে দলভিত্তিক এবং ক্রমে যা হয়ে ওঠে অসংখ্য জানা-অজানা ব্যক্তিমানুষের আত্মত্যাগে উজ্জ্বল, সর্বোপরি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির অক্ষর স্মারকে উত্তীর্ণ। সত্যেন সেন ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী চারিত্র্যের দিকটাই বেশি তুলে ধরেছেন। (বেগম আকতার, ২০১০: ৩০-৩১)

একই কাহিনি অবলম্বনে রচিত সত্যেন সেনের *অপরাজেয়* (১৯৭০) উপন্যাস নিয়ে এই সমালোচক যে ব্যাখ্যা দাঁড় করান তার ন্যায়পরতা লক্ষণীয়। তাঁর মতে, উপন্যাসের 'বয়নের পরতে পরতে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা ও ঋদ্ধ জীবনাদর্শের গাঢ় রঙে চুবানো নানা নকশা আছে।... বিদ্রোহের রূপচিত্রণে উচ্চবর্গীয়দের দ্বন্দ্ব ও সাহস মুখ্য স্থান পেলেও সত্যেন সেন প্লটগঠনে অন্যচরিত্রকেও মাঝে মাঝে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।' (বেগম আকতার, ২০১০: ৩১)

পরবর্তীকালে রচিত পদচিহ্ন (১৯৬৮) ও উত্তরণ (১৯৭০) উপন্যাসে সত্যেন সেন চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন তাতে ঔপন্যাসিকের সততার প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন অসাম্প্রদায়িক, তেমনি নিম্নবর্গের মহিমা আবিষ্কারে অগ্রসর। তিনি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেই উদ্ঘাটন করেন দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধান-বিদ্বেষের মূল কারণ ও প্রকৃত সত্য। দেশত্যাগে আগ্রহী এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্বও তিনি ব্যাখ্যা করেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত যুক্তিশীল মনোভঙ্গি নিয়ে। উপনিবেশবাদী শাসন সমাজের নিম্ন পর্যায়কে পর্যন্ত কীরূপ কলুষতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করেছে, তারই মর্মচিত্র তিনি পরিপক্ব রাজনৈতিক চেতনা

প্রয়োগে উদ্ঘাটন করেন। রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে নিম্নবর্গের শ্রেণিশাসিত চেতনা কীভাবে শানিতরূপে শোষণসচেতন ও মানবকল্যাণমুখী হয়ে ওঠে তারই আখ্যান হিসেবে তাঁর উপন্যাস তাৎপর্যবহ।পদচিহ্ন প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি যথার্থ বিশ্লেষণ: 'সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বপীড়িত জনজীবনের মধ্য থেকে যারা নতুন সম্ভাবনার লক্ষ্যে উজ্জীবিত, আনিস, সুবিনয়, সাত্তার সেই বিকাশমান মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়, বাঙালি।' (রফিকউল্লাহ, ২০০৯: ১২৪)

সরদার জয়েনউদদীন চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের রাজনীতি, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু শ্রেণির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামোর দাবি, সেই দাবি বাস্তবায়িত হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রে নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে নতুন মুক্তির সংগ্রাম প্রভৃতি নিয়েই রচনা করেন অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৬) ও বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ (১৯৭৫) শীর্ষক দুই পর্বের এক সিরিজ উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতীকী উদ্ভাসন ঘটেছে। উপনিবেশবাদী শাসনের শেষ দশকের রাজনীতির সূক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত জটিলতাগুলোর পাশাপাশি নতুন কালের স্বপ্ন ও সংগ্রামের রূপায়ণ ঘটেছে এ দুই উপন্যাসে। তৎকালীন কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনের রাজনীতিভাবনার নানা প্রান্তকে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাসহযোগেই উন্মোচন করেন। অনেকটা আত্মজৈবনিক হওয়ায় এতে উদ্ঘাটিত হতে পেরেছে ওই কালের এক নিবিড় সত্যভাষ্য। যে সত্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের পটভূমিতে সংখ্যালঘুর বঞ্চনাতাড়িত মর্মবেদনার এক বিস্তৃত চিত্র। ওই সত্যের মধ্যেই সুপ্ত থাকে প্রকৃত মানবধর্ম। তবে এক্ষেত্রে সমালোচকের ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্যও উদ্ধার করা যেতে পারে :

> আধুনিক জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা অনেকেই পাকিস্তান-আন্দোলনকালে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং পাকিস্তানে অন্ততঃ এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিও অর্জিত হবে– এমনি একটা অলীক আশা পোষণ করেছিলেন।... তবে সমাজতন্ত্রের নিবেদিত-কর্মী ও শ্রমিক-জনতার সঙ্গে অনেকটা সম্পৃক্ত চরিত্র অঙ্কন ক'রে সরদার জয়েনউদ্দিন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী হিসেবে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থাও ব্যক্ত করেছেন। (মুহম্মদ ইদরিস, ১৯৮৮: ১২০)

এদিক থেকে শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* (১৯৬৪) উপন্যাস সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধিত্বশীল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত কালপর্বের বাংলাদেশকে ঘিরে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্বিক এক বাস্তবতা এতে বিধৃত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজবৃত্তের বিপরীতে বণিকতন্ত্রের বিস্তার, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামোর দাবি, বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উপনিবেশতন্ত্রের অবসানসহ দুটি দেশের জন্ম, নতুন রাজধানী ঢাকার সম্প্রসারণসহ রাজনীতির নতুন মেরুকরণ, নতুন জাতীয়তাবাদী চিন্তাসহ নবতর

সংগ্রামস্পৃহা সবকিছুই বিষয় হিসেবে আদৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। মুনীর চৌধুরী এ উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ করেন নতুন দেশটির জায়মান মধ্যবিত্তের জাগরণ ও স্বপ্নের অমিত সম্ভাবনা :

> আজকের যে উচ্চশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিবর্গ পূর্বপাকিস্তানী জীবনের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে, যাদের আকাঙ্ক্ষা বাসনা প্রত্যহ অন্তহীন সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যস্ত, তাদের চেতনা তলদেশ কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে, স্থূলতা, কার্যত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে জর্জরিত গ্রাম জীবনে বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে সহস্র শিরা-উপশিরার নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনে সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত সেই সত্যই যেন লেখক সংশপ্তকে উদ্ঘাটিত করতে তৎপর হয়েছেন। (মুনীর, ১৯৮৫: ১৫৩)

অবিভক্ত বাংলাদেশের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানসহ কালের সামগ্রিক স্পন্দনকে ধারণ করেই এ উপন্যাস হয়ে ওঠে সার্থকতামণ্ডিত। অনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিত্তবান হওয়ার আগ্রহের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদের মধ্যে যেমন রয়েছে ঐক্য, তেমনি উভয় বৃত্তেই শুভবোধসম্পন্ন মানুষেরও নেই অভাব। দাঙ্গার ঘটনা তার প্রমাণ। লেখক দেখান, উপনিবেশবাদসৃষ্ট বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের মধ্যেই বেড়ে ওঠে কালোবাজারি, মজুতদারি ও নারীব্যবসার মতো নিষ্ঠুর, অমানবিক ও সর্বনাশ-সৃষ্টিকারী সব ব্যবসায়িক কার্যক্রম।

সংশপ্তক উপন্যাসের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এর নতুন ভাষানির্মিতি। প্রায় শতবর্ষ-বয়সী বাংলা উপন্যাসের ধারায় এর ভাষা যেমন একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত, তেমনি তা হয়ে উঠেছে সর্বকূলস্পর্শী, যা বহন করছে তার স্বাতন্ত্র্যের ঔজ্জ্বল্য। মুনীর চৌধুরীর বিশ্লেষণ থেকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি তার গুরুত্বের সর্ববিধ প্রান্ত :

> হালে পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্যে বাংলা গদ্যরীতির যে পরিবর্তনধারা সূচিত হয়েছে তার এক কোটিতে রয়েছে বর্তমান মুসলমান সমাজে প্রচলিত বা অতীতের পুঁথিসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ গ্রহণের প্রতি প্রবণতা, অন্য কোটিতে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক বুলির ঐশ্বর্যকে সাহিত্যিক গদ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার প্রয়াস। ভাষার শিল্পগত মূল্যায়নের দান উভয় পর্যায়ের নিদর্শনই শহীদুল্লার গদ্যে বিদ্যমান। তবে ভাষার শিল্পগতমূল্যায়নে এ সবই বাহ্য লক্ষণের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, এমন কোনো বিশেষ আরবী ফারসী শব্দ বা আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গী নেই যা আত্যন্তিকভাবে সুন্দর বা কুৎসিত। ব্যবহারে যখন তা বিশিষ্টতা অর্জন করে, দ্যোতনায় যখন তা অমোঘ বলে প্রতীয়মান হয় তখনই আমরা তার সার্থকতা স্বীকার করে নেই। সে শব্দবা বুলির উৎসগত জাতবিচার তখন অহেতুক মনে হয়। শহীদুল্লার রচনার নানা প্রকার নতুন শব্দ, শব্দগঠন ও বাক্যাংশের তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন আমাদের মনে সাড়া জাগায়। (মুনীর, ১৯৮৫: ১৫৪)

সংশপ্তক উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর এই মূল্যায়নের মধ্যেই প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে থাকে পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিকদের নতুন ভাষাভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ব্যবহারের সৌন্দর্য।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধতাময় পুরুষতন্ত্রশাসিত সামাজিক চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে যে উপন্যাস-কাহিনির যাত্রা শুরু, তার শেষ হয়মানবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত সংস্কারমুক্ত প্রণয়ঘন এক পরিবেশ রচনায়। ব্যক্তিপ্রেম আর দেশপ্রেম এখানে হয়ে ওঠে একাকার, আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। উপন্যাসের পরতে পরতে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে লেখকের শুভচিন্তার বিস্তার, রেনেসাঁসপুষ্ট মানবতান্ত্রিক জীবনবোধের জয়গাথা। উপনিবেশবাদের আরেক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সংশপ্তক হয়ে ওঠার প্রেরণায় উপন্যাসের পরিণাম অংশ গভীরভাবে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে।

পরিশেষ

ঔপন্যাসিকেরা গভীরভাবে জীবন-অন্বেষী। তাদের সর্বময় জীবনাগ্রহই কোনো জাতির সামগ্রিক স্পন্দনকে শিল্পরূপ দানে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৭-উত্তর বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, পূর্ণতর অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও জাতীয়তা বোধে জাগ্রত হয় তাকেই ঔপন্যাসিকেরা বিচিত্রভাবে রূপায়িত করেছেন। এই চেতনা সমগ্র দেশকে, দেশের অন্তরকে নবজাগরণে যেভাবে উদ্বোধিত করেছে, নতুনতর ঔপনিবেশিকতাবিরোধী মুক্তি সংগ্রামে প্রাণিত করেছে, লেখকেরা উপন্যাসের কাঠামোয় তাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত ও বাঙ্ময় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা রূপায়িত করেছেন শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত বলয়কে ঘিরে নব-উন্মেষিত সংস্কারমুক্ত আধুনিকতার চেতনাপুষ্ট জীবনেরই এক ঘনিষ্ঠ বিবরণ। পুরো প্রবন্ধে আমরা উপন্যাসের শরীর ব্যবচ্ছেদ করে দেখার চেষ্টা করেছি, সমকালীন প্রেক্ষাপটে নবতর এই চেতনা জীবন ও সমাজের কাছে কীরূপ সত্য হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকেরাও এই বোধকে আপন চিত্তে ধারণ করেন বলেই জাতীয় সত্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন এবং সেসবকে সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের পরিসরে বিধৃত করতে সমর্থ হয়েছেন।

টীকা

১. এক্ষেত্রে আরো উল্লেখযোগ্য নাম : মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-৮৪), জোবেদা খানম (১৯২০-৮৯), নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২), ইসহাক চাখারী (১৯২২-২০০৯), বেদুঈন সামাদ (১৯২৬-২০০১), রোমেনা আফাজ (১৯২৬-২০০৩), আবদুর রাজ্জাক (১৯২৬-৮১), আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (জ. ১৯২৬), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৯০), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আবদুল গাফফার চৌধুরী (জ. ১৯৩৪), তাসাদ্দুক হোসেন (জ. ১৯৩৪), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), দিলারা হাশেম (জ. ১৯৩৬) প্রমুখ।

২. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে-ওঠা জলুসপূর্ণ রাজধানী কলকাতা ও এই শাসনের শিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তিক জেলা শহর ঢাকার ব্যবধান দুইশো বছরের যাত্রায় ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। উনিশ-বিশ শতকের পাশ্চাত্য আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে

কলকাতার নারীদের জীবনযাত্রাও সেই আলোকে স্বাধীনতার স্পর্শলাভে ছিল ধন্য। সেই তুলনায় ঢাকার নারীদের জীবন ছিল অনেক বেশি পশ্চাৎপদ, শিক্ষাবঞ্চিত, পর্দাঘেরা ও গৃহান্তরালবেষ্টিত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৯৫৭ সালে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী বন্ধুশিল্পী আমিনুল ইসলাম ও সৈয়দ জাহাঙ্গীরসহ কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে সেখানে বাইরের জগতে ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছন্দ ও অবাধ বিচরণ লক্ষ করে ঢাকার সঙ্গে তুলনা করে বিস্মিত হন। ঢাকায় ফিরে একদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সৈয়দ জাহাঙ্গীরকে নিয়ে সমগ্র শহর ঘুরে মাত্র পাঁচটি মেয়ের দেখা পান, তা-ও রিকশায় পর্দাঘেরা অবস্থায়। এই ছিল ১৯৫৭ সালের ঢাকার পরিস্থিতি। (দ্র. সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৯৩-৯৪)

৩. *মহাবিদ্রোহের কাহিনী* অবশ্য উপন্যাস নয়। তবে এই কাহিনি অবলম্বন করে পরে সত্যেন সেন *অপরাজেয়* (১৯৭০) নামে একটি উপন্যাসও লেখেন।

গ্রন্থপঞ্জি

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯১ ।*বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল, ২০১০। *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

মনসুর মুসা, ১৯৭৪। *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ, ২০০২। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ১৯৪৭-৭১*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

মুনীর চৌধুরী, ১৯৮৫। *মুনীর চৌধুরী-রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক: আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫। *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪৭–৭০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৮। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ রেজাউল হক, ১৯৮৯। *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস (১৯৪৫–৬০)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত, ১৯৭৬ (১৯৫৯)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান, ২০০৯ (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৫। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৫। *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৭। *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক, ১৯৮১। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

রবীন্দ্রনাথের গানে পুরাণভাবনা

শাহনাজ নাসরীন ইলা*

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ কাহিনি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবারে কোনো বাধা ঘটেনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থে উপনিষদ, গীতা ও বেদের ঋক মন্ত্রগুলির সংকলন করেছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় ব্যবহার করেছিলেন। ফলে বৈদিক ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছেলেবেলাতেই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মানস গঠিত হয়েছিল প্রাচীনকালের ঋষিসুলভ দৃষ্টি এবং আধুনিক কালের বিজ্ঞানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে। এই দুই মননভঙ্গির মিলন ক্রমশই গভীরতর হয়েছে। তাঁর অজস্র রচনায় এই উপলব্ধি স্পষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানে পুরাণভাবনা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'পুরাণ' শব্দের অর্থ 'প্রাচীন কথা'। ব্যাপক অর্থে পুরাণ হলো – ইতিহাস, আখ্যান, উপাখ্যান ধর্মীয় বিধিবিধান ইত্যাদি সম্বলিত মিশ্র সাহিত্য। উপনিষদের যুগে উচ্চ মার্গের দার্শনিক তত্ত্ব সহজ-সরল ভাষায় রচিত হয় কাহিনিমূলক পুরাণ সাহিত্য। যেমন- রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি। সাহিত্যরসের সাথে যেন মঙ্গল লাভ হয়, সেই জন্য ধর্মীয় বিষয়াদিও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির আড়ালে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। যে সব ঘটনার কারণ মানুষ বুঝতে পারেনি, তার মূলে দৈবশক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেছে। পৌরাণিক কাহিনিগুলোর মধ্য দিয়ে জীবনদর্শন, নৈতিকতা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সব আখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে বীরের কল্পনা, নীতির প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ।

ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈদিক ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এছাড়া, উপনিষদ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বিবিধ পুরাণ, বেদের সূক্ত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পালি সাহিত্য ইত্যাদির অনুরাগী ছিলেন তিনি। পুরাণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আসক্তি দুই ধরনের। প্রথমত, সরাসরি পুরাণের ব্যবহার; দ্বিতীয়ত, পৌরাণিক চরিত্র, কাহিনি, দর্শন

* অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভৃতির নির্যাস ধারণ করে তার পটভূমিতে মানসপ্রতিমা নির্মাণ। বৈদিক সংস্কৃতির পটভূমিকায় সৃষ্ট পুরাণগুলোর কাহিনি-ঘটনা চরিত্র রবীন্দ্র রচনায় কল্পনার আলোকে আলোকিত হয়ে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁর গানে পুরাণভাবনা ও উপলব্ধি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব ।

রবীন্দ্রনাথের গানে পুরাণভাবনার কয়েকটি দিক লক্ষ করা যায়:

এক. পুরাণের চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করে গান;

দুই. রবীন্দ্রনাথের গানে পৌরাণিক শব্দের ব্যবহার;

তিন. মন্ত্র গান।

পুরাণের চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করে গান

পুরাণের চরিত্রগুলো প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় ভানুসিংহের পদাবলীর কথা। নিতান্ত ছোট বয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, বৈষ্ণবপদাবলী অধ্যয়নে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পদাবলীর রসমাধুর্যের গভীরতার মধ্যে চিরন্তন হৃদয়ের লীলা যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতি গাথায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে'। আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী নিতান্ত অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিলেন[১]। অতি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটা নিবিড় আকর্ষণ ছিল তা প্রকাশ পায় তাঁর রচিত ব্রজবুলি ভাষায় রচিত ভানুসিংহের পদাবলীসমূহে। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়া ঘন অবকাশের আনন্দে খাটের ওপর উপুর হইয়া পড়িয়া শেট লইয়া লিখিলাম– গহনকুসুম কুঞ্জমাঝে। লিখিয়া ভারি খুশী হইলাম'[২]। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল। কিশোর বয়সের বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকল্পের আবহ কবির সমগ্র জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। কৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দরূপিনী শক্তির মানবী রূপ হচ্ছে রাধা। মূলে উভয়ে অদ্বৈত কিন্তু দেহরূপে দ্বৈত পুনরায় অদ্বৈত বা একাত্ম হওয়ার জন্যই তারা মর্ত্যলীলা করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমসাধনা একাত্ম হওয়ার সাধনা। এ সবই পদাবলীর বিষয়। ভাগবত পুরাণে রাধাকৃষ্ণের উলেখ আছে। 'আও আও সজনিবৃন্দ হেরাব সখি শ্রীগোবিন্দ শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে'- কথাগুলোর মধ্যদিয়ে শ্রী গোবিন্দ অর্থাৎ যিনি আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান কোনো নির্বিশেষ জ্যোতি বা শূন্য নন, তিনি হচ্ছেন সর্বতোভাবে পূর্ণ এক পুরুষ- তাকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা এবং তার চরণ ভানুসিংহরূপী রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করছেন। গানটির শেষ চরণে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আবহ তৈরি হয়েছে। এরপর রচনা করেছেন 'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা', 'বাজাওরে মোহন

বাঁশী', 'সতিমির রজনী', ভৈরবীতে রচনা করলেন 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান প্রভৃতি গান। এ সময়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী বৌঠানের সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিদ্যাপতির পদ সুরারোপ করে তৈরি করলেন অপূর্ব গান 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্যমন্দির মোর'। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> 'নতুন বর্ষা নেমেছে।... মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। ... বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল মনে- ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর.. নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম- তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী/অথির বিজুরিক পাঁতিয়া/বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়বি/হরি বিনে দিন রাতিয়া'।[৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের গানে বিশেষ করে প্রেম পর্যায়ের গানে নিসর্গ পরিপার্শ্ব অনুষঙ্গ করে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের উপছায়া ভাবরূপ বা চিত্রাভাস এসেছে বারবার। এ সকল গানের সুরে রাগানুসারী সুরের সাথে কীর্তনাঙ্গ সুর মিশে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের গানে প্রাচীন কাব্যের দুটি ধারা লক্ষ করা যায়– চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস তথা বৈষ্ণব পদাবলী একদিকে, অন্যদিকে কালিদাস-মেঘদূত-উজ্জয়িনীর চিত্রকল্প।[৪] পদাবলীর ভাবরূপ প্রকাশ করে যে অনুষঙ্গ শব্দগুলি যেমন- সখি, সই, বধু, বাঁশী, কদম্ববন, যমুনা নদী, বিরহ, বর্ষাকাল। রাধা ও তাঁর অভিসার বিরহের চিরকালের অনুষঙ্গ পরিবেশ। এই পটভূমি অবলম্বন করে বিরহিনী রাধিকার চিরন্তন অভিসার ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় গীতবিতানের গানগুলোতে। যেমন– মরি লো মরি, দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে, এখনো তারে চোখে দেখিনি, দুজনেই দেখা হল মধুযামিনী রে, আজি এ নিরালা কুঞ্জে প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ শিবভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক, ও প্রবন্ধে শিবস্তুতি বিচিত্র বিভূতিতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> 'হে রুদ্র তোমার ললাটের যে ধ্বক ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্র অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হা হা ধ্বনিতে নিশীথরাতের গৃহ দাহ উপস্থিত হয়। তোমার নৃত্য তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারের মহাপাপ মহাপুণ্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। পাগল তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভিত হৃদয় যেন পরান্মুখ না হয়। হে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।[৫]

মহাকাল, নটরাজ, মহাদেব, রুদ্র, ভয়ংকর, শংকর, প্রলয়ংকর, ভৈরবের বন্দনা গীতবিতানের বহু গানে প্রকীর্ণ। 'সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ', 'জাগো হে রুদ্র জাগো', 'পিনাকেতে লাগে টংকার', 'প্রলয় নাচন নাচল যখন' স্মরণীয়। 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি', 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা' গানগুলোতে ভৈরব এবং সুন্দরের সহাবস্থান দেখতে পাই। যিনি ভৈরব, তিনিই সুন্দর। তারই সমগ্ররূপ নটরাজ। বিশ্বসৃষ্টি তারই চরণের পদাঘাতে ধ্বংস ও রচনায়, জন্ম মৃত্যুতে, হরণ-পূরণে, পূর্ণ-অপূর্ণে লীলায়িত উন্মোথিত। নৃত্যের তালে তালে 'নটরাজ

ঘুচাও সকল বন্ধ হে' - কবিতারূপে রচিত এবং সুরযোজনায় সংগীতে পরিণত, এই চার স্তবকের গানটিতে জড়বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদভাসিত হয়েছে।[৬] বিচিত্র পর্যায়ের 'নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ' গানটিতে শিবের রুদ্ররূপের সাথে পালন রূপ সমীকৃত হয়েছে। নৃত্যেই মুক্তি, এই নৃত্য ছন্দে বিশ্বের ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছেন। 'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর জয় জয় প্রলয়ঙ্কর' পূজা পর্যায়ের এই গানটি একটি সম্পূর্ণ শিবস্তুতি। শিবের বিভিন্ন গুণবাচক নামের নান্দনিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই গানটিতে শিবের বন্দনা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণের ভারতবর্ষবর্ণন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দেবতাদের মধ্যে ভারতবর্ষের এই গৌরবরীতি প্রচলিত আছে যে ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্মাদি অপবর্গ লাভের মার্গস্বরূপ। সেই ভারতভূমিতে যারা জন্মগ্রহণ করেন, তারা দেবতাদের চেয়েও ধন্য। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ প্রভৃতি মার্গের সমন্বয় স্থূলস্বরূপ যে মহামার্গ তারই নাম ভারতমার্গ। পুরাণ কথিত ভারতমার্গ, আর রবীন্দ্র ব্যাখ্যাত ভারতপথ একই বস্তু। এ দৃষ্টি আধুনিককালের স্বাদেশিকতার অর্থাৎ পেটরিওটিজমের নয়, এ দৃষ্টি ভারতেরই সনাতন ধ্যানদৃষ্টি।[৭] বাঙালি জাতি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন দেবী দুর্গারূপিনী স্বদেশজননীকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথের গানে 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে'। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' এবং 'আমার সোনার বাংলা' একই মাতৃ আনুগত চিত্তের যুগলপ্রস্তুতি। দশভূজার সঙ্গে দেশমাতৃকাকে মিলিয়ে দিয়ে শারদীয় প্রতিমার নতুন বোধন উৎসবে কবিকে গান রচনার অনুরোধ জানানোয় রচনা করেছিলেন 'অয়ি ভুবনমোনমোহিনী, অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী, অয়ি জনক-জননী-জননী'।

প্রকৃতি পর্যায়ের শরতের গানে যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছে আনন্দ-বেদনার ফল্গুধারা। শরতের কোমল মোহনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশকে আনন্দ ও অভ্যর্থনায় আবাহন করার গান 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা' গানটি। প্রকৃতি পর্যায়ের শরৎ ঋতুর দেবী দশভুজার আগমনি গান 'দেখো দেখো, দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়', দেবীবরণের গান 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' এবং 'নব কুন্দধবলদলসুশীতলা, অতি সুনির্মলা, সুখসমুজ্জলা' যেন মৃন্ময়ী প্রতিমারই আদর্শায়িত রূপ। শরৎ প্রবন্ধে দশভুজার রূপকল্পটি মৃন্ময়ী প্রতিমারূপে দেখা দিয়েছে :

> 'মাটির কন্যার আগমনি গান এইত সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভ্রঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুকাল হইল ধরা জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে তা আর দেরী নাই, শ্মশান বাসী পাগলাটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই, হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে। কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনি।[৮]

এ ধারার কয়েকটি গান 'হৃদয়ে ছিলে জেগে', 'হে ক্ষণিকের অতিথি', 'সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী', 'শরৎ আলোর কমলবনে', 'ছুটির বাঁশী বাজল যে ঐ নীল গগনে'।

রবীন্দ্রনাথের শরতের গান শুভ্র-কোমল-বিষণ্ন-মধুর ঝরা শেফালির মতো। ছুটির আমেজ আনন্দ ও বিষাদের স্নিগ্ধ সোনার ছবিটি শরতের গানে অপরূপ হয়ে জেগেছে। এর পশ্চাতে লোকায়ত সংস্কৃতির দেবীর আগমন-বিসর্জনের অস্তিত্ব সক্রিয় রয়েছে। এই প্রত্নপ্রতিমার নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে শরতের গানগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের কথায়:

> 'আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়- তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।' শারদীয় গানের মূলসুর এই 'হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার' উৎসব।[৯]

দেবী অন্নপূর্ণা রবীন্দ্রনাথের গানে হেমন্তলক্ষ্মী রূপে এসেছেন। দৈন্যের ছদ্মবেশে দিগঙ্গনার অঙ্গন তিনি ভরে দেন ধরার বৈভবে, শস্যে সেখানে তিনি অন্নপূর্ণা। অন্নপ্রসূ জননী মূর্তির এই বিবরণ আছে 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা' গানটিতে।

শক্তিদেবী শ্যামা, কালি বা কালিকার মাহাত্ম্য পুরাণের অনেক কাহিনিতে বর্ণিত আছে। তন্ত্রে দেবীর বিভিন্ন রূপের কথা বলা হয়েছে। যেমন- দক্ষিণ, সিদ্ধ, গুহ্য, ভদ্র, শ্মশান, রক্ষা ও মহাকালী। দক্ষিণ কালিকার বর্ণনায় আছে তিনি চতুর্ভুজা, করালবদনা, মেঘকৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালিনী, মুণ্ডসমূহ থেকে নিঃসৃত রক্তধারায় রঞ্জিতা, ত্রিনয়না, শিববক্ষোপরি দণ্ডায়মানা এবং শিবকুলবেষ্টিতা। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে 'কালী কালী বলো রে আজ' দস্যুদলের গানটিতে তিনি দেবী কালিকার এই প্রলয়ংকরির ভয়ংকরী রূপের বর্ণনা করেছেন এবং দেবীর জয়গান গেয়েছেন পাশ্চাত্য উল্লাসের সুরে, গানটির শেষ চরণ 'বলরে শ্যামা মায়ের জয়' এই অংশটিতে রামপ্রসাদী সুর ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষত নাট্যগীতিতেই শ্যামার করাল বদনা, মুণ্ডমালিনী, মেঘকৃষ্ণবর্ণা রূপটি তুলে ধরেছেন। যেমন- 'ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ডবেয়ে', 'নাচ্ শ্যামা তালে তালে', বিসর্জন নাটকের গান 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' প্রভৃতি। দীপাবলি উৎসবের মঙ্গলময় রূপ দেখতে পাই হেমন্তের বিখ্যাত গান 'হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে' গানটিতে। দীপালিকার আলোয়-অন্তর-বাহির আলোকিত করে ধরিত্রীকে সাজাতে আহ্বান করেছেন। দীপালিকার উৎসবের আলোতে তিনি সমস্ত বিষাদ, অবসাদ, অন্ধকার দূর করে আলোর জয়বাণী শুনতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কালীকে সর্বত্র প্রচণ্ড উগ্ররূপে দেখেননি। যেমন- প্রায়শ্চিত্ত নাটকের গান 'সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা' গানটিতে গার্হস্থ্য মাতৃরূপে প্রতীয়মান হয়। পূজা পর্যায়ের সন্ধ্যা হল গো – ওমা গানটিতে স্নেহময়ী মাতৃরূপা কালীর কল্পনা প্রচ্ছন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে 'কালো স্নেহ', 'তোমার রাত', তোমার আঁধার কথাগুলোর মধ্য দিয়ে শুধু মাতৃরূপ নয়, মৃত্যুরূপও প্রতিভাত হয়েছে। এই মৃত্যু স্নিগ্ধ, শান্তিময়ী। এই কালীরূপের স্নেহছায়াতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ আশ্রয় নিতে চেয়েছেন।

বিচিত্র পর্যায়ের 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল মাঝে' গানটিতে কবি দেবী সরস্বতীকে পিককুহরিত মধুঋতুতে মনোলোক থেকে বহির্লোকে হিরণ-কিরণ রূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, হৃদয়ে দেবী সরস্বতীর অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। পূজা পর্যায়ের গান 'তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি' গানের সুরে, 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে, তোমার রাগিনী জীবনকুঞ্জে গানগুলোতে কবি সরস্বতীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। দেবীর মঙ্গলমন্ত্রে সব বিদ্বেষ দূর হয়ে নির্মল হাস্য মাধুরীতে অন্তর-বাহির সঙ্গীতছন্দে যেন বিকশিত হয়ে ওঠে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। গানগুলো প্রত্যাশার অসাধারণত্বে রবীন্দ্রনাথের বাণীবন্দনাকে নান্দনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূজা পর্যায়ের গান 'এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে'। প্রকৃতির পটভূমিকায় রচিত এই গানটিতে কৃষ্ণের রাখাল রূপের আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি মানবজীবনের চরম জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করেছেন 'মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ?'

রবীন্দ্রনাথের গানে পৌরাণিক শব্দের ব্যবহার –

তিনি যে সকল পৌরাণিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর কিছু উদাহরণ হলো : মন্দাকিনি (পূজা পর্যায়- ২ সংখ্যক গান), জাহ্নবী (পূজা পর্যায়-৭১), রথ (বিচিত্র পর্যায়-৩২), রশি (পূজা পর্যায়-১৮৩), মহাদেব (পূজা পর্যায়-৫১১),অমরাবতি (আনুষ্ঠানিক পর্যায়-১১), ডমরু (প্রকৃতি পর্যায়-১৬), দুন্দুভি (প্রকৃতি পর্যায়-২১), পিণাক (পূজা পর্যায়-২৩৭), ধূর্যটি (বিচিত্র পর্যায়-১২০), ধূর্যটির জটা (প্রেম পর্যায়-২৮), নটরাজ (বিচিত্র পর্যায়-৪), মৃত্যুঞ্জয় (বিচিত্র পর্যায়-৩), মহাকাল (বিচিত্র পর্যায়-৫০), রুদ্র (পূজা পর্যায়-৫৩৫), শূলপাণি (পূজা পর্যায়- ৬০৯), রুদ্ররথ (বিচিত্র পর্যায়-৫২), হোমবহ্নি (বিচিত্র পর্যায়-৫২), কলালক্ষ্মী (বিচিত্র পর্যায়-৭১), রাহু (বিচিত্র পর্যায়-১২০), অপ্সরী (বিচিত্র পর্যায়-৭৮), নন্দরানি (বিচিত্র পর্যায়-৮৮), শ্রীরাধা (বিচিত্র পর্যায়-১২০), শ্যাম (আনুষ্ঠানিক পর্যায়-১১), লক্ষ্মী (পূজা পর্যায়-১৫২), সরস্বতী (বিচিত্র পর্যায়-১), বীণা (প্রেম পর্যায়-২৯), বীণাপাণি (বিচিত্র পর্যায়-১০), বৃহস্পতি (বিচিত্র পর্যায়-১১৪), শনির দৃষ্টি (বিচিত্র পর্যায়-১১৪), বজ্রপাণি (বিচিত্র পর্যায়-৩৯), সামগান (বিচিত্র পর্যায়-৮), শঙ্খ (বিচিত্র পর্যায়-৮), পঞ্চশর (প্রেম পর্যায়-৪৯), গঙ্গা (প্রেম পর্যায়-২৮), মেনকা (নাট্যগীতি-১১৩), উর্বসী (নাট্যগীতি-১১৪) প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের উর্বসী পৌরাণিক উর্বসী নয়। কবির উর্বসী অরূপ সৌন্দর্য যা স্বাধীন সত্তা, সম্পূর্ণ নারীত্বের প্রতীক।

পূজা পর্যায়ের গান 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি' গানটিতে 'তোমার জটায় আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী' বাক্যটিতে শিব গঙ্গাকে জটায় ধারণ করেছিলেন তার রূপকল্পের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মফলের আশা না করে কর্ম করে যাওয়ার যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার প্রতিফলন দেখতে পাই পূজা পর্যায়ের গান 'তোমার হাতের রাখিখানি বাঁধ

আমার দখিন হাতে' গানটির মধ্যে- 'কর্ম করি যে হাত লয়ে কর্ম বাঁধন তারে বাঁধে, ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে, তোমার রাখি বাঁধ আটি সকল বাঁধন যাবে কাটি, কর্ম তখন বীণার মতন বাজবে মধুর মূর্চ্ছনাতে'। সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষাই গীতার মূল উদ্দেশ্য।

বিচিত্র পর্যায়ের গান 'সে কোন বনের হরিণ', 'তোরা যে যা বলিস ভাই/আমার সোনার হরিণ চাই' অথবা 'আমি তোমারি মাটির কন্যা' গানগুলো রামায়ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মন্ত্র গান

রবীন্দ্রনাথ সামাজিক উপাসনায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বেদমন্ত্রে ও বৌদ্ধমন্ত্রে সুরারোপ করেছিলেন। মন্ত্রগুলো গীতবিতানের পরিশিষ্ট অংশে বর্ণিত আছে। ইমন ভুপালি মেশানো রাগিণীতে এসব মন্ত্রে তিনি সুরারোপ করেন। মন্ত্রের হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিয়ম মেনে মন্ত্রপাঠকালে যে ছন্দ উৎপন্ন হয় সেই ছন্দের সঙ্গে রাগিণী মিশিয়েছেন।

বৈদিক মন্ত্র	আকর
১. তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং	শ্বেতাশ্বতর
২. যদেমি প্রস্ফুরন্নিব	ঋগ্বেদ
৩. য আত্মদা বলদা যস্যবিশ্ব	ঋগ্বেদ
৪. উষো বাজেণ বাজিনি প্রচেতা	ঋগ্বেদ
৫. শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ	ঋগ্বেদ
৬. সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম	ঋগ্বেদ
৭. অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ	ঋগ্বেদ
৮. এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে	বৃহদারণ্যক
৯. ধীরা ত্বস্য মহিনা	ঋগ্বেদ

উদু ত্যাং জাতবেদসম্ (ঋগ্বেদ), বায়ুরনিলমমৃতমথেদম্ (ঈশ), অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য (ঋগ্বেদ), এবং পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষম (অথর্ব বেদ) ইত্যাদি শোকসমূহ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছেন। তবে রাগ তালে গাওয়া হয় না, সুরে আবৃত্তি হয় মাত্র।

বৌদ্ধ মন্ত্র	সুর
১. ওঁ নম বুদ্ধায় গুরবে	ভৈরবী
২. উত্তমঙ্গেন বন্দেহং	কাফি

৩. নথি মে শরণং	মিশ্র রামকেলি
৪. নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়	বেহাগ
৫. বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো	মিশ্ররামকেলি

রামায়ণ, বিশেষ করে মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেইসব পুরাণকাহিনি নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের হাতে গড়ে উঠেছে অসামান্য সব সৃষ্টি। তাতে অতীত কাহিনি নতুন ভাবনায় পুনর্নির্মিত হয়ে আলো ফেলেছে উত্তরকালের উপর। মহাভারত থেকে চিত্রাঙ্গদার কাহিনি নিয়ে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানসিকতা। স্বামীর চরণাগত, সপত্নী মেনে নেওয়া সহমরণে উদ্যত পৌরাণিক চিত্রাঙ্গদাকে গড়ে তুলেছেন স্বাবলম্বী, আত্মমর্যাদাপরায়ণ পুরুষের সমকক্ষ এক নারী হিসেবে। এমন নারী যে রূপ দিয়ে তার পুরুষ সঙ্গীকে ভোলাতে চায় না, তার সমকক্ষ সঙ্গী হতে চায়। সেই আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী আধুনিক নারীর কোনো আভাস মহাভারতে ছিল না।[১০] চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের শেষে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে- 'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী নহি দেবী নহি সামান্যা নারী, পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে, সে নহি নহি, হেলা করি মোরে রাখিবে নীচে সে নহি নহি, যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সম্পদে সংকটে সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে , পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে, আজ শুধু করি নিবেদন আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী'।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা আজও ভুলি নাই'। তাঁর দুটি গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া রচিত হয়েছে রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে। বাল্মীকি প্রতিভা দস্যু রত্নাকরের কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের কাহিনি এবং রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুণির পুত্রবধ কালমৃগয়া গীতিনাট্যের কাহিনি। গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়ায় সংস্কৃত রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের শোক ব্যবহার করা হয়েছে গীতিনাট্য দুটিতে। 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ' এবং 'পুত্র ব্যাসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্'। অহল্যার প্রতি, পতিতা কবিতার কাহিনি রচিত হয়েছে রামায়ণের অনুসরণে। গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ, কচ ও দেবযানী কবিতার কাহিনি রচিত হয়েছে মহাভারতের অনুসরণে।

বৌদ্ধ পুরাণ: অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, মৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সব মানুষের সমতা প্রধানত এ কয়টি নীতি বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ স্থাপন করে অস্পৃশ্য মানুষকে অপমানের তলা থেকে তুলে যে গৌরব দান করেছে, তাই প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, যে ধর্ম মানুষকে মর্যাদা দেয় না, অশুচি বলে অপমান করে, তাকে ধর্ম বলে তিনি

স্বীকার করেন না। মানুষের বন্ধন মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ এখানে অসীম দুঃখের মধ্য দিয়ে মোহের উপর কল্যাণকে জয়ী করেছেন। বুদ্ধ মানুষকে বড় করে দেখেছেন। তিনি জাত মানেননি, যাগযজ্ঞের ঘেরা টোপ থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন, মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করেছেন। দয়া, কল্যাণ তিনি স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করেননি, অন্তর থেকে আহ্বান করেছেন। মানুষ যে দৈবাধীন দীনহীন পদার্থ নয় এ কথা বুদ্ধদেবই প্রথম বলেছেন।[১১] বৌদ্ধ পুরাণ উপাখ্যানগুলোতে এ আদর্শগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়।

মালিনী নাটিকার কাহিনি সামান্য পরিবর্তিত মহাবস্তাবদান থেকে গৃহীত হয়েছে। *চণ্ডালিকা* শাদুলকর্ণাবদান কাহিনি অনুসারে লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালকন্যাকে উন্নততর মহিমা দান করেন। রাজা নাটকটি তিনি মহাবস্তাদান থেকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। 'পরিশোধ' কবিতাটি বৌদ্ধ জাতকের গল্প থেকে নেয়া। এটি পরে শ্যামা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়। এসব কাহিনিকে দীর্ঘদিন ব্যবধানে নতুনরূপ দেয়ার ফলে কবির চিন্তাধারায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা তার মানসিকতায় বৌদ্ধ প্রতিভাসের স্বরূপটি চিনতে সাহায্য করে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'শরণ' শব্দের ব্যবহার ধর্মবিকাশের প্রথম যুগ থেকে চলে এসেছে: ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মন্ত্রের ব্যবহার উপসম্পদা গ্রহণের সময় থেকেই স্বীকৃত। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণাং গচ্ছামি, সংঘং শরণাং গচ্ছামি।

'শরণ' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসংগে রবীন্দ্র নাথের গান- 'হে মহা জীবন হে মহা মরণ লইনু শরণ', 'আজি মমমন চাহে জীবন বন্ধুরে', 'নমি নমি চরণে', 'তুমি বন্ধু তুমি নাথ' প্রভৃতি। ধম্মপদে বলা আছে অত্তাহি অত্তনো নাথো, অত্তাহি অত্তনো গতি অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। মানুষের আত্মশক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আত্মশক্তির বলেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে গান- 'আমি মাড়ের সাগর পাড়ি দেব', 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা', 'বুক বেধে তুই দাড়া দেখি', 'অন্তর মম বিকশিত কর'।

রবীন্দ্রনাথের মানস গঠিত হয়েছিল প্রাচীনকালের ঋষিসুলভ দৃষ্টি এবং আধুনিক কালের বিজ্ঞানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে। এই দুই মননভঙ্গির মিল ক্রমশই গভীরতর হয়েছে। তাঁর অজস্র রচনায় এই উপলব্ধি স্পষ্ট। শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনকে তিনি তপোবনের আদর্শেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর রচনার একদিকে যেমন অতীত মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখি, অন্য দিকে অনাগত ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় স্বপ্নাবিষ্ট হতেও দেখি।

রবীন্দ্রনাথের গান মানুষের জীবনের সমস্ত মুহূর্তের রসাবেশের প্রয়োগ, আবার সমস্ত গান রচনার মধ্যেই আরাধনা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। সে আরাধনা কোনো ধর্মের বা যুগের নয় সর্বধর্মের সর্বযুগের।

তথ্যনির্দেশ

১. সুধীর চন্দ, *বহুরূপী রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪৭।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জীবনস্মৃতি", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮।

৩. *প্রাগুক্ত*।

৪. *প্রাগুক্ত*।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পাগল", বিচিত্র প্রবন্ধ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৪, পৃ. ১৭০।

৬. অরুণ কুমার বসু, বাংলা *কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪ পৃ. ৪২৩।

৭. প্রবোধ চন্দ্র সেন, *ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৯।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শরৎ", বিচিত্র প্রবন্ধ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃ. ৫৬৭।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পাগল", বিচিত্র প্রবন্ধ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৪, পৃ. ১৭০।

১০. অশ্রুকুমার সিকদার, "চিত্রাঙ্গদা : ছদ্মরূপিণী'র রূপান্তর", *কালি ও কলম*, ২০১০, পৃ. ৭৪।

১১. অনীতা মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র সংগীতে বৌদ্ধ অনুপ্রেরণা*, পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩ পৃ. ৫২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

চট্টগ্রামের প্রাচীন পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়: নির্মাণ ইতিহাস অন্বেষণ

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া*

সারসংক্ষেপ : চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন ভূখণ্ডের নাম। সমুদ্র বন্দর হওয়ায় চট্টগ্রাম বহু জনগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রও ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীনবাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বলভাবে পালরাজারা রাজত্ব করেন। এসময় ভাস্কর্য, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ প্রভাবিত হয়েছিল। পালরাজা ধর্মপাল তাঁর রাজ্যশাসনকালে বৌদ্ধধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে ৫০টিরও অধিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলোর মধ্যে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগণ্য। সেই সময় এটি ছিল পূর্ববঙ্গের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র, যাকে রাজা ধর্মপালের অনবদ্য কীর্তি বলা হয়। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশীলা, নালন্দা এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও ১৮টি বিষয়ের ওপর শিক্ষা প্রদান করা হতো। এটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও বৌদ্ধ গীতিকাব্যের সূতিকাগারও ছিল। বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ *চর্যাপদ*-এর বহু পদ বা দোঁহা এখানেই রচিত হয়। সেই সময় শিক্ষাবিস্তারে প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রটি অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাককথন

চট্টগ্রামকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সংযোগস্থল বলা হয়। ইতিহাসের স্রোতধারায় নানা নামে চট্টগ্রামের পরিচিতি রয়েছে। চট্টগ্রামের নামেও আছে আবার বৈচিত্র্য। যথা: জলন্দর, সামন্দর, চতুঃগ্রাম, চাটিগ্রাম, চাটিগাঁ, চিৎ-তৌৎ গং, চাটিগাঁও, টিৎগাঁও, চিতাগাঁও, চাটিকিয়াং, জেটিগা ইত্যাদি। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর হওয়ার কারণে সুদূর অতীত কাল থেকেই বহুজাতি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়ে আসছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জন্য চট্টগ্রাম তীর্থভূমি ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি পালরাজা ধর্মপাল শিক্ষাবিস্তারে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়'-এর নামও রয়েছে। উপমহাদেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি

* অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি, যা বর্তমানে বিলুপ্ত। তারপরও বিদ্যাশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিতে এটি আজও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

বলা বাহুল্য যে, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি-সদ্ভাব বিকাশে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম। প্রাচীন বাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয় অবলম্বন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার (তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম) জাগরণ ও প্রচার-প্রসার। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পরবর্তী সময়কালে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার উদ্ভব হয়। পরবর্তী সময়ে মহাযান শাখা থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্ট হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম ছিল বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাথে শাস্ত্রের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানে বসেই সিদ্ধাচার্যরা পদ ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের আবাসস্থল ছিল বলেই এটির নামকরণ করা হয় 'পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়'। শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনও বটে। প্রাচীনবাংলার নান্দনিক বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার দিক দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যাপক খ্যাতি ছিল।

ভৌগোলিক অবস্থা

প্রাচীন বিদ্যাপীঠ তক্ষশীলার পরবর্তী সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অন্যতম জ্ঞানতীর্থ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস-পরবর্তী পূর্ববঙ্গে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ রয়েছে।[১] ঐতিহ্য অনুসারে বাংলার চৈত্যগাঁয়ে, অর্থাৎ চট্টগ্রামে, বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল।[২] বিশ্ববিদ্যালয়টি কীভাবে ধ্বংস হয় তা বিশদভাবে জানা যায় না। তবে ১৪৫৯ খ্রি.-১৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা চট্টগ্রাম শাসন করেন।[৩] ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামে মুসলিম রাজত্বের সূচনা হয়। চট্টগ্রাম দখলের এই সময় পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় বলে অনুমিত। এমতাবস্থায় সাধারণ বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতরা প্রাণরক্ষার্থে পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান চট্টগ্রামের কোথায়, তা নিয়েও রয়েছে আবার নানা রকম মতানৈক্য। কেউ কেউ মনে করেন এটি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বড় উঠানের কাছে (বর্তমান আনোয়ারা উপজেলা) ঝিউরি গ্রামের সন্নিকটে দেয়াং (দেবগ্রাম) পাহাড়ে অবস্থিত।[৪] কেউ কেউ এটিকে চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লার রঙমহল পাহাড়ে (বর্তমান জেনারেল হাসপাতাল) অবস্থিত বলে জানান। কেউ কেউ মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়টি সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিংবা মিরসরাইয়ের পরাগলপুরে ছুটি খাঁর দীঘির সন্নিকটে ছিল।[৫] আরো জানা যায় যে দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রামের পটিয়ায় 'চক্রশালা' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। গ্রামটিতেই প্রাচীন পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।[৬]

বড় উঠান হরিকেলরাজ কান্তিদেবের রাজধানী ছিল।[৭] গ্রামটিতেই রয়েছে রাজা কান্তিদেবের

দীঘি। ৮৮ কানি (তিন হাজার চারশত নব্বই নয় ছয় শতাংশ) পরিমাণ দীঘিটি 'দেবের দীঘি' বা 'দেওর দীঘি' নামে সমধিক পরিচিত। বড় উঠান এলাকার পশ্চিমাংশে দেয়াং পাহাড়ের একটি অংশের নাম বিশ্বমুড়া। এখানে আরাকান রাজার বাড়ি ছিল। তাঁর নামানুসারে দেয়াং পাহাড়ের একটি অংশের নামকরণ করা হয় বিশ্বমুড়া। বড় উঠানের বিশ্বমুড়া রাজার কারুকার্যমণ্ডিত বাড়ি খননকালে ছোটো ছোটো নানা প্রকারের অনেক বুদ্ধমূর্তি ও পাকা ইটের রাস্তা আবিষ্কৃত হয়।[৮] আবার ১৯২৭ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে দেয়াং পাহাড়ের নিকটবর্তী আনোয়ারার (পূর্বের পটিয়া উপজেলা) ঝিউরি গ্রামে মূল্যবান বেশ কিছু বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। ঝিউরি গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলোই পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটায়। প্রাপ্ত মূর্তিগুলোর সূত্র ধরে বলা যায় দেয়াং পাহাড় এলাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল।

প্রতিষ্ঠাতা ও নামকরণ

পাল রাজারা সুদীর্ঘ চারশত বছর রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বকালে এ অঞ্চল জ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-দর্শন ও শিল্প-ভাস্কর্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বলা চলে, পালযুগে পূর্বভারত অভূতপূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তারই এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সময় চট্টগ্রামে মহাযান বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক শাখার প্রভাব ছিল খুবই বেশি। সুম্পার *Pag Sam Jon Zang* এর মাধ্যমে জানা যায় যে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি অংশ 'কোকিরাজ্য' নামে পরিচিত ছিল। আর এই কোকিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল চট্টগ্রাম।[৯] সম্রাট অশোকের সময়কাল থেকে কোকিরাজ্যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার লক্ষ করা যায়। রাজা ধর্মপালের সময় তা আরো বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে : *In these Koki countries appeared from the time of king Asoka sects of ecclesiastics later in ever large numbers, and they became very numerous, but upto the time of Vasubandhu they were only Sravakas, after a few pupils of Vasubandhu had spread the Mahayana.*[১০] শরৎচন্দ্র দাস কর্তৃক লিখিত *Indian Pandits Land of Snow* গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে বাঙালি পণ্ডিতরা অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রও হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নিচের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> The Mahayana Buddhism which … prevailed in Magadha and Tibet was preached in Chittagong by Bengali Budddhists in the 10th century A.D. Chittagong in a manner, became the centre of Buddhism in Bengal.[১১]

পাল রাজাদের সময়কালের ভাস্কর্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি দ্বারা পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ প্রভাবিত হয়েছিল। পালরাজা ধর্মপাল ৭৮৯ খ্রি.-৮২১ খ্রি. পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।[১২]

তাঁর রাজ্যশাসনকালে তিনি বৌদ্ধধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশসাধনে ৫০টিরও অধিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত বিহার তন্মধ্যে অগ্রগণ্য। সেই সময় পূর্ববঙ্গের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এটি। তিব্বতি ঐতিহ্য অনুসারে বাংলার চৈত্যগাঁয়ে, অর্থাৎ চট্টগ্রামে, সুবৃহৎ পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজা ধর্মপালের অনবদ্য কীর্তি বলা যায়।[১৩] রাজা ধর্মপাল কর্তৃক স্থাপিত প্রসিদ্ধ বিহারগুলো হলো : ত্রৈকূট বিহার (রাঢ়-পশ্চিমবঙ্গ), পণ্ডিত বিহার (চট্টগ্রাম-বাংলাদেশ), সন্নগড় বিহার (ত্রিপুরা), পাট্টিকের/পাট্টিকারা বিহার (ত্রিপুরা, বর্তমান কুমিল্লা-বাংলাদেশ), দেবীকোট বিহার (উত্তরবঙ্গ বা পুণ্ড্রবর্ধন-দিনাজপুর), ফুল্লহরি বিহার (বিহার রাজ্যের পশ্চিম মগধের মুঙ্গের নিকট), বিক্রমপুরী বিহার (মুন্সীগঞ্জ-ঢাকা) এবং জগদ্দল বিহার (বরেন্দ্র-বাংলাদেশ)।[১৪]

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার উদ্ভব হয়। পরবর্তী সময়কালে মহাযান শাখার উপর ভিত্তি করে বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান প্রভৃতি যে শাখার সূচনা হয়, তাই 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৫] বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ববঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, বিশেষ করে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক শিক্ষা ও মতবাদ প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি ছিল। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম তান্ত্রিক বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র হিসেবেও সর্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।[১৬] নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলুপ্তির পর এটি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আবর্তন করে বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক শাখার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। চট্টগ্রামের ঝিউরি গ্রামে খনন কার্যে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি তারই প্রমাণ বহন করে।

শিক্ষা

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। বৌদ্ধশিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। একেকটি বিহার (Buddhist monastery) ছিল শিল্পকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মূলকেন্দ্র। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত বৌদ্ধ বিহারগুলোতে যোগশাস্ত্র (যোগাচার), যাদুবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভৈষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। সেই সময় পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, যেখানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের পাশাপাশি বৈদিক, পৌরাণিক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মসহ অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশীলা, নালন্দা এবং বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও ১৮টি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হতো। এ প্রসঙ্গে নিচের মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য:

> Like Taxila, Nalanda, Vikramshila, teaching on eighteen subjects was given in this university. Eighteen Teachable Subjects: Sruti, Smriti, Sammuti, Samakhya, Yoga, Ethics, Baishesika, Music, Archery, Puran, Medicine, History, Astrology, Magic, the teaching of Chandra, Ketu, Mantra, Sabda. These eighteen subjects are called Shastras

means knowledge of the Scriptures.[১৭]

শিক্ষায়তনটিতে আচার্য ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাময় ও আন্তরিক ছিল। শিক্ষার্থী এবং আচার্য উভয়-উভয়কেই সহজেই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় আপন করে নিতেন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা এখানে আসতেন। শিক্ষার্থীরা বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ আচার্যদের মাধ্যমে নিজ নিজ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে নিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে শিক্ষার্থীরা তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করেন বলে জানা যায়।[১৮]

সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র

সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম ছিল ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন : 'এমনও অনুমিত হয় যে নালন্দা বিহারের গৌরব ও প্রভাব ম্লান হওয়ার কালে চট্টগ্রামই বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠে'।[১৯] এখানে অবস্থানকারী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শুধু জ্ঞানী, প্রতিভাধর ও তীক্ষ্ণজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা নয়, সর্বোপরি তাঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা সমসাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরকে জ্ঞানবিতর্ক সভায় সাদরে আহ্বান করতেন। জ্ঞানবিতর্ক সভায় উপস্থিত সকলেই শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারতেন।[২০] প্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে: *Pandit vihara of a monastery in ancient Chittagong, where Brahamanical disputants used to challenge the Buddhist to meet in religions controversies*.[২১] পারস্পারিক জ্ঞানবিতর্ক সভায় এভাবে অংশগ্রহণে প্রমাণিত হয় যে সেই সময় বৌদ্ধদের পাশাপশি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও সম্প্রীতি-সদ্ভাবের মাধ্যমে পাশাপাশি বসবাস করতেন।

চর্যাপদ রচয়িতা ও পণ্ডিত বিহার

পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে অনেক পণ্ডিত তাঁদের ধ্যান-সমাধির পাশাপশি অধ্যাপনা ও সাহিত্যও চর্চা করতেন। এটি বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার অন্যতম কেন্দ্ররূপেই শুধু, প্রসিদ্ধ ছিল না ছিল বৌদ্ধ গীতিকাব্যের সূতিকাগারও। বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ 'চর্যাপদ'-এর বহু পদ বা দোঁহা পণ্ডিত বিহারে রচিত হয় বলে জানা যায়।[২২] অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিদর্শক কিংবা অধ্যাপকও ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩] তাঁদের রচিত দোঁহা বা পদসমূহ পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে; আর তাঁরা পরিচিতি লাভ করেন 'সিদ্ধাচার্য' হিসেবে।

বলা বাহুল্য, সিদ্ধাচার্যরা বুদ্ধ প্রদর্শিত মৈত্রী-করুণা-মুদিতা এবং উপেক্ষা বোধিতে অবস্থান করে ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন। অর্থাৎ, তাঁরা ব্রহ্মবিহারে অবস্থান করে জীবনযাপন

করতেন। ব্রহ্মবিহার মার্গে বিচরণ করে তাঁরা মানবমনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। সেই শুদ্ধ এবং শান্তচিত্ত ধর্মে (ব্রহ্মবিহার) উপনীত হলে সত্ত্বমাত্রই খুব সহজেই সুখের অভিযাত্রী হতে পারে। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখা থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সহজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই সহজিয়া মতবাদ সম্পর্কে বলেন: 'বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-অর্চনা, ব্রতনিয়ম, শাস্ত্রবিধি ইত্যাদির যে প্রাবল্য দেখা দিল, সহজিয়ারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মন্ত্র-তন্ত্র, ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান বৃথা মহাসুখরূপে সহজের উপলব্ধিই পরম নির্বাণ'।[২৪] সিদ্ধাচার্যদের রচিত পদগুলোতে সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা, বেদনা এবং অনিত্যতার প্রতি যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে প্রভাস্বর আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হবার সুখানুভূতিও এতে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিতে তাঁদের রচিত পদসমূহ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যদের বৌদ্ধিক চিন্তাধারা প্রকাশিত। বলা যায়, তাঁরা বাঙালি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইতিহাসের এক গৌরবময় স্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। চর্যাপদ রচয়িতাদের নাম সচরাচর পেশাগত কিংবা বৃত্তিগত অবস্থাকে অবলম্বন করেই নির্ণিত হয়। তাঁরা ঐকান্তিক একাগ্র সাধনার মাধ্যমে নিজ নিজ পেশায় থেকে সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধি লাভ করার জন্য তাঁদের নিজের পোষাক-পরিচ্ছেদকেও কখনো পরিবর্তন করতে হয়নি। এমন কি, ত্যাগ করতে হয়নি তাঁদের স্ব-স্ব পেশাও। চর্যাপদ রচয়িতাদের আবাসভূমি ছিল সমগ্র প্রাচীনবাংলা। শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানান যে চর্যাপদের ভিতরে যে বাংলাদেশ প্রতিফলিত হয়, তা নিম্ন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপাড় থেকে আরম্ভ করে উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্তমান বিহারের কিয়দংশ এবং কামরূপ বা বর্তমান আসামের কিয়দংশ নিয়ে একটি বৃহৎ ভূ-ভাগ।[২৫] পূর্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে মগধ পর্যন্ত সহজিয়া সম্প্রদায়ের উৎস, আবাস ও বিচরণ ভূমি ছিল বলেও কেউ কেউ মনে করেন।[২৬]

চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদগুলো তিব্বতে 'তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ' (Tibetan Buddhist Cannon) হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। এরূপ বিবেচনায় এটিকে ধর্মগ্রন্থ জাতীয় রচনা বললে কোনো ভুল হবে না। বৌদ্ধযুগে বাঙালির জ্ঞানচর্চার ইতিহাস সমৃদ্ধ। বাংলাভাষী ভূভাগ ছাড়াও প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সভ্যতার অফুরন্ত নির্দশন রয়েছে। এখানে দেখা যায়, সিদ্ধাচার্যরা তন্ত্রশক্তিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের রচিত পদের মাধ্যমে প্রাচীনবাংলার সাংস্কৃতিক চর্চা, দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা এবং সামাজিক বৈচিত্র্যময়তার স্বরূপ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। তাঁদের জ্ঞানপরিধি এবং তন্ত্রসাধনার স্বরূপ সম্পর্কে *A Guide to the Deties of Tantra* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে : `*There is a well-known mahasiddhās (great tantric adepts) who nurished in India from the eight or twelfth centuries. They form the beginning of a chain of human Tantric practioners who have carried on the major form of Tantric practice to this day'*.[২৭]

আচার্য

পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকূলে জাত প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য 'তিলোপা'।[২৮] তিলোপাকে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার চক্রশালা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বলে অভিহিত করা হয়।[২৯] তিলোপা আবার বহু নামেও পরিচিত ছিলেন। যেমন: 'তিলি', 'তিলিপা', 'তিলপা', 'তিল্লিপা', 'তিল্লপা', 'তৈলোপ', 'তৈলপা', 'তোল্লপা', 'তেলোপা', 'তিলোপা', 'তিলযোগী', 'তৈলিকপাদ'।[৩০] তবে *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী* গ্রন্থে তিলোপাকে পূর্বভারতের বিষ্ণুনগর/বিগুনগরের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়।[৩১] পূর্বভারত বলতে বাংলাকেও বোঝায়। সুতরাং তিনি চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন বলে যে অভিমত পাওয়া যায় সেটি সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। উল্লেখ থাকে যে, তিনি পালরাজা মহীপালের (দশম-একাদশ শতাব্দী) সমসাময়িকও বটে।[৩২]

তিলোপা প্রথমজীবনে ব্রাহ্মণ (রাজ পুরোহিত) হলেও পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগের ফলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় 'প্রজ্ঞাভদ্র'।[৩৩] নাগবোধি ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু।[৩৪] তাঁর অসংখ্য শিষ্য এবং অনুসারী ছিল। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য নাড়োপা ছিলেন তিলোপার প্রশিষ্য।[৩৫] প্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপা) চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের (যোগাচার ও বজ্রযান শাখা) প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[৩৬] তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে প্রাচীন কার্পট্য বিহারের প্রজ্ঞাবর্ম, যিনি *ধর্মকীতির হেতুবিন্দু প্রকরণ নামক* গ্রন্থের টীকা এবং *ধর্মত্রোর উদানবর্গের উপর অসমাপ্ত টীকা* গ্রন্থ রচনা করেন, আর এই প্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপা) এক ব্যক্তি নয়। তিলোপা অসংখ্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা এবং তাঁদের স্তব স্তোত পাঠ করতেন। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তাঁর (তিলোপা বা প্রজ্ঞাভদ্র) রচিত তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থসমূহ[৩৭] হলো:

- *অচিন্ত্য-মহামুদ্রা*
- *সদ্ধর্ম-উপদেশ*
- *বাহ্য-সিদ্ধি-প্রতীত্য-সমুৎপাদ*
- *নিমিত্ত-সূচনা-ব্যাকরণ*
- *শ্রী-সম্বর-স্বাধিষ্ঠান*
- *করুণা-ভাবনা-অধিষ্ঠান*
- *তত্ত্ব-চর্তুপোদশ-প্রসন্ন-দীপ*
- *অন্তর-বাহ্য-বিষ-নিবৃত্তি-ভাবনা-ক্রম*

- *দোঁহা-কোষ*
- *মহা-মুদ্রা-উপদেশ*
- *গুরু-সাধন*

চর্যাপদের রচনাভূমি হিসেবে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে নয়, দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের নিকট ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়টির সাথে যশস্বী অনেক বৌদ্ধাচার্যের সম্পৃক্ততা ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন-নাড়োপা, লুইপা, অনঙ্গবজ্র, শর্বরিপা, অবধূতপা, থগনপা বা থকনপা, নানাবোধ, জ্ঞানবজ্র, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অমোঘনাথ, ধর্মশ্রী মৈত্রী প্রমুখ।[৩৮] আরো জানা যায় যে বিক্রমপুরের বজ্রযোগীতে জাত প্রাচীন বাংলার সূর্যসন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাবার প্রাক্কালে পণ্ডিত নাড়োপার সাথে সাক্ষাৎ করতে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কিছুদিন অবস্থান করে অধ্যয়ন করেন।[৩৯]

আশ্রয়স্থল

প্রাচীন চট্টগ্রাম ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন আরাকানের শাসনাধীন ছিল। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা চট্টগ্রাম শাসন করেন। চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীন থাকার কারণে চট্টগ্রাম এবং আরাকানিরা খুব সহজেই উভয় স্থানে যাতায়াত করতে পারতেন। আরাকানের প্রতিবেশী পগাঁ রাজ্যের প্রভাবশালী রাজা অনরহত (Anawratha, 1044 AD-1077 AD) আরাকান রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন। রাজা অনরহতের পর রাজত্ব করেন সলু (Sawlu,1077AD-1084 AD), কিয়ানজিতা (Kyanzitha,1084 AD -1112 AD) এবং অলংসিথু (Alaungsithu, 1112 AD-1167 AD)। রাজা অলংসিথু ইন্ডিয়ান ল্যান্ড অব বেঙ্গল পরিভ্রমণ করেন এবং রাজা অনরহত প্রতিষ্ঠিত অনেকমূর্তি দেখতে পান। এখানে হার্ভে তাঁর `*History of Burma* গ্রন্থে ইন্ডিয়ান ল্যান্ড অব বেঙ্গল বলতে চট্টগ্রামকে বুঝিয়েছেন।[৪০] এ বিষয়ে এ পি ফেইরি বলেন যে *The King visited the western province of this dominions, travelling through Arakan to adjoin part of Bengal.*[৪১] বাংলার এই সন্নিহিত অঞ্চল বলতে এ. পি ফেইরি চট্টগ্রামকে বুঝিয়েছেন। জানা যায় যে বখতিয়ার বিন মুহাম্মদ খিলজি বাংলা আক্রমণ করলে অনেকেই আরাকান শাসনাধীন চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ বিষয়ে নিচের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে : 'বিক্রমশীল ও ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হলে অনেক বৌদ্ধ প্রাণ রক্ষার্থে আরাকানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে'।[৪২] ধারণা করা হয়, চট্টগ্রামে যেহেতু বৌদ্ধ আধিপত্য বজায় ছিল, সুতরাং এখানে জোরালো আক্রমণ করতে পারেনি। এখানকার বৌদ্ধসমাজ ও ধর্মীয় উপাসনালয় তখন নিরাপদ ছিল। এমতাবস্থায় অনেক বৌদ্ধভিক্ষুর তখন পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আশ্রয় নেয়া স্বাভাবিক।

পুরাকীর্তি সংগ্রহ

জানা যায় যে ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঝিউরি গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের জন্য ঝিউরি গ্রাম উপমহাদেশে এখনো স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে ঝিউরি গ্রামে সফর আলী বলীর বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে ভিটা-মাটি খননের সময় ৬৬টি মূল্যবান ব্রোঞ্জ, প্রস্তর ও পিতলের বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। সংবাদটি জানার পর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের শিক্ষক ধর্মবংশ মহাথেরো নিজে 'দীপঙ্কর' নামের একজন ছাত্রকে সাথে নিয়ে উক্ত বাড়িতে গিয়ে মূর্তিগুলো চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত নন্দনকাননের বৌদ্ধবিহারে দান করার অনুরোধ করেন। কিন্তু সফর আলী বলী তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এমতাবস্থায় তিনি (ধর্মবংশ মহাথেরো) চট্টগ্রাম শহরে এসে মূর্তি আবিষ্কারের বিষয়টিকে দৈনিক পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করে দেন। ফলে একই বছরের এপ্রিল মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বুদ্ধমূর্তিগুলো সংগ্রহ করতে তৎপর হোন এবং চট্টগ্রামের কালেক্টরকে প্রত্নসম্পদ আইনানুসারে তা সংগ্রহ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।[৪৩]

পরবর্তী সময়ে কালেক্টর বুদ্ধমূর্তিগুলো উদ্ধার করে চট্টগ্রাম ট্রেজারিতে নিয়ে আসেন এবং তা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কলকাতাস্থ প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তিগুলোর মধ্যে ৫৯টি কলিকাতা যাদুঘরে, ৫টি কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় এবং ২টি বোম্বের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।[৪৪] তাছাড়া ঝিউরি গ্রাম থেকে সংগৃহীত কিছু বুদ্ধমূর্তি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারেও সংরক্ষিত রয়েছে। এন এন লাহার মতে পালরাজাদের শাসনকালে চট্টগ্রামে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল।[৪৫] সুতরাং ওই অঞ্চলে বুদ্ধমূর্তি এবং বিহার থাকা স্বাভাবিক। ঝিউরি গ্রামের দুই মাইল উত্তরে খিরপাড়া গ্রামে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আরো কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায় ।[৪৬] মূর্তিশাস্ত্র-বিশারদ অশোক ভট্টাচার্য ঝিউরি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলোকে ছয়ভাগে[৪৭] বিভাজন করে উপস্থাপন করেন। যথা :

- উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি,
- দণ্ডায়মান ও অভয় মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি,
- মৈত্রেয় ও লোকেশ্বরসহ বুদ্ধমূর্তি,
- পদ্মপাণি মূর্তি,
- লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বসুধারা (ধনের দেবী), চুণ্ডামূর্তি, ছত্রসহ স্তূপ,
- মহাবোধি মন্দিরের প্রতিমূর্তি।_

একসময় ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার সংযোগস্থল ছিল চট্টগ্রাম ।[৪৮] সুতরাং খননকার্যে প্রাপ্ত উপরিউক্ত মূর্তিগুলো সঙ্গতকারণেই চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের

অন্যতম আকর উপাদান হিসেবে বিবেচিত। মূর্তিগুলো নিয়ে দেবলা মিত্রের *Bronzes from Bangladesh* (1981) এবং অশোক কে ভট্টাচার্য *Jhewari Bronze Buddhas- A Study in History and Style (*1989*)* শিরোনামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। পুরাতত্ত্ব বিষয়ের গবেষক দেবলা মিত্র তাঁর `*Bronzes from Bangladesh'* গ্রন্থে ঝিউরিতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলোর গঠনশৈলী এবং প্রাপ্তিস্থান বিষয়ের নিচের অভিমতটি বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। এখানে তিনি বলেন :

> As excavation or even a proper exploration has not been conducted at Jhewari, it could not be determined if the images belonged to a Buddhist establishment at Jhewari itself and were cast here or were collected and concealed here on the eve of calamity or with a certain motive. In any case it is apparent that most of these metal images were cast withing this district itself in view of the fact that a group of images of Buddha (some of which are fairly large in dimentions) presents a distinctive art-from and style; certain features of this group are also present in some other groups of images from this hoard. It is also not unlikely the leading centre of the metal-casting was near the Chittagong town where at flourished, according to Tibetan texts, an important Buddhist establishment called Pandit Vihara. It is also likely that there existed more than onemetal-casting workship within this district. [৪৯]

বর্তমান উদ্যোগ

পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি ভাবে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে অনেকেই উল্লেখ করেন। তবে সুখের বিষয় যে, গৌরবদীপ্ত জাতীয় ইতিহাস সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখানে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে ২০১১ সালের ১৫ই জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর প্রাচীন চৈত্যভূমি-খ্যাত আনোয়ারা উপজেলায় অবস্থিত জ্ঞানতীর্থ পণ্ডিত বিহার পীঠভূমিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের ২৫শে এপ্রিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইনের একটি খসড়া তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করলে সেখানে এটি গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি কমিটি গঠন করে দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা

পরিদর্শন করেন। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বৌদ্ধ প্রধান দেশসমূহের সাথে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পাশাপাশি পারস্পরিক সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

উপসংহার

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঝিউরিতে এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঝিউরি গ্রামের দুই মাইল উত্তরে খিরপাড়া গ্রামে খননকার্যে আবিষ্কৃত হয় বুদ্ধমূর্তি। আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তি প্রমাণ করে এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল। এখানে বৌদ্ধধর্ম ধর্ম-দর্শন, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাশাপশি শাস্ত্রের বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চর্চা হতো। শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। চর্যাপদের লালনক্ষেত্র হিসেবে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য শুধু চট্টগ্রামের নয়, সকল বাংলাভাষী মানুষের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলাস্থ দেয়াং পাহাড়ে খননকার্যের মাধ্যমে যদি পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সুনিশ্চিত করা যায়, তবে এদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে সংযোজিত হবে এক অজানা ও বিস্মৃত অধ্যায়। সরকার এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা বাস্তবায়িত হলে এতদঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি বৌদ্ধপ্রধান দেশসমূহের সাথে ভ্রাতৃত্বময় সম্পর্কও স্থাপিত হবে।

তথ্য নির্দেশিকা ও টীকা

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, *আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৫৮৮।

২. Debiprasad Chattopadhyaya (ed.), *Tāranātha's History of Buddhism in India,* K.P Bagc hi and Company New, Delhi, 1980, p. 254-255 .

৩. চৌধূরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৮।

৪. সুব্রত বড়ুয়া, *অশোক বড়ুয়া*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১৬।

৫. জামাল উদ্দিন, *চট্টগ্রামের ইতিহাস জনবসতি, নামকরণের যৌক্তিকতা, কালনির্ণয়, ও পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়*, বলাকা, চট্টগ্রাম, ২০০৯, পৃ. ৫৩।

৬. *Bangladesh District Gazetterer Chittagong* (General Editor, S.N.H Rizu), The Govt. of the Peoples Republic Bangladesh, Dhaka, 1975, p. 60 .

৭. আবদুল হক, *প্রবন্ধ বিচিত্রা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩১।

৮. আবদুল হক, *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড*, চট্টগ্রাম, ১৯৮২, পৃ. ১০৯।

৯. Sumpa Khan-Po Yeçe Pal Jor, *Pag Sam Jon Zang, Part-1*, The Presidency Jail Press Calcutta, 1908, p. 8 .

১০. In. সুনীতিভূষণ কানুনগো, *চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস*, বাতিঘর, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩৮।

১১. *O' Malley, L.S.S Eastern Bengal District Gazetteer Chittagon,* Calcutta, 1908, p. 65 .

১২. Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakrabarti, Vol.I, *History of Bangladesh-Early Bengali in Regional Perspective (up to 1200 CE),* Asitic Society of Bangladesh, Dhaka 2018, p. 832 .

১৩. Debiprasad Chattopadhyaya (ed.), *op.cit,* p. 254-255

১৪. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, ৫২৪; সাধনকমল চৌধুরী, *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবির্বতন*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭; ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস* ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় ভাগ, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৯৫।

১৫. মহাযান বৌদ্ধধর্মের পরিণতিতেই কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। মোটামুটিভাবে অষ্টম শতক কিংবা তার পূর্ব থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার স্পর্শ লাগে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাচীন বাংলা ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। পালরাজাদের সময়কালে বৌদ্ধধর্মের যে অভিনব রূপান্তর সাধিত হয়, তা-ই 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম' নামে অভিহিত। বিস্তারিত দেখুন : Shashi Bhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature*, Firma K.L Mukhopadhyay, Calcutta, 1962, p. 27 .

১৬. D.G Apte, *Universities in Ancient India,* Maharaja Saylirao University, Baroda, p.180; সাধনকমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে এভাবে: `The Buddhist of Chattagram belonged to the Tantric Mahayana school' In. সুনীতিভূষণ কানুনগো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৭. http://www.ajer.org/papers/v2(12)/ZF212276295.pd .

১৮. সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশে পালি ও বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা : একটি সমীক্ষা*, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩৭।

১৯. আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২।

২০. Debiprasad Chattopadhyaya (ed.), *op.cit,* p. 225

২১. Sumpa Khan-Po Yeçe Pal Jor, Part-i, *op.cit,* P. 62; একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বাতন্ত্রিকতার স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডি কে বড়ুয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন: `Pandit Viharaa a notable centre of Tantrayana Buddhism, the vihara in question was awell-known forum of the Buddhist and the Brahamanical

disputants.' D.K Barua, *Viharas in Ancient India: A Servey of Buddhist Monasteries*, Indian Publications, Calcutta,1969, p. 180 .

২২. সুব্রত বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

২৩. জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

২৪. *ভারত কোষ*, পঞ্চম খণ্ড মদনমোহন কুমার (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৪৮।

২৫. উদ্ধৃত, হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী (সম্পাদিত), *জগজ্জ্যোতি*, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৪।

২৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৫।

২৭. Vessantra, *A Guide to the Deties of the Tantra*, Windhore Publication, UK, 2008, p. 8 .

২৮. Sumpa Khan-Po Yeçe Pal Jor, Part-i, *op.cit,* p. 100; নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩০; মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*-পুরানা আমল, নয়ালোক প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫; ধর্মাধার মহাস্থবির, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, ধর্মাধার গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১২।

২৯. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া (সম্পাদিত), *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৫৮; জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০; এম. এ নুরুল হক, *বৃহত্তর চট্টল*, তৈয়ব প্রিন্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ৮৪।

৩০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০ সুনীতিভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

৩১. অলকা চট্টোপাধ্যায় (অনূদিত), *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী* (মূলঃ লেখকের নাম অনুল্লেখিত তিব্বতী চতুরশীতি সিদ্ধ প্রবৃত্তি), প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৮।

৩২. Sumpa Khan-Po Yeçe Pal Jor, Part-i*, op.cit,* p. 41; Puspo Niyogi, *Buddhis in Ancient Bengal*, Mahabodhi Book Agency, Kolkata, 2016, p. 78

৩৩. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০০-৬০১; ধর্মাধার মহাস্থবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২; R.C. Majumder, *History* of *Bengal*, Vol. 1 (Ed.), *T*he University of Dhaka, Dhaka, 2006, p. 346; আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৩৪. Georce.N Roerich, *The Blue Annals,* Part-i & ii, Motilal Banarsidas, Delhi,149, p. 361

৩৫. R.C. Majumder, *op.cit,* p. 346; মাহবুব উল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৩৬. সুনীতিভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪ ধর্মাধার মহাস্থবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২; এম. এ নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৩৭. অলকা চট্টোপাধ্যায় অনূদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

৩৮. Binayendra Nath Chaudhury, *Buddhist Centres in Ancient India,* Sanskrit College, Calcutta,1982, p. 224. মাহবুব উল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪; জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৯. জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

৪০. G.E Harvey, *History of Burma,* Frank Cass & Co. Ltd, London, 1967, p. 48

৪১. A. P Phayre, *History of Burma,* Trubner & Ludgati Hill, London, 1983, p. 39

৪২. Sumpa Khan-Po Yeçe Pal Jor, Part-1, *op.cit,* p. 139

৪৩. আবদুল হক চৌধুরী, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩১।

৪৪. জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৪৫. উদ্ধৃত, সুনীতিভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

৪৬. জামাল উদ্দিন *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩ ও ৫৫।

৪৭. আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৪৯. Debala Mitra, *Bronzes from Bangladesh,* Agami Prakasan, Delhi, 1982, p. 1-2 .

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

শহিদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ ও তাঁর মানবিক মূল্যবোধ

মিলটন কুমার দেব*

সারসংক্ষেপ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদ একজন শহিদ ও জ্ঞানতাপস। শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদ ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই তিনি ছিলেন মানবিকতা ও মূল্যবোধ-সচেতন ব্যক্তিত্ব। পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব তাঁর জানা ছিল। এজন্য ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে অংশ নেন এবং প্রিয় স্বদেশভূমির কল্যাণসাধনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করার ব্রতে নিবেদিত হন। মুক্তিযুদ্ধকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য গিয়াসউদ্দিন গোপনে তাঁর ছোট ভাই ডাঃ রশিদউদ্দিনের সহযোগিতা নিতেন; তাঁদের জন্য খাদ্যসমগ্রী-বস্ত্র-ঔষধ ইত্যাদি সরবরাহ করার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। জানা যায়, এসময়ে গিয়াসউদ্দিন তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তারদের কাছ থেকে টাকা, শীতবস্ত্র, ঔষধপত্র, চাল-ডাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র জোগাড় করে কবি সুফিয়া কামালের বাসায় দিয়ে আসতেন। মুক্তিযোদ্ধারা সেখান থেকে এসব সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। অসাম্প্রদায়িক, প্রতিবাদী ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী গিয়াসউদ্দিন আহমদ যে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরাগভাজন হবেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেশের শত্রুরা যখন তাদের পরাজয় অত্যাসন্ন বুঝতে পেরেছে, তখনই স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সূর্য উদিত হওয়ার আগে থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করতে তারা উঠে পড়ে লাগে। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখেই সর্বাধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবী শহিদ হন। শহিদ গিয়াসউদ্দিন আহমদও তাঁদের একজন। দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে তিনি আজ অমর। তাঁর আত্মদান ও মানবিক মূল্যবোধের অনুসন্ধান করা এই রচনার উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

গিয়াসউদ্দিন আহমদ একজন শহিদ বুদ্ধিজীবী। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ যেসকল বুদ্ধিজীবীর আত্মদানের মহিমায় সমুজ্জ্বল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদ সেই ধী-সম্পন্ন বলয়ের একজন অনুপম ব্যক্তিত্ব। ১৯৭১-এ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর নরঘাতকরা যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তার করুণ শিকার তিনি। সেসময়ে গিয়াসউদ্দিন আহমদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বিশ জন শিক্ষক শহিদ হন (কাজল, ২০১৯ : ৫০)। ১৯৭১ সালে হত্যার শিকার এরা সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসন্তান, তাঁরা

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এদেশের বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী কারা? এপ্রসঙ্গে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*-এ লেখা আছে :

> বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী। (রশীদ, ১৯৯৪ : প্রসঙ্গমালা)

পাকিস্তানিরা ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বুদ্ধিজীবী গিয়াসউদ্দিন আহমদসহ অন্যদের হত্যা করার জন্য নিশানা করেছিল, কারণ এ হায়েনারা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও প্রভাবকে দমন করতে চেয়েছিল। ১৯৭১ থেকে ২০২১। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর আসে। আমরা শহিদ গিয়াস স্যারসহ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি। গিয়াসউদ্দিন আহমদ একজন শহিদ একথা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু তাঁর পরিচয় ও মানবিক মূল্যবোধের অসাধারণ দিকটি আমাদের অনেকেরই অজানা। শহিদের এই দিকটি সকলকে অবগত করার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক নিয়ে বহু গবেষণা হলেও দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পূর্বপরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ এবং এর সাথে সংযুক্ত বেদনাবিধুর ঘটনাপ্রবাহ পুনর্গঠনের জন্য গবেষণাকর্মের অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র দেশের বুদ্ধিজীবীদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের মূল্যায়ন এখন সময়ের দাবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শহিদ শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী গিয়াসউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সূচনালগ্ন হতে তাঁর জীবনসায়াহ্ন অবধি বাঙালির স্বাধীনতায় অবিচল বিশ্বাস ধারণ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মনন করেছেন, প্রিয় মাতৃভূমির জন্য নিঃসংকোচে নিজের জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এই শহিদের জীবন ও কৃতির আবেদন অনস্বীকার্য, জীবনে জীবনে তা বাংলাদেশের জনমানুষ তথা তরুণ প্রজন্মের জন্য সৎ ও নির্ভীক জীবনের পাথেয় হয়ে রইবে। আলোচ্য প্রবন্ধ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত করতে এবং স্বাধীনতা অর্জনে শহিদ গিয়াসউদ্দিনের কৃত ভূমিকা জানতে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। সাথে সাথে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি রাজাকার, আলবদরদের ষড়যন্ত্র বিষয়ে আগামী প্রজন্মকে অবগতকরণের দ্বারা তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম ও সচেতনার উদ্দীপনা আনয়ন করবে বলে আশা করা যায়।

এই গবেষণা-কর্মের জন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে আছে গিয়াসউদ্দিনের ব্যক্তিগত ফাইল, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত, তাঁর নিকটজনের সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত প্রতিবেদন প্রভৃতি। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বই, স্মারকগ্রন্থ, সাময়িকী ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিচয়

গিয়াসউদ্দিন আহমদ একজন অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষক, মানবতাবাদী চিন্তানায়ক এবং দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক। তিনি ১৯৩৩-এ পিতার কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বিভিন্ন নথিপত্রে ভুল করে তাঁর জন্মস্থান নরসিংদীর বেলাব বলে উল্লিখিত আছে। তা সঠিক নয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল গফুর, পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর মাতা শামসুন্নাহার বেগম (মিলটন, ২০২১ : ৩৫)। তবে তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল নরসিংদীর বেলাব। পিতা-মাতার আট সন্তানের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন তৃতীয় এবং ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। গিয়াসউদ্দিন আহমদের বোনের মধ্যে তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা হলেন– হামিদা বানু, ফরিদা বানু ও সাজেদা বানু। অপর দুই বোন খোরশেদা বানু এবং খালেদা বানু গৃহিণী। গিয়াসউদ্দিনের বড় ভাই প্রয়াত নাসিরউদ্দিন আহমদ ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব। আর ছোট ভাই ডা: রশিদউদ্দিন আহমদ ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নিউরোসার্জন। দীর্ঘদিন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে সেবা প্রদান করেছেন।

শহিদ গিয়াসউদ্দিনের ডাকনাম ছিল বাচ্চু। পরিবারের সবাই তাঁকে সেই নামেই ডাকতেন। তিনি ১৯৫০-এ ঢাকার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯৫২-তে ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ পাশ করেন (অজয়, ১৯৮৮ : ১৭)। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রায় সকল বিষয়ে খুব ভালো নম্বর অর্জনসহ কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করলেও গিয়াসউদ্দিনের বিশেষ আগ্রহ ছিল ইতিহাস ও ঐতিহ্য পাঠের প্রতি। এ আগ্রহের জন্যই তিনি বি. এ (সম্মান) পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। এ বিষয়ে পড়াশোনা করে তিনি ১৯৫৫ সালে বি. এ (সম্মান) এবং ১৯৫৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গিয়াসউদ্দিন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। সেসময়ে এই হলের ১২৬ নং রুমে অবস্থান করতেন গিয়াসউদ্দিন। ঐ রুমে আরো থাকতেন আবুল মাল আবদুল মুহিত (বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী)। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৪ সালে তিনি সেসময়কার অত্যন্ত সম্মানজনক কমনওয়েলথ শিক্ষাবৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি নিয়ে ঐবছরের ১৮ সেপ্টেম্বর গিয়াসউদ্দিন ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সে আন্তর্জাতিক ইতিহাস বিভাগের অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। প্রখর মেধাবী গিয়াসউদ্দিন আহমদ চাইলেই খুব সহজে পিএইচ.ডি কোর্সের জন্য ভর্তি হতে পারতেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন ছিলেন অন্যরকম। তিনি বেছে নিলেন অনার্স কোর্স। এ ধরনের কোর্স সমাপ্তকরণে শিক্ষার্থীদের তিনি আরো বেশি তথ্যসমৃদ্ধ পাঠদান করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করতেন। এজন্য তিনি পিএইচ.ডি কোর্সের বদলে ভর্তি হন অনার্স কোর্সে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা বিরল। একজন শিক্ষক হিসেবে

উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়েও তিনি ভেবেছেন কি করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষামানের উপকার হবে। এবিষয়টির অবতারণা করে গিয়াস স্যারের ছাত্র মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর) লিখেছেন :

> ... উচ্চ শিক্ষার্থে গিয়াসউদ্দিন আহমদ গেলেন লন্ডন স্কুল অব ইকোমিক্সে, যার স্কুল অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজ এখনও দুনিয়া কাঁপানো খ্যাতির অধিকারী। প্রায় সব মহলকে অবাক করে দিয়ে গিয়াসউদ্দিন আহমদ পিএইচ.ডিতে না গিয়ে অনার্স পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাখ্যা একটাই। ইতিহাসের কোনো একটি শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেয়ে এই গভীরভাবে চমকপ্রদ বিষয়ের অনেকগুলো শাখার জ্ঞান তিনি আহরণ করতে চাইলেন। বাস্তবে অত্যন্ত সফল একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ২১৪)।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. সম্পন্ন করার পর ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) ইতিহাস বিষয়ের লেকচারার পদে যোগদান করেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্ব সূচিত হয়। প্রায় একবছরের মতো সময় তিনি এখানে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে জগন্নাথ কলেজের ধীমান শিক্ষক ও গবেষকদের সাথে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ড থেকে আন্তর্জাতিক ইতিহাস বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি করে ১৯৬৭-তে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের কল্যাণ বিধান ও তাদেরকে সেবাদানই যেন ছিল তাঁর পরম ব্রত।

শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদ ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই তিনি ছিলেন ইতিহাসসচেতন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে অংশ নেন এবং প্রিয় স্বদেশভূমির কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করার ব্রতে নিবেদিত হন। নিজে মূলত জ্ঞান বিতরণের প্রদীপ হয়েও আবির্ভূত হয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক তথা দেশমাতৃকার পরম বন্ধু হিসেবে। ইতিহাসকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। যাঁরা ইতিহাসকে ভালোবাসে তাঁরা পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক। শহিদ শিক্ষক ও মানবিক ব্যক্তিত্ব গিয়াস স্যারের চিন্তা ও কর্ম পরিচালিত হয়েছে শোষিত ও বঞ্চিত বাঙালির মুক্তির জন্য।

অপহরণ ও হত্যা

শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদ যে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তানপন্থী কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জানা ছিল। এবং তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পাকসেনারা গিয়াসউদ্দিন আহমদকে একবার ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেন। সেবার ছাড়া পেলেও ১৪ ডিসেম্বর আর পাননি। শহিদ হন নরঘাতকদের

টার্গেটে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অন্তঃপ্রাণ গিয়াসউদ্দিন আহমদের পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর সদস্যদের দ্বারা ধৃত হওয়ার ঘটনাটি খুবই হৃদয়বিদারক। তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন শহিদ শিক্ষক গিয়াসউদ্দিনের ভাগ্নি মাছুমা বানু রত্না। তিনি বলেন :

> ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়, আমার বয়স ছিল ১৭ বছর। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণির ছাত্রী ছিলাম। ওই সময় আমি আমার মামা শহিদ অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদের নীলক্ষেতস্থ বাসায় থেকে লেখাপড়া করতাম। ... মামা হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে হাউজ টিউটর ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মুহসীন হলে সাপ্লাইয়ের কোন পানি ছিল না।– এ খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ৭ টা বা পৌনে ৮টার দিয়ে আমার মামা অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ স্লিপিং সুটের শার্ট এবং লুঙ্গি পরে মুহসীন হলে পানির পাম্পের কাছে যান। আনুমানিক সকাল ৮টার দিকে ইপিআরটিসির একটি মিনিবাস বাসার সামনে এসে থামে। সেই বাস থেকে দু'জন নেমে দোতলায় উঠে আসে যেখানে আমার মামা ও আমরা থাকতাম। তারা দোতলায় এসে কড়া নাড়ে। যে দু'জন আমার বাসায় সশস্ত্র অবস্থায় মামাকে খুঁজতে গিয়েছিল এবং পরে মুহসীন হল এলাকা থেকে তাঁকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়, এরা হলো আশরাফুজ্জামান খান ও চৌধুরী মঈনুদ্দীন। এরা দু'জনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা ছিল। যেহেতু আমি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম, সে কারণে চিনতাম। এরা দু'জনই মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিল।
>
> ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখে আমার বড় খালু আবদুল মোমেন খান (সাবেক খাদ্য সচিব) খবর পেয়ে মিরপুরের বধ্যভূমিতে যান এবং আমার মামার পরিধেয় বস্ত্রাদি দেখে মামার গলিত লাশ সনাক্ত করেন। পরিধেয় বস্ত্রাদিসহ বিকৃত লাশ ওখান থেকে তুলে এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর কবরের পাশে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাফন করা হয়। (মিলটন, ২০২১ : ৩৭)।

শহিদ ও ধীমান শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আসলে অপরাজেয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মান পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় "গিয়াসউদ্দিন আহমদ স্মারক বৃত্তি"।

গিয়াসউদ্দিনের মানবিক মূল্যবোধ

শহিদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ ছিলেন মানবিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল নজির। মানবতাবোধ ও দায়িত্ববোধ তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে, ১৯৬৫-এ বাংলাদেশে দেখা দেয় প্রলয়ংকরী এক বন্যা। বন্যা-পরবর্তী সময়ে দেশের পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার জন্য ঐ বছরের ২৮ মে তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের বরাবর একটি চিঠিতে লেখেন, If the staff of the University has agrees on any contribuition to the cyclone-relife fund, I do autherise the necessary

deduction from my salary bill.(রশীদ, ১৯৯৪ : ৪২)। শিক্ষক হিসেবে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন নিবেদিত মানুষ। সকল শিক্ষার্থীদের নিকট তিনি ছিলেন একজন অভিভাবকের মতো। জানা যায় ইতিহাস বিভাগের একদল ছাত্রছাত্রী শিক্ষাসফরের উদ্দেশ্যে একবার ভারতে যায়। এসময় ছাত্রছাত্রীদের সাথে কয়েকজন শিক্ষকও যান, এঁদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিনও ছিলেন। শিক্ষাসফরের একপর্যায়ে একজন ছাত্র হঠাৎ করে জলবসন্ত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লে গিয়াস স্যারই তার সেবা যত্নের দায়িত্ব নেন। শুধু তাই নয় ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান উপভোগ করার আগ্রহটি অপূর্ণ রেখেই তিনি সেই অসুস্থ ছাত্রকে সাথে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। কারণ, বাকিরা সংক্রমিত হতে পারে সে আশঙ্কা তিনি করেছিলেন। দেশে এসেও তিনি সেই ছাত্রের সেবাযত্ন অব্যাহত রাখেন। এর তিন দিন পর তিনিও মারাত্মকভাবে জলবসন্তে আক্রান্ত হন। কিছুদিন পর অবশ্য তিনি ও তাঁর ছাত্র দুজনেই সুস্থ হয়ে যান।

যে কারোর বিপদআপদে সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা মানুষটির নাম গিয়াস স্যার। তাঁর এই মানবিক দিক লক্ষ করে ছাত্রছাত্রীরা বলতেন, বাবা মা স্যারের নাম 'বিপদতাড়ন' রাখলে বেশ ভালো হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে গিয়াস স্যারের ছাত্র, বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. টি. এম শামসুল হুদা তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া গিয়াস স্যারের স্মৃতিসুধা নিয়ে লেখেন :

> ...একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আমি ইতিহাস বিভাগীয় দপ্তরে ঐদিনই সাক্ষাতকারের জন্য অনুরোধ জানাই। বিভাগীয় প্রধান ঐদিন অফিস করে বাসায় ফিরে গেছেন – এজন্য পরের দিন ছাড়া কোনোভাবেই সাক্ষাতকার সম্ভব নয় বলে অফিস সহকারী আমাকে জানালেন, আমি যখন অফিস সহকারীর সাথে কথা বার্তায় ব্যস্ত তখন একজন সুদর্শন তরুণ ব্যক্তি ভারি গলায় সহকারীর কাছে ব্যাপারটি জানতে চান। সব শুনে তিনি আমার কাছে দেরিতে আসার কারণ জানতে চান। ... সব শুনে তিনি বিভাগীয় প্রধানের রুমে ঢুকে ফোনে তাঁর বাসায় কথা বলেন। রুম থেকে বের হয়ে তিনি অফিস সহকারীকে তক্ষুণি ফর্মটি বিভাগীয় প্রধান ড. হালিমের নয়া পল্টনস্থ বাস ভবনে নিয়ে তাঁর অনুমোদন সংগ্রহ করে আমাকে হাতে হাতে দেয়ার নির্দেশ দেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্তের সুরে বললেন: তুমি ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে ফরম নিয়ে যাবে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাসে ইউরোপের ইতিহাস - প্রথম পত্র আমাদের পড়াবেন। সে সময় তাঁর সাথে আরও কথা হবে। (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ২০৮)

ইতিহাস বিভাগে সাবেক শিক্ষার্থী নুরন নাহার সামাদ তাঁর স্মৃতিচারণা করে বলেন, ষাটের দশকে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিবারগুলোর প্রতি সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টি ছিল। তাঁদের সেই কঠিন পরিস্থিতিতে গিয়াসউদ্দিন আহমদ তার অধ্যয়নের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সহায়তার হাতকে প্রসারিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছেন। নুরন নাহার সে সময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে মাস্টার্স শেষ পর্বে শিক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে গিয়াসউদ্দিন আহমদকে একটি চিঠি লেখেন। পত্রটি বিলম্বে তাঁর হস্তগত হলেও তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে এসেছিলেন। নুরন নাহারের পত্রের উত্তরে তিনি লেখেন :

> কল্যাণীয়া, তোমার চিঠি পেতে আমার বেশ দেরি হয়েছে। বুবুর ওখানে এসে চিঠিটা পড়ে ছিল। ওই বাসা আমি ছেড়ে এসেছি ছুটির পর। মাঝখানে কত দিন ঢাকায় ছিলাম না। তোমার ভর্তি হয়তো সম্ভবপর হবে। Admission form পাঠালাম। Fill up করে register -এর কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। ডাকে পাঠালেও চলবে। তোমার আসার দরকার নেই। শুধু এই জন্য আমার কাছে বা Head of the Dept.-এর কাছে নয়। This is Dr. Halim's Categorical directives. তুমি যদি কারো হাত দিয়ে Register office-এ পাঠাও তাহলে ওরা বলে দেবে Head of the Dept.-এর কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু হালিম সাহেব চান office-এ form receive করে ওরা officially ডিপার্টমেন্টে পাঠাক। এইখানে যেন চালে ভুল করো না। কিন্তু যদি register office তোমার form Dept.-এ না পাঠিয়ে তোমাকে বলে দেয় সে সময় পার হয়ে গেছে তাহলে একটু মুশকিল হবে। তখন তাড়াতাড়ি আমাকে জানিও। তুমি এখন ভালো করে ভেবে দেখো কী করবে। M. A. part-11 পড়বে না B.A. ই পাস করে নেবে। এখানে এসে তুমি কোথায় থাকবে। Hostel-এ জায়গা আশা করতে পারো না এই সময়? ধীরে সুস্থে ভেবে যা হয় ঠিক করো। ভর্তি হতে চাইলে আর দেরি কোরো না। শুভেচ্ছা জেনো। (রতনলাল চক্রবর্তী, ১৯৯৭ : ১০১)

একজন মানবিক শিক্ষকের একান্ত সহযোগিতায় একজন শিক্ষার্থীর একটি জটিল সমস্যা কত সহজে সমাধান হতে পারে, এই ঘটনা তাঁর প্রমাণ বহন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে পাঠদানের পাশাপাশি গিয়াসউদ্দিন দায়িত্ব পালন করতেন মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে, এসময়েও তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধের চরম প্রকাশ হয়েছিল। ১৯৬৯-এর ১২ জানুয়ারি সংঘটিত একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ্য। এদিন খবর বেরোয় যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. জোহা পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। এ ঘটনায় প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে পড়ে। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বসুনিয়া গেইটের কাছাকাছি আসলে দেখা যায়, পাঞ্জাবি আর চাদর পরিহিত গিয়াস স্যার ব্যতিব্যস্ত হয়ে দৌড়ে আসেন। মিছিলে থাকা ছাত্রদের নিকট তিনি জোড় হাতে কিছু কথা নিবেদন করেন। সেদিনের কথা স্মরণ করে এক ছাত্র লেখেন :

> আমরা তখন বলতে গেলে মৃত্যু মাতাল তবুও স্যারকে এড়িয়ে যেতে পারলাম না, তিনি দু'হাত জোর করে যা বললেন তার সারমর্ম হলো: 'বাবারা অহেতুক মৃত্যুর কোনো মানে নেই। এখন তোমরা এগিয়ে গেলে সশস্ত্র বাহিনী তোমাদের মেরে ফেলবে, রাতে অন্ধকারে তোমাদের লাশও খুঁজে পাবো না, দেশ তোমাদের কাছে বিশাল ত্যাগ আশা করছে। পূর্ব দিগন্তে সহসাই লাল সূর্যটা উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। ওটা ছিনিয়ে আনতে হবে। তোমরা না থাকলে ওটা কে

> ছিনিয়ে আনবে? আমি তোমাদের স্বপ্ন কি জানি, তোমাদের স্বপ্ন – এ দেশটিকে মুক্ত করা। তাই তোমাদের বাঁচতে হবে। আমি হাত জোড় করে তোমাদের বলছি, 'ফিরে চল'। সেই রাতে তাঁর কথায় আমরা ফিরে না এলে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখতে পারতাম না। সেদিনকার মিছিলে আমরা যারা ছিলাম তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং এখনও বেঁচে আছি। আর আমাদের ত্রাতা গিয়াস স্যার মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর নিহত দেহটাকেও চিহ্নিত করা কঠিন ছিল। তিনি নিহত হয়েছেন মুহসীন হলের কিছু কুলাঙ্গার আলবদরের হাতে। ওরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে আর স্যার আমাদের মন-মন্দিরে। (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ২৪৫)

শুধু ছাত্রছাত্রীদের উপকার করা নয়, নিজ পরিবারের মানুষদের জন্যও তিনি ছিলেন যেন বিপদভঞ্জন। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অতল। তাঁর বোন খালেদা বানু জানান :

> ১৯৬০ সালে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাঁর ক্যান্সার হয়েছিল। বাচ্চুদাকে দেখতাম মার রোগ শয্যায় পাশে নিনির্মেষ চেয়ে চেয়ে দেখছেন। তিনি ছেলে হয়ে মার যে সেবা করেছেন আমরা মেয়ে হয়েও তা করতে পারিনি (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ১২৫)।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ পাণ্ডিত্য যেমন ছিলেন প্রখর, সামাজিক আচার-আচরণে ছিলেন ততোধিক বিনম্র, সদালাপী ও অনাড়ম্বর। ইউরোপের ইতিহাস তাঁর আগ্রহের বিষয় হলেও ধ্যান-ধারণায় ও চিন্তা-চেতনায় তিনি ছিলেন শতভাগ বাঙালি। সময়ের ব্যতিক্রম ছাড়া পাজামা-পাঞ্জাবিই ছিল তাঁর নিত্যদিনের ভূষণ, যা তাঁকে দিয়েছিল একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ববাংলার শিক্ষিত সমাজের উদারপন্থি প্রগতিশীল ধারার ধারক ও বাহক। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের ভাবাদর্শ হয়তো তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তিনি রেনেসাঁর অন্যতম মর্মবাণী 'মানুষই সকল কিছুর নিয়ামক'- এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে এক রেস্টুরেন্টে বসে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন আহমদের নিজস্ব বিশ্লেষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে জাহানারা হক বলেন :

> ... লন্ডন স্কুলের ছয়তলায় মায়াদি এবং আরো দু-একজনকে নিয়ে খেতে বসেছিলেন গিয়াস। জাতিবিদ্বেষ সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তিনি বলছিলেন, 'যাই বলেন না ক্যান মায়াদি সব মানুষের শরীরে থাকে একই মাংসপেশি, একই ঝিল্লি আর একই লোহিত আর শ্বেত রক্তকণিকা। শুধু বাইরের চামড়া একজনের একটু সাদা আর একজনের কালো এই অপরাধেই কি এত উপনিবেশবাদ, এত অন্যায়, এত জুলুম।' মায়াদির প্রচ্ছন্ন সতর্কবার্তায় সসংকোচে গিয়াস বললেন, 'কি করুম মায়াদি, আল্লায় দিছে দরাজ গলা- এ দেশে প্রাণ খুইল্যা দুইটা কথা বলতে পারি না- দেশে ফিরা হয় মসজিদে আজান, নয়তো রমনার রেসকোর্সে বক্তৃতা- এ ছাড়া উপায় নাই। (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ৭৭)

মানবিক গিয়াসউদ্দিনের সংবেদনশীল মন স্বপ্ন দেখত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আর মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার, সর্বোপরি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের। মুক্তিযুদ্ধদিনে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের, বিশেষত হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের জীবন নির্বাহ করার ন্যূনতম খরচের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জনের নিকট হতে তাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ সাহায্য নিয়ে তা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে যে তিনি মোট কত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেসবের পুরো তথ্য আমাদের অজানা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক তাহমিনা আহমদ (গিয়াসউদ্দিন আহমদের বড় ভাই নাসিরউদ্দিন আহমদের মেয়ে) গিয়াসউদ্দিন আহমদের স্মৃতিচারণা করে বলেন :

> 'Kaka loved cating but more than that, he loved sharing food with others; a charecteristic feature that he shard with my father, his older brother. He was a bechelor but always had containers full of biscutis, Chocholates and chanachur, in his house. Kaka used to buy pounds and pounds of these sncaks from his fovourite confectionery stores, capital and Olympia. One of his most favourite snacks was kima porota, a thick loaf filled with cooked minced meet. He would buy it from flavour confectionary at stadium, strangely enough, it disapperared very soon from the shop after the brith of Bangladesh.' (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ৩৩০)

১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক ড. আবুল খায়ের, বাংলার ড. রফিকুল ইসলাম, সমাজবিজ্ঞানের সাদউদ্দিন, ইংরেজির আহসানুল হক এবং গণিতের শিক্ষক আ. ন. ম. শহীদুল্লাহকে পাকবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেকেন্ড ক্যাপিটাল (বর্তমান শেরে বাংলা নগর) আর্মি ক্যাম্পে প্রায় দেড় মাস আটক রেখে তাদের জেরা করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে গিয়াসউদ্দিন তাঁর বোন ফরিদা বানুকে জানান যে, তিনি শহীদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী যোবেদা আখতার রুনুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। ফরিদা বানু ও যোবেদা আখতার রুনু দুজনেই ইডেন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। শহীদুল্লাহ সাহেবকে ধরে নেয়ার পর যোবেদা তাঁর বাবার কাছে কমলাপুর চলে যান। সেই ঠিকানা সংগ্রহ দুই ভাই বোন মিলে যোবেদার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কথা বলেন। এসময় যোবেদার নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়াস স্যার আশ্বস্ত হন। এভাবেই তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্যের চেষ্টায় অনবরত কাজ করে যাচ্ছিলেন। এমন মানবিক মানুষ গিয়াস স্যারের কথা কি বিস্মৃত হওয়া যায়? নিজ বিভাগের শিক্ষক ও সহকর্মী সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। এই শিক্ষক তা শুনেননি। ছাত্র গিয়াসউদ্দিন নিজেও কোন নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করেননি। শেষে দুইজনই স্বাধীনতার বেদীতে শহিদ হিসেবে আত্মদান করলেন।

গিয়াসউদ্দিন আহমদের ভাবি আজিজুন্নেসা খাতুন তাঁর স্মৃতিচারণা করে বলেন, বাচ্চুর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল মানুষের দেখাশোনা করা। কাছের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও বন্ধু-বান্ধব এমনকি অল্প পরিচিত মানুষের জন্য সে সব সময় পরিশ্রম করতে প্রস্তুত ছিল। এজন্য এখনো সবাই তাকে মনে করে, কেউ ভুলতে পারে না। কারো অসুখ হলে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কিনে দেওয়া, পরীক্ষা থাকলে সেখানে পৌঁছে দেওয়া, বই-খাতা কিনে দেওয়া, কাউকে স্টেশনে বা স্টিমার ঘাটে বা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া, বাজার-সদাই করা, কারো কিছু শখ করলে সে শখ সাধ্যমতো পূরণ করা-এসব কিছুর দায়িত্ব যেন আল্লাহ তাকেই দিয়েছিলেন। কোনো মুরব্বি যদি তাকে বিয়ে করতে উপদেশ দিত যে ছেলে-মেয়ে না থাকলে বুড়া হলে কে দেখবে? তখন বাচ্চু হেসে বলত, 'না-নাইয়ার শতেক নাও' অর্থাৎ যার নিজের নৌকা নেই, অন্য সবার নৌকাই তার। (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ৩৬)

শহিদ গিয়াসউদ্দিনের শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল হালিম পক্ষাঘাতের কারণে চলাফেরা করতে পারতেন না, নিজ বাসায় অবস্থান করতেন। অসুস্থ এই শিক্ষকের বাসায় যাওয়া এবং তাঁর খোঁজ খবর নেয়া ছিল গিয়াসউদ্দিনের নিয়মিত সাপ্তাহিক রুটিনভুক্ত কর্ম। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়েও এই দায়িত্ব তিনি সমানভাবে পালন করেছেন। যুদ্ধদিনে অধ্যাপক আবদুল হালিমই অনেকবার তাঁর প্রিয় ছাত্র গিয়াসউদ্দিনের নিরাপত্তা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতেন এবং বারংবার সতর্ক বাণী শোনাতেন। ছাত্র-শিক্ষকের এই সংযোগ এতই গভীর ছিল যে গিয়াসউদ্দিনের শহিদ হওয়ার খবরটি অসুস্থ অধ্যাপক আবদুল হালিমকে কখনও দেয়াই হয়নি। গিয়াস স্যারের কনিষ্ঠ ভগ্নি সাজেদা বানু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক)-এর সমবয়সী আদরের ভাগ্নী রত্না। সে একবার মারাত্মক অসুস্থ হয়। তখন রত্না ও সাজেদা দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, থাকতেন গিয়াসউদ্দিনের সাথেই। রত্নার অসুস্থতার সময়ের কথা জানিয়ে সাজেদা বানু এই প্রবন্ধকারকে বলেন :

> বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কিছুদিন পর রত্নার ভীষণ অসুখ দেখা দেয়। কিছুতেই নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না তার কি অসুখ হয়েছে। প্রচণ্ড জ্বর– সেই সময় দেখেছি কি মমতায় বাচ্চুদা সারারাত জেগে রত্নাকে দেখাশোনা করা, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, পরম মমতায় মাথা ধোয়ানো ও শরীর স্পঞ্জ করানো, এসব কিছুই একা হাতে সামলেছেন। একজন পুরুষ মানুষ, তিনি কি করে এমন সেবা করলেন আমার এখন ভাবতেও অবাক লাগে। বাচ্চুদার অক্লান্ত সেবায় রত্না বেঁচে উঠেছিল (সাক্ষাৎকার : ২০২১)।

প্রকৃত ও ছাত্রবান্ধব শিক্ষকের যে সংজ্ঞায়ন করা হয় গিয়াসউদ্দিন ছিলেন তার জ্বলন্ত নজির। জ্ঞানার্জন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ চিন্তায় তিনি ছিলেন সর্বক্ষণ নিমগ্ন। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

> একজন যথার্থ শিক্ষক শুধু অর্জিত-চর্চিত জ্ঞানের বেসাতি করেন না। তিনি তাঁর পেশার আদর্শে নিজে প্রাণিত এবং শিক্ষার্থীকে প্রাণিত করার সম্মোহনী শক্তি ধারণ করেন। গিয়াস স্যার এমন

> শক্তি ধারণ করতেন বলেই তিনি আমার এমন একজন শিক্ষক যিনি জীবনের চেয়ে বড়, Larger than life. ছাত্রদের জন্য গিয়াসউদ্দিন আহমদ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ছাত্রদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল পিতৃসুলভ। দায়িত্ববোধের প্রতি তিনি ছিলেন সচেতন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ক্লাসে যেমন সম্পর্ক ছিল, ঠিক ক্লাসের বাইরেও ছিল অনুরূপ সম্পর্ক। তিনি প্রতিনিয়ত ছাত্রদের খোঁজখবর রাখতেন। কঠিন বিষয়কে সহজ করার জন্য বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করতেন। ছাত্রদের সুবিধার্থে রেফারেন্স বইয়ের অনেকগুলো কপি বিভাগীয় সেমিনারের জন্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর উদ্যোগ এত বেশি আন্তরিক ছিল যে সবার সুবিধার্থে রেফারেন্সের সঙ্গে তিনি কল নাম্বার পর্যন্ত উল্লেখ করে দিতেন। (মেসবাহ কামাল, ২০২২ : ১৪৮)

বর্তমান বিশ্বে মানুষ আছে অগণিত। কিন্তু শহিদ গিয়াসউদ্দিনের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত ও নিবেদিত প্রাণ মানবিক ব্যক্তিত্ব খুব বিরল। অশুভ শক্তির চক্রান্তের ফলে তাঁকে আমরা অকালেই হারিয়েছি। বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য তিনি আরো অনেক কিছুই করতে পারতেন। এরকম মানবিক শিক্ষক, মহৎ-হৃদয় মানুষ আমাদের আদর্শ। তিনি শহিদ হওয়ার পর তাঁর বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ফরিদা বানু বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়ে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে একটি মামলা দায়ের করেন ১৯৯৭-এ। মামলার নং-১১৫। পরবর্তী সময়ে ২০১১-তে এই মামলার বিচার কাজে জবানবন্দি দিতে গিয়ে গিয়াসউদ্দিনের ছাত্র ও সহকর্মী ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন :

> ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বাসায় পানি নেই। আমি পানির প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে মুহসীন হলের ভিতর অবস্থিত পাম্প হাউজের দিকে যাই। ঐ সময় আরও একজন হাউজ টিউটর জনাব জহুরুল হকও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার কি করা যায়। ইতোমধ্যে গিয়াসউদ্দিন স্যারও পাম্পের নিকট আসেন। স্যারের পরনে লুঙ্গি ও স্টাইপের জামা ছিল। স্যারও বললেন পানিতো নেই, আমরা তিনজনে চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কি না। এমন সময় গিয়াসউদ্দিন স্যার পাম্পের কাছে গিয়ে দেখেন যে, পাম্পের মধ্যে (OFF) লেখা আছে। তিনি হ্যান্ডেল উপরে উঠালে পানির পাম্প চালু হয়ে যায়। তখন সকাল অনুমান ০৭:৩০/৮:০০ টা হবে। পাম্প চালু করতে গিয়ে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় ব্যয় হয়।
>
> পাম্প হাউজে একটি মাত্র দরজা ছিল। আমরা তখন ভিতরেই ছিলাম। এ সময় ছাই রং এর ইউনিফর্ম পরিহিত হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল মুখে সাদা রুমালদ্বারা বাঁধা অবস্থায় অনুমান ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের একজন লোক পাম্প হাউজের ভিতর ঢুকে গিয়াস স্যারের দিকে তাকিয়ে বাংলা এবং ভাঙ্গা উর্দুতে বলে, "হামকো সাথ আয়ে।" আমরা দুজনে হতবাক। স্যার নিজেও অবাক হলেন। লোকটি স্যারের দিকে বন্দুক তাক করে ধরে। তখন স্যার বললেন আমি চললাম, আমার জন্য দোয়া করো।
>
> ... দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর মিরপুর বধ্যভূমি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ফয়জুল

> মহি, ড. আবুল খায়ের, অধ্যাপক রাশিদুল হাসান, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, ড. সিরাজুল হক খাঁন, ড. সন্তোষ ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদের লাশ উদ্ধার করা হয়। গিয়াসউদ্দিন স্যারের স্ট্রাইপ শার্ট দেখে তাঁকে সনাক্ত করা হয়। (জবানবন্দী : ২০১১)

উপর্যুক্ত জবানবন্দি হতে আরো জানা যায় যে, ধরে নিয়ে যাবার আগে গিয়াসউদ্দিন নিজে পানির পাম্পে আসেন কারণ হলে ছাত্ররা পানি না পেয়ে অসুবিধা ও সমস্যায় পতিত হয় (সাক্ষাৎকার : ২০১৯)। আর তা দূরীকরণে তিনি নিজে নেমে আসেন। শেষ সময়েও তিনি যেন ছাত্রদের সমস্যায় আবির্ভূত হলেন সমাধান সূত্র হিসেবে। গিয়াসউদ্দিন আহমদ শহিদ হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে একটি শোক সভা হয়। *দৈনিক বাংলা* পত্রিকা এই শোক সভার খবর প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে লেখে :

> গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় প্রধান ড. মফিজুল্লাহ কবির। সভায় উক্ত বিভাগের শহিদ শিক্ষক ও ছাত্রদের স্মৃতি তর্পণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, হানাদার বাহিনীর হাতে উক্ত বিভাগের তিন শিক্ষক জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ড. আবুল খায়ের ও শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য শহীদ হন (দৈনিক বাংলা : ১৯৭২)।

স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার জন্য গিয়াসউদ্দিন নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন, হলেন শহিদ। তাঁর স্মৃতি রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে শহিদ গিয়াস বৃত্তি চালুর জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। উল্লেখ্য শহিদ গিয়াসউদ্দিন আহমদের ছোট বোন সাজেদা বানু ও বড় ভগ্নিপতি জনাব আবদুল মোমেন খান ২৬ এপ্রিল ১৯৭২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীর কাছে ১৫,০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করে বৃত্তি চালুর অনুরোধ জানান (দৈনিক বাংলা : ১৯৭২)। পরবর্তীতে বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে ১,৫০,০০০ টাকা করা হয়। ইতিহাস বিভাগের সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় "গিয়াসউদ্দিন আহমদ স্মারক বৃত্তি"। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক এলাকার নামকরণ করা হয়েছে "শহিদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ আবাসিক এলাকা।" পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ডাক বিভাগ প্রকাশিত শহিদ শিক্ষকদের ছবি সংবলিত স্মারক ডাকটিকেটে গিয়াসউদ্দিন আহমদের ছবি এবং নাম আছে।

উপসংহার

স্বদেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দরদ ছিল গিয়াসউদ্দিন আহমদের জীবনাদর্শ ও মানবতাবোধের উজ্জ্বলতম দিক। এর বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র জীবনে। মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকায় তিনি যুদ্ধের উত্তাল দিনেও বিশ্ববিদ্যালয়েই থেকে যান। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন হয়তো জানতেন না তাঁর স্বদেশপ্রেম যতই গভীর শোক, জীবনদর্শন যতই মানবতাবাদী হোক না কেন তা পাকিস্তানি বর্বর শাসকুলের দর্শনের পরিপন্থি হবে। তাই পাষণ্ড

ঘাতকরা ভুল করেনি লক্ষ্যবস্তু চিনে নিতে। শিক্ষাগুরু গিয়াসউদ্দিন কত বড় ইতিহাসবিদ ছিলেন জানি না, তবে এটুকু বলতেই পারি তাঁর ইতিহাস চর্চার মূল প্রতিপাদ্য ছিল মানুষ, মানবিক মূল্যবোধ ও মানবতাবাদের বিকাশ। একে তিনি বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর কৃতি ও কর্মের মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তি মানুষ গিয়াসউদ্দিনের দেহের বিলয় হয়েছে সত্যি, তবে তাঁর মহত্তম চিন্তা ও আদর্শের বিলয় হয়নি। বাংলাদেশের প্রগতির পথে, মুক্তির পথে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক, সকল অভিযাত্রার তিনি আলোকবর্তিকা হয়েই থাকবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়জন শিক্ষক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন আহমদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৬৫-এ পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে শাসকগোষ্ঠী রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে গিয়াসউদ্দিন তীব্র প্রতিবাদ জানান। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রভক্ত এই শিক্ষক রোমান হরফে বাংলা লেখার পাকিস্তানি সিদ্ধান্তেরও প্রতিবাদী হন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানেও গিয়াসউদ্দিন সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসহায়দের নানাভাবে সেবাপ্রদানকে তিনি নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিটি শহিদ পরিবারের সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। জীবনের শেষদিন অবধি নিরলসভাবে চালিয়ে যান একাজ। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় গিয়াসউদ্দিন আহমদ তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তার, পেশাজীবী প্রমুখের কাছ থেকে টাকা, শীতের কাপড়, ওষুধপত্র, চাল-ডাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে কবি সুফিয়া কামালের বাসায় নিয়ে আসতেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে যেত। কারণ তাঁদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া সম্ভব ছিল না। এক সঙ্গে বেশি জিনিস নিয়ে যাওয়া সন্দেহের উদ্রেক করবে বলে তিনি অল্প অল্প জিনিস নিয়ে উক্ত বাসায় জমা করতেন। সুফিয়া কামাল তাঁকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করতে বললে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আপা, যে কাজ আমার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, বিপৎসংকুল, সেখানে আমি অন্য আরেক মায়ের ছেলেকে পাঠাই কী করে? আমার বিবেচনায় তা অন্যায় ও স্বার্থপরতা মনে হয়। (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ১৩২)

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে গিয়াসউদ্দিন আহমদের মনোবল ছিল অটুট। সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন স্বদেশভূমির স্বাধীনতা। অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী গিয়াসউদ্দিন প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেন। তাই দেশ এবং স্বাধীনতার বিরোধীরা যখন তাদের নিশ্চিত পরাজয় অত্যাসন্ন বলে বুঝতে পেরেছে, তখনই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একসপ্তাহ আগে থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বহু বুদ্ধিজীবী শহিদ হন। এই শহিদ প্রাণদের একজন গিয়াসউদ্দিন আহমদ। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর আসে। দিনটি পালিত হয় 'বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে। এদিন অন্যান্য শহিদ বুদ্ধিজীবীর সাথে গিয়াসউদ্দিনের নাম ও ছবি প্রকাশিত হয়।

কিন্তু গিয়াসউদ্দিন আহমদকে যথার্থ মূল্যায়নপূর্বক তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোনো প্রয়াস তেমনভাবে দেখা যায় না। আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, শহিদ গিয়াসউদ্দিনের ছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত। তাই নিঃসন্দেহে তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযদ্ধের চেতনা বিনির্মাণে এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ার কাজে দেদীপ্যমান হয়ে থাকবেন।

সহায়কপঞ্জি

বই থেকে

রশীদ হায়দার (১৯৯৪)। *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মিলটন কুমার দেব (২০২১)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হত্যা : একটি পরিকল্পিত নীলনকশা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

অজয় রায় ও অন্যান্য [সম্পা.] ১৯৮৮। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মরণে*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা।

রতনলাল চক্রবর্তী (১৯৯৭)। *৭১ এর শহীদ জীবন*। কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা।

সম্পাদিত বই থেকে প্রবন্ধ

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (২০১৯)। 'স্মৃতি অমলিন : একটি শ্রদ্ধাঞ্জলী'। *আছ নিশিদিন আছ প্রতি ক্ষণে* [সম্পা. আনিসুজ্জামান], সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ২১৪-২১৫।

এ. টি. এম. শামসুল হুদা (২০১৯)। 'গিয়াসউদ্দিন আহমদকে যেমন দেখেছি'। [সম্পা. আনিসুজ্জামান], *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮।

আবদুল মান্নান চৌধুরী (২০১৯)। 'গিয়াস স্যারকে মনে পড়ে'। [সম্পা. আনিসুজ্জামান], *পূর্বোক্ত*। পৃ. ২৪৫-২৪৬।

জাহানার হক (২০১৯)। 'গিয়াসউদ্দিন : নিপীড়িত মানবতার'। [সম্পা. আনিসুজ্জামান], *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।

খালেদা বানু (২০১৯)। 'আমার জীবনের ধ্রুবতারা'। [সম্পা. আনিসুজ্জামান], *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫।

Tahmina Ahemd (২০১৯)। 'Bacchu Kaka-My Ideal'। [সম্পা. আনিসুজ্জামান], *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩০।

গবেষণা পত্রিকা থেকে

মাহমুদুর রহমান (২০১৯)। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা'। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বিশেষ নিবন্ধমালা* [সম্পা. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়], উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৫০-৫১।

সাক্ষাৎকার থেকে

প্রবন্ধকারের সাথে অধ্যাপক সাজেদা বানু-এর *সাক্ষাৎকার*, ২০ ডিসেম্বর ২০২০।

প্রবন্ধকারের সাথে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-এর *সাক্ষাৎকার*, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

জবানবন্দি থেকে

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল, তদন্ত সংস্থা, বাংলাদেশ ঢাকা-এর তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. আতাউর রহমান কর্তৃক লিপিবদ্ধ সাক্ষীদের *জবানবন্দি*, রেজিস্ট্রার ক্রমিক নং ১০, তারিখ ২৫.০৯.২০১১।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে

দৈনিক বাংলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

দৈনিক বাংলা, ২৯ এপ্রিল ১৯৭২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০২, ডিসেম্বর ২০২০ এবং সংখ্যা ১০৩, জুন ২০২১

শিক্ষকাগ্র্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃতানুশীলন

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের এক অনন্য সাধক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। সেসময়ে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা যুক্ত থাকায় মূলত দুটি বিভাগেরই (Department of Sanskritic Studies and Sanskrit & Bengali) প্রধান ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন অগ্রগণ্য শিক্ষক। তাঁর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণাকর্মে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে সম্পাদনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ-এর আবিষ্কার ও সম্পাদনা তাঁর এক অনন্য কীর্তি। বাঙালি কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত সংস্কৃত *রামচরিত* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার ও সম্পাদনাও তাঁর একটি প্রধান কীর্তি। *রামচরিত* বাংলার পালযুগের ইতিহাস অধ্যয়নের একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। বহু দুর্লভ অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় সহজ সরল যৌক্তিকভাবে সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় তিনি এক নতুন ধারার সূচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের কবি বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতিসহ অনেকের সাহিত্য নিয়ে তিনি বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষা-সাহিত্যের গবেষণা ও অনুশীলনে তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃতানুশীলনের কৃতিকে উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে।

সংস্কৃতশাস্ত্রে নিষ্ণাত এক গৌরবান্বিত বংশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ (১৭০৭ -১৮০৬)। তিনি পূর্বপুরুষের বাসভূমি বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলা থেকে কলকাতার নিকটবর্তী নৈহাটিতে বসতি স্থাপন করেন। মাণিক্য তর্কভূষণের সঙ্গে ইংরেজ প্রশাসক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ওয়ারেন হেস্টিংসের (শাসনকাল ১৭৭৪-৮৫) সঙ্গে মাণিক্য তর্কভূষণের পরিচয় ছিল। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বিচারপতি উইলিয়াম

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জোন্স (১৭৪৬-৯৪) মাণিক্য তর্কভূষণকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। অনেক হিন্দু আইনের ব্যাখ্যায় তিনি তর্কভূষণের সাহায্য নিতেন। মাণিক্য তর্কভূষণের ছেলে শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীনাথের পুত্র রামকমল ন্যায়রত্ন (১৮০১-৬১)। রামকমল বিয়ে করেন তাঁর বাবার সহপাঠী রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের কন্যা চন্দ্রমণিকে। রামকমল-চন্দ্রমণির সাত সন্তানের মধ্যে হরপ্রসাদ ছিলেন ষষ্ঠ সন্তান। হরপ্রসাদের পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ উভয়ই জ্ঞানচর্চায় তৎকালীন সমাজে প্রথিতযশা ও অগ্রবর্তী ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছিলেন:

বংশ হইতে আমরা কী পাই ? বীজ পাই। বিদ্যার উপর, সৎকর্মের উপর অনুরাগ– এ সকল বংশ হইতে পাই।কিন্তু সে বীজকে অঙ্কুরিত করে কে ? ফলপুষ্পে শোভিত করে কে ? সে তো নিজের চেষ্টা।[1]

হরপ্রসাদের এ মন্তব্য তাঁর জীবনেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সম্ভ্রান্ত বিদ্বান বংশে তাঁর জন্ম। সেই সাথে তিনি ছিলেন জ্ঞানসাধনায় ব্রতী একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী। তাছাড়া তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুও ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। অল্পবয়সেই হরপ্রসাদ তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতদের স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), প্রাচ্যবিদ্যাবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), বহুভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) প্রমুখ পণ্ডিত হরপ্রসাদের সারস্বত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মাত্র আট বছর বয়সে হরপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে অবস্থিত'অ্যাঙ্গলো বেঙ্গল' স্কুলে ভর্তি করান। তখন হরপ্রসাদের নাম ছিল 'শরৎনাথ ভট্টাচার্য'। কথিত আছে, কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে হর বা শিবের প্রসাদে তাঁর রোগমুক্তি হয়। এরপর তাঁর নাম হয়'হরপ্রসাদ'।

১৮৬২ সালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে নন্দকুমারের অকালমৃত্যু হয়। তখন তাঁদের পরিবার চরম দুর্গতিতে পড়ে। সকলে নৈহাটিতে ফিরে আসেন। এ সময় কিছুদিন হরপ্রসাদ কাঁটালপাড়ার একটি টোলে পড়ালেখা করেছিলেন। এর কিছুদিন পর বালক হরপ্রসাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি হরপ্রসাদকে কলকাতায় নিজের বাড়ির ছাত্রাবাসে নিয়ে আসেন। হরপ্রসাদ তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসটি উঠে গেল। তখন ১৩/১৪ বছরের কিশোর হরপ্রসাদের আশ্রয় হলো বৌবাজারের গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে নিজে রান্না করে খেতে হতো। এমন কষ্টের মধ্যেও তাঁর পরীক্ষার ফল ছিল অসাধারণ। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন এবং কয়েকবার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উচ্চমানের বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম স্থান লাভ করে বিএ পাস করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। এখানে তিনি পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৮-৭৯ পর্যন্ত তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এরপর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহকারী সরকারি অনুবাদক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় তিন বছর নিযুক্ত ছিলেন। এরপর কিছুদিন বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে কাজ করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯০৮ খ্রি তিনি এ পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। এরপর তাঁকে Bureau of information for the benefit of civil officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Sanskritic studies and Sanskrit and Bengali বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯২১ জুন- ১৯২৪ জুন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বৈদগ্ধ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে।এখানে স্বল্প পরিসরে তাঁর পরিবার, বাল্যকাল, শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকতার একটি পরিচয় দেয়া হলো।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাজের ব্যাপ্তি বহু প্রসারিত। তিনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। ভারতবর্ষীয় জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সংস্কৃত সাহিত্য, উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য, বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা, ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা, ইতিহাস, বাংলা লিপি, ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ, জীবনী রচনা, স্মৃতিকথা, উপন্যাস রচনা প্রভৃতি তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। বর্তমান প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত চর্চার দিকটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হরপ্রসাদ তখন সংস্কৃত কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র। এ সময় তিনি 'ভারত মহিলা' নামে প্রবন্ধ রচনা করে মহারাজ হোলকার-প্রদত্ত একটি পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নারীদের অবস্থা নিয়ে অসাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি গবেষণাধর্মী। এতে প্রাচীন সংহিতাসমূহ, স্মৃতিশাস্ত্র, রামায়ণ,মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, কাব্যসমূহে তৎকালীন নারীর সামাজিক অবস্থা, বিবাহপ্রণালী, শিক্ষাব্যবস্থা, ধনাধিকার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের আদর্শ নারীদের জীবনদর্শন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্বতী, ভবভূতির সীতা, বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের চরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, সীতা পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী, পার্বতী, শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান।

> কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি যে-সকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলংকার, সেই-সকল গুণ ইঁহাদের সকলেরই অধিক পরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ে মহার্হরত্ন, ইঁহারা সেই প্রেমের আধারভূমি।[২]

উল্লেখ্য, 'ভারত মহিলা'প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হন। তিনি হরপ্রসাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও সহজ-সরল-লাবণ্যময় গদ্যশৈলীর প্রশংসা করেন। একুশ-বাইশ বছর বয়সী হরপ্রসাদের এই রচনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'এসব কাঁচা সোনা' বলে মন্তব্য করেছিলেন।[৩] পরবর্তী সময়ে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে 'ভারত মহিলা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এর তিনটি সংস্করণ হয়েছিল।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদের *মেঘদূত ব্যাখ্যা* প্রকাশিত হয়। এ বইটি ঠিক মেঘদূতের অনুবাদ নয়; আবার সংস্কৃত ঐতিহ্যের টীকাও নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি ও ভিন্ন আঙ্গিকে তিনি *মেঘদূত ব্যাখ্যা* লিখেছিলেন। বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে অতি সূক্ষ্মভাবে তিনি কাব্যের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কবি কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্যের ভুবনে প্রবেশের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। প্রত্নবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বে পারদর্শী হয়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন ভারতবর্ষ। তিনি যেন মেঘদূতের মেঘ হয়ে... মেঘের যাত্রাপথের নিশানা বেয়ে পায়ে হেঁটে অঞ্চলগুলির দৃশ্যরূপ, জনপদগুলির পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে *মেঘদূত ব্যাখ্যা* বইয়ের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন :

> এই সৌন্দর্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি অনেক দিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেইজন্যই সকলের ছোটো যে মেঘদূত তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য। উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে।[৪]

মেঘদূতের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ (খ্রি. চতুর্দশ শতক)। তিনি পূর্বমেঘের ১৪ নং শ্লোকে 'নিচুল' ও 'দিঙ্‌নাগ' এই শব্দদুটিকে ব্যক্তির নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৫] কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখানে উপলব্ধি করেছেন কবি কালিদাসের সৌন্দর্যতত্ত্বের দিকটি। কবি কালিদাসের কল্পবিশ্বলোককে তিনি নিজের মননে বোধের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন এভাবে :

> এ স্থানের বেতগাছ দেখিতে বড়ো সুন্দর। তুমি এখান হইতে উত্তরমুখে আকাশে উঠ গিয়া। দিঙ্‌নাগেরা তোমার গায়ে শুঁড় বুলাইতে আসিলে, সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে। মল্লিনাথ এইখানে নিচুল ও দিঙ্‌নাগ নামে দুইজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিচুল কালিদাসের

> পক্ষপাতী এবং দিঙ্‌নাগ অতিবিরোধী। তাঁহার মতে উভয়েই কালিদাসের সমকালীন, তাই তিনি নিচুল বেতগাছকে নিচুল কবি, আর দিঙ্‌নাগকে দিঙ্‌নাগ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লোকে কালিদাসকে দিঙ্‌নাগ নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সমকালীন ও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসী দিঙ্‌নাগের বাড়ি কাঞ্চী, মেঘ উড়িতেছে রামগিরি হইতে। রামগিরি সরগুজার অন্তর্গত রামগড়, সুতরাং কাঞ্চীর দিঙ্‌নাগ মেঘের গায়ে শুঁড় বুলাইবে কিরূপে ? কাঞ্চী রামগড় হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে। এ দিঙ্‌নাগসমূহের সঙ্গে সে দিঙ্‌নাগের কোনো সম্পর্ক আছে বোধ হয় না। আর যদিই হয়, এ দিঙ্‌নাগ ও বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ এক ব্যক্তি, ইহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ।[৬]

হরপ্রসাদ মেঘদূতের যে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব শৈলী। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনাশৈলী আলোচনা করতে গেলেই তাঁর নন্দনতত্ত্ববোধের অবস্থানের কথা বার বার ফিরে আসবে। *মেঘদূত ব্যাখ্যা* গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি নিজের লেখনীশৈলী সম্পর্কে বলেছেন :

> সংস্কৃত কাব্যের বাংলা ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলঙ্কার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা নূতন। সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন।[৭]

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কাব্যবিচারের প্রথা ভেঙে তিনি কবিতার সৌন্দর্যকে সহজ গদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। যার ফলে সংস্কৃত জ্ঞান না-থাকা ব্যক্তিও কালিদাসের কবিতা উপভোগ করতে পারবেন হরপ্রসাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। কালিদাস কীভাবে সকল জড়পদার্থের মাঝে চৈতন্যসত্তা আরোপ করেছেন, তার অসাধারণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় হরপ্রসাদের *মেঘদূত ব্যাখ্যা* গ্রন্থে :

> পূর্বমেঘে সমস্ত জড় পদার্থই চৈতন্যময়। মেঘ চেতন, রামগিরি চেতন, অম্রকূট চেতন, নর্মদা চেতন, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধবতী সবই চেতন। নদীগুলি বিশেষ চৈতন্যময়, প্রেমময়, প্রেমোন্মাদময়। কালিদাস প্রতি কথায় তাহাদের চৈতন্য, বুদ্ধি ও হৃদয় দেখাইয়াছেন; তাহারা সকলেই মেঘের প্রেমে আকুল। প্রেমে আকুল হইলে মানুষে যাহা করিয়া থাকে – তাহারা সে সকলই করিতেছে; আমরা আর তাহাদিগকে জড় বলিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। এইরূপে কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া অলকা পর্যন্ত সমস্ত জড়জগৎকে চৈতন্যময় করিয়াছেন; যেন এই সমস্ত স্থানের নদনদী, পর্বত, কন্দর, ভূচর, খেচর, জলচর, এমন-কী পুঁটিমাছটি পর্যন্ত যক্ষের দুঃখে দুঃখী, যক্ষের বিরহে কাতর। যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকায় যাইতেছে; সকলে মিলিয়া মেঘকে খুশি করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ শিখরে স্থান দিতেছে; কেহ অট্টালিকার অগ্রদেশে ধারণ করিতেছে; কেহ জল দিয়া উহার দেহে বল জন্মাইয়া দিতেছে। কেহ-বা জল বাহির করিয়া উহার গতিলাঘব সম্পাদন করিতেছে। সমস্ত জড়জগতে যেন কেমন একটা একপ্রাণতা জন্মিয়া গিয়াছে। মেঘটি যক্ষের প্রাণ – মেঘ যাইতেছে, আমরা যেন দেখিতেছি যক্ষের প্রাণই ছুটিতেছে; আর যাহা কিছু দেখিতেছে আপনার উপযোগী করিয়া – আপনার

> করিয়া লইতেছে; আপনার প্রাণের সহিত– প্রেমময় আবেশময় ভাবের সহিত মাখিয়া লইতেছে। তাই জড়ের এত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে।[৮]

*মেঘদূত ব্যাখ্যা*নামের অসাধারণ এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের সকলে কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করেননি; বরং বিরোধিতা করেছেন। সমকালীন সাহিত্য জগতের বিখ্যাত কয়েকজন *মেঘদূত ব্যাখ্যা*কে একটি অশ্লীল গ্রন্থ বলে প্রচার করতে থাকেন। এ সময় হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এতটাই বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় যে তিনি শেষ পর্যন্ত মনের দুঃখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একান্ত অনুরোধে তিনি আবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ নিয়েও এ সময় কৈফয়ত দাবি করেন। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জীবনীকার গণপতি সরকার লিখেছেন:

> এই বই লইয়া তাঁহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা রাজসরকারে প্রচার করেন যে, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল অশ্লীল পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে সরকার বাহাদুর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের মত গ্রহণ করেন। তাঁহারা ইহা 'অশ্লীলতার অমার্জনীয় দোষে দুষ্ট' বলিয়া মত দিয়াছিলেন। তাহাতে হরপ্রসাদের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। অবশ্য তিনি যে কৈফিয়ৎ দেন তাহাতে সকল গোলযোগ কাটিয়া যায়। ... তখন হরপ্রসাদ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিন্তু পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যেরা ঐ পুস্তকের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা লইয়া তাঁহার বিপক্ষে যাওয়ায়, তিনি পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি কোন সভায় টাকীর মুন্সী জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে পরিষদে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 'আমি খেউড় গাই আমি কি আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসার জুগ্‌গি'। যাহা হউক শেষে পরিষদের একনিষ্ঠ কল্যাণকামী সেবক স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একান্ত অনুরোধে, তাঁহাকে পরিষদে ফিরিয়া আসিতে হয়। [৯]

হরপ্রসাদ মেঘদূতের শিল্পরূপ ও এর রস উপলব্ধি করেছিলেন নান্দনিক চিত্তে। সংস্কতের পণ্ডিত হয়েও তিনি সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সহজ বাংলায় মেঘদূতের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। এ যে তাঁর বিশাল কাজ। মহাকবি কালিদাসের কাব্যসৌন্দর্যকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সকলের মাঝে। ভেবে কষ্ট লাগে, এই গ্রন্থটি রচনার জন্য তাঁকে যথেষ্ট অপমানিত হতে হয়েছে। তবে এই গ্রন্থটিকে পরবর্তী সময়ে অনেকেই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গ-ভাষার লেখক* বইতে *মেঘদূত ব্যাখ্যা* সম্পর্কে লিখেছেন :

> ইহা 'মেঘদূতে'- এর শ্লোকের ব্যাখ্যা নহে, – এ গ্রন্থে কালিদাসের প্রিয় ভক্ত, কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, তদীয় অনুপম কাব্য 'মেঘদূত'-এর কবিত্ব সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পড়িয়া দেখিয়াছি,–কালিদাসের কবিতার অনন্ত সৌন্দর্য তাঁহার প্রিয় ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসে মিশিয়া আরও অনুপম হইয়াছে। কালিদাস যেখানে যে প্রকার ভাব

> বিন্যাস করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় সমালোচনী পুস্তিকায়ও ঠিক সেইখানে সেই রূপ ভাবের অভিব্যক্তি করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। এই পুস্তক বঙ্গসাহিত্যের কোহিনুর। যতদিন যাইবে, কালিদাসের আদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও তত আদর বৃদ্ধি হইবে।[১০]

মেঘদূত ব্যাখ্যা নিয়ে হরপ্রসাদকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল, এই ক্ষোভে তিনি বাংলা লেখা ছেড়ে দেন। *নারায়ণ* পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ এসময় তাঁকে লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর অনুরোধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *নারায়ণ* পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২২ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ পর্যন্ত ২৭টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলি লেখা হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করে। প্রবন্ধগুলির নাম উল্লেখ করা হলো: বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত (বৈশাখ, ১৩২২), ইরাবতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২), কালিদাসের মেয়ে দেখানো (ভাদ্র, ১৩২২), সীতার স্বপ্ন (আশ্বিন, ১৩২২), কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা (ফাল্গুন, ১৩২২), পার্বতীর প্রণয় (আষাঢ়, ১৩২৩), উর্বশী-বিদায় (ফাল্গুন, ১৩২৩), বিরহে পাগল (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪), কোমলে কঠোর (আষাঢ়, ১৩২৪), কণ্বের কোমল মূর্তি (শ্রাবণ, ১৩২৪), কণ্বের কঠোর মূর্তি (আশ্বিন, ১৩২৪), শকুন্তলার মা (কার্তিক, ১৩২৪), দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪), দুর্বাসার শাপ (পৌষ, ১৩২৪), শকুন্তলার হিঁদুয়ানি (মাঘ, ১৩২৪), এক এক রাজার তিন তিন রাণী (ফাল্গুন, ১৩২৪), অগ্নিমিত্রের ভাঁড় (বৈশাখ, ১৩২৫), কুমারসম্ভব– সাত না সতেরো সর্গ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫), রঘুবংশের গাঁথুনি (শ্রাবণ, ১৩২৫), রঘুতে নারায়ণ (ভাদ্র, ১৩২৫), রঘু আগে কি কুমার আগে (আশ্বিন, ১৩২৫), অজবিলাপ ও রতিবিলাপ (কার্তিক, ১৩২৫), রঘুকাব্য বড়ো কিসে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৫), রঘুবংশে বাল্যলীলা (পৌষ, ১৩২৫), রামের ছেলেবেলা (ফাল্গুন, ১৩২৫), রঘুবংশে প্রেম (চৈত্র, ১৩২৫), রঘুবংশে প্রেম-বিরহ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)। প্রবন্ধগুলির নামেই বোঝা যায়, কবি কালিদাসের প্রতি হরপ্রসাদের গভীর আকর্ষণ ছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে *নারায়ণ* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ২৭টি প্রবন্ধের মধ্যে ২৬টি কালিদাসের সাহিত্য অবলম্বনে লেখা। তার মধ্যে কালিদাসের *রঘুবংশ* কাব্য অবলম্বনে তিনি ১০টি প্রবন্ধ লিখেছেন। *নারায়ণ* পত্রিকায় লেখার পূর্বে ১২৯০ বঙ্গাব্দে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় তিনি 'রঘুবংশ' নিয়ে প্রথম লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, রঘুবংশ কালিদাসের পরিণত বয়সের লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র এই মত অগ্রাহ্য করেন এবং অনেকটা তাঁর শাসন কর্তৃত্বের ফলে হরপ্রসাদকে এ ধরনের সাহিত্যবিচার থেকে বিরত করেন। 'রঘুবংশের গাঁথুনি' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতের বৈপরীত্য তথা সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন:

> তবে এ কাব্যগুলি সবই পাকা হাতের লেখা, ইহাদের অর্থ অতি গভীর, এবং ইহাতে উপদেশ অতি মধুর ও অতি হিতকর। একজন ব্রাহ্মণের এক কথায় সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আপন স্ত্রীকে লইয়া রাখাল সাজিলেন – এ বড়ো সহজ কথা নয়। বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে দুইবার লিখিবার পর একদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন, "বঙ্গদর্শনে রঘুবংশের কথা তোমার লেখা ?" আমি বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা

> করিলেন,"তুমি কি এইরূপ বরাবর লিখিবে ?" আমি বলিলাম," ইচ্ছা তো আছে।" তিনি তখন বলিলেন," তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?" তিনি তখন গরম হইয়া বলিলেন, "আমি বহুদিন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি যে আমার সব চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না। তুমি কি না বলো, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জান কী ?" দেখিলাম, তিনি বেশ একটু রাগত হইয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, "আপনি যদি রাগ করেন, আমি না-হয় লিখিব না।"[১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের শাসন মেনে নিলেও তিনি তাঁর স্বকীয় মতবাদে অটল ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি আটটি প্রবন্ধে যুক্তিপূর্ণভাবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করেছেন। তিনি খুব সহজ ভাষায় গভীর তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করেছেন কথোপকথনের ভঙ্গিতে। 'পার্বতীর প্রণয়' প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

> এই যে এত বড়ো হিমালয় ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে? এত বড়ো বরের এত বড়ো কনে নহিলে তো সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে। মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দৌঃ আর পৃথিবী দুটিকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে একজোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কখনো কখনো দ্বিবচনে "মেনে" বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচনে মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর, কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই ? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ দিয়েছেন "আত্মানুরূপাং" অর্থাৎ হিমালয়ও যেমন, মেনকাও তেমনি। বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকার বিবাহ, এ যে-কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।[১২]

নৈয়ায়িক টোল বাড়িতে জন্ম হলেও হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে পড়ালেখা করেন। সংস্কৃত কলেজে প্রাচ্যবিদ্যার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন পাঠ্য ছিল। সেই সুবাদে হরপ্রসাদ শেক্সপিয়র, মিলটন, বায়রন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবির সাহিত্য গভীরভাবে পাঠ করেন। প্রাচ্যের ন্যায়শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় দর্শন পড়েছিলেন। সংস্কৃতে বিজ্ঞ হরপ্রসাদ ছাত্রাবস্থায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় 'অর্থনীতি' নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন। মূলত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের সংস্পর্শে তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত। তাঁর ছিল যুক্তিপূর্ণ বিচারশীল মন। ছিল নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ। আধুনিক রুচিসম্মত মনে তিনি পাঠ করেছেন হিন্দুধর্মের নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় তাঁর 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রকাশিত হয়। ঠিক এসময় দয়ানন্দ সরস্বতীর[১৩]'আর্য সমাজ' ভারতবর্ষ জুড়ে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্য সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল বেদকে 'অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের বাণী' বিবেচনা করে হিন্দুধর্মকে কেবল বেদচর্চায় কেন্দ্রীভূত করা। আর্য সমাজ সেসময় উত্তর ভারতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর

যখন বাংলায় আর্য সমাজের আদর্শ প্রচার হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে তরুণ হরপ্রসাদ গবেষণাধর্মী কাব্যিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে লিখলেন 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা'। তিনি প্রচলিত প্রথার বিপরীতে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বেদের ব্যাখ্যা লিখলেন। বেদ সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত মৌলিক অভিমত এবং সংস্কারমুক্ত সাহসী বিচারদৃষ্টির পরিচয় মেলে। তাঁর কাছে বেদ 'ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র।' এই কবিতা গান কীভাবে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হলো এ সম্পর্কে তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন:

> আমাদের এখন দেখানো চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে "সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল," বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কোনো স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি আমি অকবি দুই-জনেই একত্র থাকি একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা বলে জগৎ সংসার কত সুন্দর দেখ আমি অকবি মাটিকে মাটিই দেখি আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ আমরা জানি যে আমাদের দুই-জনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল ? যেমন সর্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল আমরা যাহা পারিনা এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা-সহায় পাইয়াছে। ... ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়, এইরূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তকরূপে পরিগণিত হইল।[১৪]

ভাবলে অবাক হতে হয়, কী অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্ক ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ! প্রচলিত প্রথায় বিশ্বাসী না হয়ে যুক্তির পথ বেয়ে তিনি জ্ঞানের মুক্তি খুঁজেছেন। বিচারশীল মননচর্চায় অগ্রগামী এক নির্ভীক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আর্যসমাজের মৌলবাদী আন্দোলনে বেদের মহিমা প্রচারকালে তিনি লিখলেন এমন যুক্তিপূর্ণ ভাষায় 'বেদের ব্যাখ্যা'। তখন মাত্র ২৪ বছরের তরুণ তিনি। অসীম সাহসিকতা ও মনের আধুনিকতার পরিচয় দিলেন তিনি এমন প্রবন্ধ রচনা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবিদ্যাচর্চায় এমন আধুনিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিহাসের দিক থেকে বিচারে তিনি ঐতিহাসিকও বটে। রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা গ্রন্থের ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন:

> ঋগ্বেদকে কি চক্ষে দেখিব ? বহু পূর্বে বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে (ইংরেজি ১৮৭৭ সালে) বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বেদ ও বেদব্যাখ্যা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে যে আশ্চর্য

> সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় ৮৬ বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার এই প্রবন্ধের মূল্য বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক এমন কি আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের ও ভক্তিভাবের পুষ্পপত্রস্তূপের ভিতর হইতে মানব শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে যে সার্থক চেষ্টা করেন, ইহা তাহারই পর্যায়ের।[১৫]

মূলত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সার্বিক সহায়তায় রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদটি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাইপো মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য[১৬] (১৮৯৩-১৯৮১) বলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের নামে প্রচলিত ঋগ্বেদের অনুবাদ মূলত 'জ্যাঠাবাবুর করা'। উল্লেখ্য, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সংস্করণের (১৮৮৫) ভূমিকায় রমেশচন্দ্র হরপ্রসাদের কাছে ঋণ স্বীকার করে লিখেছিলেন:

> এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য;– তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।[১৭]

হরপ্রসাদ ছিলেন কবি কালিদাসের ভক্ত। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে যতগুলি সমালোচনা প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁর অধিকাংশই তিনি কবি কালিদাসের সাহিত্যকর্মকে অবলম্বন করে লিখেছেন। তাই বলে তিনি কিন্তু কালিদাসের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না। তিনি বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যের সাথে কালিদাসের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের পাশে তিনি কালিদাসকে স্থান দিয়েছেন। আবার তিনি অকুণ্ঠচিত্তে কালিদাসের সীমাবদ্ধতাকে, অপূর্ণতাকে তুলে ধরেছেন তাঁর যুক্তিপূর্ণ বিচারশীল লেখনীর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, তাঁর 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' নামক প্রবন্ধটি। বঙ্গদর্শনপত্রিকায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, এটি কালিদাস বিষয়ে হরপ্রসাদের প্রথম লেখা। এ প্রবন্ধে তিনি মূলত কালিদাস ও শেক্সপিয়রের সাহিত্যের মধ্যে অসাধারণ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। হরপ্রসাদের মতে, কালিদাসের কল্পনাশক্তি অসাধারণ, বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ তাঁর মেঘদূত, রঘুবংশ কাব্য। কবি কালিদাসের দৃষ্টি যেন চিত্রকরের মতো, তাঁর লেখনীর স্পর্শে জগৎকে তিনি চিত্ররূপময় করে তুলেছেন। নৈসর্গিক বর্ণনায় শেক্সপিয়রও কম পারদর্শী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেন:

> অতি নৈসর্গিক পদার্থ সৃষ্টিতে সেক্ষপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাঁহার বড়োই ওস্তাদি। সৌন্দর্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা সেখানে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য জন্মে যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে

> ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়োই বাহাদুরি। ... কালিদাসের আর এক মূর্তি আছে, সে মূর্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহও নাই। ... সেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, তিনি বাহ্যজগৎ বড়ো গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্বতোমুখী প্রভুতা।[১৮]

হরপ্রসাদের মতে, নাটক রচনায় কালিদাস অপেক্ষা শেক্সপিয়র অনেক বেশি দক্ষ। শেক্সপিয়র তাঁর নাটকগুলিতে মানবমনের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপচিত্রণে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আর কালিদাস তাঁর নাটক অপেক্ষা মহাকাব্যে মানবহৃদয় অঙ্কনে অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ বলেন:

> নাটকে কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্র বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্যহৃদয়ের উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তা-প্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি সেক্ষপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ।[১৯]

কালিদাসের সীমাবদ্ধতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরলেও হরপ্রসাদ কালিদাসের কবিতার প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে কালিদাসের সৃষ্টি আলোকময়ী দুর্লভা তিলোত্তমা:

> আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন– বাল্মীকি উর্বশী হইতে পারেন, হোমার রম্ভা হইতে পারেন কিন্তু কালিদাস সল্লোক দুর্লভা তিলোত্তমা।[২০]

এই প্রবন্ধের শেষে হরপ্রসাদ *হর্ষচরিত*-এর কবি বাণভট্টের মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন জনমে জনমে তিনি যেন কবি কালিদাসের কবিতা পড়ার সুযোগ পান।[২১]

হরপ্রসাদের কাছে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান। ভবভূতিকে নিয়ে তিনি প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত' এই শিরোনামে। প্রবন্ধটি ১৩২২ বঙ্গাব্দের *নারায়ণ* পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ভবভূতি' শিরোনামে তাঁর দ্বিতীয় লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায়। উল্লেখ্য, তখন হরপ্রসাদ বেঁচে ছিলেন না। কালিদাসের সাহিত্যপাঠের মতো ভবভূতির সাহিত্য তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে, ভবভূতি পাণ্ডিত্যের চেয়ে কবিত্বশক্তিকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ পড়ে তিনি তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই 'তাঁর মতামতের' বিপক্ষে নিজস্ব মতামত যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র রামচন্দ্রকে 'কাপুরুষ' বলায় হরপ্রসাদ গভীরভাবে রামচন্দ্রকে উপলব্ধি করে ভবভূতির রামচরিত্র নিয়ে এভাবে মন্তব্য করেছেন:

> বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রাম কাপুরুষ, কিন্তু সীতা বিসর্জন মীমাংসায় উপনীত হইতে তো তাঁহার এক মিনিটও দেরি হইল না। লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি আত্মবলি দিলেন, তাহার উপর দুফোঁটা চোখের জল পড়িল বলিয়া তাঁকে কাপুরুষ বলিব ? বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, আর যে বলিতে হয় বলুক আমি তো পারিব না। আমি তো দেখি এ রাম রামায়ণ-এর রামের অপেক্ষা, প্রেমেও বড়ো, বিরহেও বড়ো, বীরত্বেও বড়ো। তবে মানুষ তো ? রক্ত মাংসের শরীর তো ? এ অবস্থায় নির্জনে বিশেষ সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ কিছুতেই পরিহার করা যায় না।[২২]

বঙ্কিমের 'উত্তরচরিত' পড়ে হরপ্রসাদ বেশ সাহস করেই মন্তব্য করেছিলেন, কালিদাসের কাছে ভবভূতি কোথায় ঋণী আছেন, বঙ্কিমবাবু তা ধরতে পারেননি। ভবভূতি ভাসের কাছেও ঋণী, এমন মন্তব্য করেছেন হরপ্রসাদ।[২৩]

কবি ভবভূতির প্রতি হরপ্রসাদের ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। ভবভূতির বংশগৌরব, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞতা, কবিত্বশক্তি, লোকহিতকর কার্যের প্রশংসা করেছেন হরপ্রসাদ। তাঁর মতে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের আদর্শ হতে গেলে যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, তা ভবভূতির ছিল। ভবভূতি তাঁর কাছে 'অনুকরণীয়' আদর্শ। অধিকাংশ সমালোচকের কাছে কালিদাসের নাটকে শিল্পকৌশল অনেক আকর্ষণীয়। কিন্তু ভবভূতির নাটকে রয়েছে শিল্পকৌশলের অভাব। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ বলেন:

> অনেকে বলেন, শিল্পকৌশল কালিদাসের শকুন্তলায় যেমন পরিস্ফুট, উত্তরচরিতে তেমন নাই। উহাতে শিল্প- কৌশলের বড়ো অভাব। আমরা বলি, কৌশলের অভাব নাই, আমাদের দৃষ্টিতে অভাব। সে কৌশল বড়ো চাপা। কিন্তু কৌশল সর্বত্র বর্তমান। এমন একটি উক্তি-প্রত্যুক্তি নাই –যাহাতে উদ্দেশ্য নাই, যাহাতে কৌশল নাই।[২৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সময়ে বাংলায় যে সকল পত্রিকা সাহিত্যালোচনা নিয়ে ব্যাপৃত ছিল, সেগুলোর অধিকাংশ পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। *বঙ্গদর্শন*, *নারায়ণ*, *মাসিক বসুমতী*, *পঞ্চপুষ্প*, *প্রবাসী*, *সুবর্ণবণিকসমাচার*, *সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা*, *প্রাচী* প্রভৃতি সাহিত্যসেবী পত্রিকায় তিনি নিরলসভাবে বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হরপ্রসাদ ছিলেন কালিদাসভক্ত; কালিদাসের সাহিত্য নিয়ে তিনি অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের নানা কবির কাব্য, নাট্যশাস্ত্র, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহজ-সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে। তাঁর লেখা 'ধোয়ী কবির পবনদূত' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*,তৃতীয় সংখ্যা-১৩০৫), 'নাট্যকলা' (*মাসিক বসুমতী*, জ্যৈষ্ঠ- ১৩২৯), 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র' (*পঞ্চপুষ্প*, আষাঢ়-১৩৩৬), 'কালিদাসের অভিধান' (*প্রবাসী*, মাঘ-১৩৩৬), 'বাংলা শকুন্তলার জুবিলি' (*সুবর্ণবণিক*সমাচার, জ্যৈষ্ঠ-১৩৪০), ' দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা' (*নারায়ণ*, কার্তিক-১৩২২),

'মহাদেব'(*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৮), 'ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৮) প্রভৃতি প্রবন্ধে হরপ্রসাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিচারশীল ঐতিহাসিকের মনোভাব ও সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের পরিচয় মেলে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃতচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিজের আবিষ্কৃত অনেকগুলি দুর্লভ ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ সম্পাদন করে তা প্রকাশ করা। উল্লেখ্য, হরপ্রসাদ এমএ পাস করার পর পরই ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ; বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি নেপালে প্রাপ্ত পুঁথি নিয়ে যখন মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে বিবরণ লেখায় ব্যস্ত, তখন অসুস্থতার দরুন তরুণ হরপ্রসাদকে সহকারী করেছিলেন। পুঁথির অনুসন্ধান ও তার বিবরণ প্রকাশে রাজেন্দ্রলালের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন হরপ্রসাদ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টার ফল *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (1882)। এছাড়া হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সংস্কৃত পুঁথির সংকলন করেছিলেন। *Descriptive Catalogue* নামে পরিচিত এগুলির ভূমিকায় সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সন্ধান মিলে। হরপ্রসাদের অসাধারণ কীর্তি সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* আবিষ্কার ও তার সম্পাদনা। এটি কেবল সংস্কৃত কাব্য হিসেবে নয়; প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সমাজবীক্ষণে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি। অশ্বঘোষের *সৌন্দরানন্দ* কাব্যটিও তাঁর আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত। এটি বৌদ্ধদর্শন ও ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ। তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম সুভাষিত সংগ্রহের একটি খণ্ডিত পুঁথি নেপাল হতে আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিটির কোনো আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা ছিল না। এজন্য এর সংকলকের নাম জানা যায়নি। হরপ্রসাদ তাঁর অসীম অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আলোকে সিদ্ধান্ত করেন এটি দশম শতাব্দীর সংকলন। এর লিপি বদ্ধাক্ষরের আদিরূপ এবং এর সংকলন স্থান বঙ্গদেশেই হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত এ পুস্তকের নাম দেন *কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়*। উল্লেখ্য, এর বহু বছর পর এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পুঁথির 'কপি' তিব্বত ও নেপাল হতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের অধ্যাপক গোখলে ও ড. কোশাম্বী সম্পূর্ণ গ্রন্থটি *সুভাষিতরত্নকোষ* নামে প্রকাশ করেন (হারবার্ট ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং ৪২, ১৯৫৭)। এই পুঁথির আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা এবং বিষয়বস্তুর আলোকে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, এটি পালরাজ যুগে উত্তরবঙ্গে (বরেন্দ্রভূমি) জগদ্দল মহাবিহারের অধিবাসী 'বিদ্যাকর' নামক পণ্ডিত সংকলন করেছিলেন। অবাক হতে হয়, বহুপূর্বে স্বল্প প্রমাণ পেয়েও হরপ্রসাদ তাঁর সহজাত প্রতিভা বলে যে মত প্রকাশ করেন, পরবর্তী কালে তিনজন বিজ্ঞ সম্পাদক অধ্যাপক গোখলে, ড. কোশাম্বী ও মার্কিন অধ্যাপক ড. ইঙ্গালসএ মতকে সমর্থন করেন। স্মর্তব্য, পৃথিবীর খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদের অনেকেই হরপ্রসাদের সাহায্য নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপীয় খ্যাতনামা কয়েকজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে প্রায় ৭০টি পত্র লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পুঁসা, ফিদর, ইপ্পোলিতোভিচ শেরবাটস্কোই,

হারমান গেয়র্গ য়াকোবি, সিলভ্যাঁ লেভি, স্টেন কোনো, জর্জ আব্রহাম গ্রিয়ারসন, আর্থার অ্যান্থনি ম্যাকডোনেল, ফ্রেডারিক উইলিয়াম টমাস প্রমুখ । এঁদের প্রত্যেকের চিঠির ভাষা অনুনয়ে পূর্ণ। সংস্কৃতবিদ্যা গবেষণায় এঁরা হরপ্রসাদের কাছে নানা তথ্য-উপাত্ত চেয়েছেন, কখনও বা নিজেদের মতামতের তথ্য যাচাই করতে চেয়েছেন, কখনও বা অনুমোদন চেয়েছেন। প্রশ্ন হলো, হরপ্রসাদের কাছে এমন খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা কেন এত অনুনয় করেছেন ? এর একটিই কারণ, হরপ্রসাদ ছিলেন প্রাচীন পুঁথিবিদ্যায় অসাধারণজ্ঞানের অধিকারী। প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় তাঁর ছিল অপরিসীম কৌতূহল ও দীর্ঘ গবেষণালব্ধ জ্ঞান। এ কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তের প্রাচ্যবিদ্যার গবেষকেরা হরপ্রসাদের সাহায্য নিয়েই গবেষণা করেছেন।

সংস্কৃতবিদ্যাচর্চায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছিল গভীর অনুরাগ; ছিল তাঁর বংশগত অধিকার । এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ইন্ডিয়ান ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে :

> I am a Sanskritist by heredity training and profession, and I feel an instinctive love for everything connected with Sanskrit, including Indology.[২৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে, শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃতবিদ্যায় বংশগত অধিকার নিয়ে তাঁর এই গৌরববোধ তাই যথার্থ। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মতো একজন প্রদীপ্ত, সপ্রতিভ, অধ্যবসায়ী, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড,২০০০, পৃ. ৮৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ৫২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

৩. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) হরপ্রসাদকে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে: "... এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।' অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন,"কী কাজ?"রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন," বাংলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা তো নিশ্চয়ই নদনদী

পর্বত কন্দর লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম," আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্বত কন্দর' আছে", বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষককে জানিয়াই আমার ঐরূপভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন,"নন্দের ভাই বাংলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ি গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

... আমি আর-একদিন তাঁহার কাছে বাকি অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"এগুলি চলিবে কি ?"তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন," যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা।" বলিতে কী, সেদিন আমি ভারি খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০০৬)। *হরপ্রসাদশাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৬, পৃ.১৮-১৯ । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

৪. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬,পৃ. ৭৪-৭৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

৫. "অত্রেদমপ্যর্থান্তরং ধ্বনয়তি – রসিকো নিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ...॥ দিঙ্নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য ...॥" *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ.১৩২।

৬. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ৮৬-৮৭। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

৭. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ.৭৬। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

৮. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ১০২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলিকাতা।

৯. গণপতি সরকার, *হরপ্রসাদ জীবনী*, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০-৩১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।

১০. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গভাষার লেখক*, প্রথম খণ্ড ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৭৫, বঙ্গবাসী ইলেকট্রেমেসিন যন্ত্রে শ্রীযুক্ত নুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা।

১১. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ৪১০-৪১১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

১২. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ২৭৮-২৭৯। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

১৩. ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতে হিন্দু সমাজের আমূল সংস্কার আন্দোলনে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩)। জন্ম : পশ্চিম ভারতে কাথিয়াওয়াড়-এর মোরভি শহরে এক ধনী পরিবারে। পিতৃদত্ত নাম শংকর। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় দয়ানন্দ সরস্বতী। ইংরেজি শিক্ষা না পেয়েও তাঁর মনে হিন্দু সমাজের অজস্র কুসংস্কার সম্পর্কে ঘৃণা জন্মে। তিনি বহু দেব-দেবীর পূজায় অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বেদ অপৌরুষেয়। বেদের মধ্যে সকল জ্ঞান নিহিত আছে। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী বেদের তাৎপর্যের উপরে সর্বসংস্কারমুক্ত এক নবীন হিন্দুসমাজ গড়ে তোলার আদর্শে তিনি ১৮৭৫ খ্রি. বোম্বাইতে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ খ্রি. আর্যসমাজের মৌলিক ভাবনামন্ত্র সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়। আর্যসমাজের ছিল দশটি মৌলিক নীতি। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চতুর্বেদই সকল জ্ঞানের আকর হিসেবে মান্য করা। ঈশ্বর সকল জ্ঞানের আকর এবং বেদ ঈশ্বর প্রেরিত পবিত্র বাণী। দয়ানন্দ-রচিত গ্রন্থের নাম 'সত্যার্থপ্রকাশ' (হিন্দি-১৮৭৪ খ্রি. বাংলা অনুবাদ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থে তিনি বেদের ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ বা একাত্মবাদ গ্রহণ করা হয়নি; ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি – তিনটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব মানা হয়েছে। দয়ানন্দের আন্দোলন বিশেষভাবে উত্তর ভারতে ব্যাপক সমাদর ও প্রসার লাভ করে। জাতিভেদপ্রথা না মানা, শুদ্ধীকরণের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতদের আবার হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা এমন কতকগুলি উদারনীতি আর্যসমাজের ছিল। দয়ানন্দ ১৮৭৩-৭৪ খ্রি. কলকাতায় আসেন। ব্রাহ্ম সমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দয়ানন্দ বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আর্যসমাজের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ছিল মতাদর্শের পার্থক্য। তাই সমন্বয় হয়নি।

১৪. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ৫৮০-৫৮১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

১৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, ১৯৬৩, পৃ. ৯।

১৬. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য (১৮৯৩-১৯৮১) প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন।

১৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, ১৯৬৩, পৃ. ৬০।

১৮. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ১৪৪। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

১৯. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ১৪৯। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২০. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ১৫২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২১. বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রারম্ভিক ১৬ নং শ্লোকে কবি প্রার্থনা করেছেন :

কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ
মাহিষং দধি সশর্করংপয়ঃ।
এনমাংসমবলা চ কোমলা
সম্ভবন্তু 'মম' জন্মজন্মনি ॥ (হর্ষচরিত-এ এই উদ্ধৃতিটি পাওয়া যায়নি।)

অর্থাৎ কালিদাসের কবিতা, যৌবন বয়স, মহিষের দধি, দুধে চিনি, হরিণের মাংস, কোমলা অবলা এই কয়টি যেন আমার জনমে জনমে লাভ হয়।

২২. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ২২২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২৩. এই যে সীতা,– অদৃশ্য সীতা– ছায়া সীতা – ভবভূতি ইহা কোথায় পাইলেন? বঙ্কিমবাবু ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাটি বলেন নাই বরং বলিয়াছেন জিনিসটা একটু লম্বা হইয়াছে। ... তবে এ ছায়া-সীতা কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া বুঝিব ? এক উপায়– সেই উপায়– সংস্কৃত সাহিত্য সাগরে ডুব দাও। দেখ ভবভূতি কোথা হইতে এ ছায়া-সীতা আনিয়াছেন, এবার বেশি-দূর যাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়া-সীতার মূল পাওয়া যাইবে। কৌশলী কালিদাস শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুষ্মন্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও তাহার মুখে শ্রোতাদের শকুন্তলার অবস্থা জানাইয়াছেন। সে অপ্সরা বারংবার বলিয়াছে যে শকুন্তলা যদি দুষ্মন্তের এইরূপ অবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রাজা যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখ করিতেন না। ভবভূতি দেখিলেন,বাঃ এত বেশ সাজানোই আছে ! আমি কেন তিরস্করণী-আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। বাস্তবিকও ভবভূতি তাহাই করিয়াছেন। ভাস হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর-একটুকু রসান দিয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টাটা তিনি ভাসের বাসবদত্তা হইতে লইয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ২২৪, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২৪. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত । *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ৫৪২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলিকাতা।

২৫. ১৯২৮ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বয়স ৭৫ বৎসর। ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের মাস তিনেক আগে কলকাতার রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায়। গুরুতর আঘাতে সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যান। এই অসুস্থতার মধ্যেই প্রস্তুত করেন দীর্ঘ অভিভাষণ। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাইপো, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য অভিভাষণটি ডিক্টেশন নিয়েছিলেন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত, একটানা ৮ ঘণ্টা। মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য বলেছেন, কোনো বই-পত্রের সাহায্য না নিয়ে রোগশয্যায় একটানা বলে যাওয়া এই অভিভাষণ লিখে উঠতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেও জেঠাবাবু আদৌ অবসন্ন বোধ করেননি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ,পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬, পৃ. ৬৭১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

গ্রন্থপঞ্জি

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত ও নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত (২০০৭)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা*। স্বাদেশ, কলিকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (২০১৭)। *জীবনের স্মৃতিদীপে*। সূচীপত্র, ঢাকা।

সত্যজিৎ চৌধুরী (১৯৯৯)। *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা*। সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০০০)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত (২০০৬)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ (২০০৭)। *ছদ্মনামের অভিধান*। দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

শিক্ষায়তনে সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চায় নব্য তরঙ্গরূপী নাট্য অভিযাত্রা :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের ইতিহাস ও দর্শন অনুসন্ধান

মো. আশিকুর রহমান লিয়ন*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তির পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চার এক বিশেষ রূপরেখা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব। দুই যুগের এই ঐতিহ্যবাহী নাট্যোৎসব ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলয় তৈরি করেছে। বহু-অক্ষীয় নাট্যরূপসমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন গভীরভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সৃষ্টিশীল অভিযাত্রায়। যে অভিযাত্রাকে 'নব্য তরঙ্গ' নামে আখ্যা দেয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে। শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাযাত্রার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী নব্য তরঙ্গরূপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ-আয়োজিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব'-এর ইতিহাস, ধরন, প্রকৃতি এবং দর্শন অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তির পটভূমিতে শিক্ষায়তনে সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চার ইতিহাস ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনে লক্ষ করা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চা একটি বিশেষ অক্ষরেখায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থে "বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চা" বিষয়ক অধ্যায়ে শাহমান মৈশান বলেন–

> পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগগুলো পঠন ও প্রয়োগের ধারায় বহু-অক্ষীয় নাট্যকলা যেমন অঙ্গীভূত করে, সমন্বয় করে, বিনির্মাণ করে তেমনি পর্যবেক্ষকের ভূমিকাও গ্রহণ করে।

* সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> দেশের বহু-অক্ষীয় নাট্যধারার মধ্যে রাষ্ট্রের ইতিহাস নির্মাণের ধারায় সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নাট্য বিভাগগুলো আবার এক একটি নিজস্ব অক্ষরেখায় পরিণত হয়।[২]

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দেশজ তথা লোকনাট্য, নাগরিক নাট্য, ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, দর্শন, জেন্ডার, শ্রেণি, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক জাতিবৈচিত্র্য ইত্যাদি বহু-অক্ষীয় নাট্যরূপসমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন গভীরভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সৃষ্টিশীল অভিযাত্রায়। বিভাগের পাঠদান ও অনুশীলন প্রক্রিয়ার ধরন ও দর্শন সম্পর্কে এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান উপমহাদেশের বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক, তাত্ত্বিক অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ প্রদত্ত এক বক্তৃতা থেকে জানা যায়,

> অধ্যয়ন ও কর্মের সুদীর্ঘ আবর্তে, ফ্রেইরে যাকে বলেন প্র্যাক্সিস, অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা ও প্রয়োগের চলমান অনুশীলনের ফলে, 'নাট্যকলা' একটি সাবসিডিয়ারি বিষয় হতে, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে 'নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ' হয়ে, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে 'নাট্যকলা বিভাগ' নামে স্বতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশের পর, ২০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে 'থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ' [...সক্রিয়]।[২]

অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ আরো বলেন,

> এই বিভাগ চার বছরের স্নাতক ও এক বছরের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের মাধ্যমে 'থিয়েটার' ও 'পারফরম্যান্স' অধ্যয়নের এক আত্মবাচক হাতিয়ার তুলে দিতে চায় শিক্ষার্থীদের হাতে। পাঠক্রমের মাধ্যমে অভিনয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর এমনভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে পাশ্চাত্যের সাথে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের একটি সেতুবন্ধন ঘটে। এই লক্ষ্য তুলে ধরতে বিভাগ হাইডেগারের ভাষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। হাইডেগার বলেন, 'একটি সেতু বহতা জলধারার স্রোতের পাশে ভূদৃশ্য তীরভূমি একত্রিত করে', এই সেতু 'বহতা জলধারা আকাশমুখী করে, ধনুকের মতন বাঁকা তোরণের নিচে এক মুহূর্তের জন্য ধরে রেখে, আবার পরমুহূর্তেই মুক্ত করে ছেড়ে দেয় তীব্র বেগে ছুটে চলার জন্য'।[৩]

অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদের এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের জ্ঞানচর্চায় প্রাচ্য, পাশ্চাত্য তথা বাংলাদেশের নাট্যিক প্রেক্ষাপটে অভিনয়ের বিবিধ পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে নাট্যশিক্ষার্থীবৃন্দকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাট্যাঙ্গনের পেশাদারী মঞ্চে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রস্তুত ও পারদর্শী করে তোলা হয়।

ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, ওয়াহীদা মল্লিক, ড. ইসরাফিল শাহীন এবং রহমত আলী প্রমুখ জ্যেষ্ঠ শিক্ষকবৃন্দের অবিস্মরণীয় কর্মনিষ্ঠায় এই বিভাগের অদম্য ছুটে চলায় ২০০৬

সালে সূচিত হয় বাংলাদেশের নাট্যচর্চার এক নতুন অভিব্যক্তি– 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের ইতিহাস ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের এই আলোচনায় উচ্চশিক্ষায়তনে সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চার এই বিশেষ দৃষ্টান্তকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্য অভিযাত্রার 'নব্য তরঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি দর্শক শ্রোতার সামনে ৭১ পরবর্তী সময়ে সৃজিত হয়েছিল বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের প্রথম তরঙ্গ। এরপর দীর্ঘ বিরতির পর ২০০৬ সালে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের ধারাবাহিক আয়োজনের মাধ্যমে সেই টিএসসি দর্শকের সম্মুখেই নতুন উদ্যোম ও আলোড়নে সৃজিত হয় নাট্য অভিযাত্রার 'নব্য তরঙ্গ'।

বাংলাদেশের নাট্য-অভিযাত্রায় 'নব্য তরঙ্গ': ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্য অভিযাত্রার প্রারম্ভকালকে (১৯৭২-১৯৭৯) উপমহাদেশের বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক, তাত্ত্বিক অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ 'প্লাবন'[৪] নামে আখ্যা দিয়েছেন। এই সময়টাতে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নানা কার্যক্রম ও অংশগ্রহণে মুক্ত জনতার যে স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়েছিল তার মাঝে সবচেয়ে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল যে ক্ষেত্রটি, তা হয়তো নাটক। ১৯৭২ সাল হতে ৭৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাট্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে 'থিয়েটার', 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়', 'নাট্যচক্র', 'আরণ্যক নাট্যদল', 'ঢাকা থিয়েটার', 'থিয়েটার ৭৩', 'অরিন্দম' উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, এই সময়কালেই বাংলাদেশে গ্রুপথিয়েটার ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শনীর অভ্যাস গড়ে ওঠে। ১৯৭২ হতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নাট্যকর্মে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ যে সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোকপাত করেছেন, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– "মূলত ছাত্রছাত্রী ও কিছু পেশাজীবীদের নিয়ে নাট্যদল গঠনের প্রবণতা"[৫]। এই তরঙ্গ সৃষ্টিকারী নাট্যকর্মীদের বৃহৎ একটি অংশই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া প্রগতিশীল, উদারচিন্তার অধিকারী তরুণ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্য অভিযাত্রার প্রথম তরঙ্গ সূচিত হয়েছিল এই শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়।

নাট্য অভিযাত্রার প্রথম তরঙ্গ ধারণার ধারাবাহিকতায় সৃজিত হয় 'নব্য তরঙ্গ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত নাট্য নির্দেশনা কোর্সের আওতায় প্রযোজিত নাটকসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যশিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান নাট্যকারদের বিভিন্ন আঙ্গিক ও রীতির নাটক তথা দেশজ ও ধ্রুপদী আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করে থাকে। ফলে নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় বৈচিত্র্যময় আবহ তৈরি হয়। সাধারণত টিএসসি'র দর্শকের উপস্থিতিতে

অভিনীত এই নাটকসমূহ প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার হাত বাড়ায়। এরপর ২০০৬ সাল থেকে আরম্ভ হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব।

চিত্র ১ : টিএসসি মিলনায়তনের মঞ্চে *ম্যাকবেথ*, ২০০৬

এরপর থেকে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ বাংলাদেশের নাট্যচর্চার এক পাদপীঠ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ও চত্বরে এই নাট্যোৎসব উদ্‌যাপন করে চলেছে। এই নাট্যোৎসবে বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ নির্দেশিত নাট্য প্রযোজনা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত নাট্য প্রযোজনা প্রদর্শিত হয়। প্রতি বছর পেশাদারী-অপেশাদারী নাট্যকর্মী, শিল্পী-শিক্ষার্থী-শিক্ষক-গবেষক ও সাধারণ নাট্যরসপিপাসু দর্শক ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব'-এর জন্য। এই আগ্রহ ও অপেক্ষার মূল কারণ হলো নাট্য পরিবেশনায় বৈচিত্র্য এবং বহু-অক্ষীয় বিষয় ও রীতির একাডেমিক ও সৃজনশীল উপস্থাপনা। যার ফলে সকল স্তরের দর্শকের সাথে একাডেমিক নাট্যচর্চার একটি সংশ্লেষ ঘটে। বিভিন্ন গবেষক-সমালোচক এবং দেশি-বিদেশি মিডিয়ার পর্যবেক্ষণ মতে, ইতোমধ্যে এই উৎসব নাট্যশিল্পের রস আস্বাদন এবং নাট্য বিষয়ক জ্ঞান আহরণের এক নান্দনিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্র হিসেবে রূপ লাভ করেছে। প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক দর্শকের সমারোহ হয় সাধারণত ৭ থেকে ১২ দিন ব্যাপী

এই নাট্যোৎসবে। প্রতিদিন গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ দর্শক গড়ে ২টি করে নাট্য পরিবেশনা নামমাত্র দর্শনীর বিনিময়ে উপভোগ করে। মূলত বর্তমানে ৫০/- টাকা দর্শনীর বিনিময়ে দর্শক নাটক উপভোগ করছে। যা পূর্বে ছিল ২০/- টাকা। তবে করোনা সংকটে ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের তারিখ বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করতে হয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য নাট্যোৎসবের দর্শনী ছিল ১০০/-, ২০০/-, ৩০০/-। প্রতিবছর এই নাট্যোৎসবে গড়ে ১০ থেকে ২০টি নাট্য প্রযোজনা প্রদর্শিত হয়। দেশ-বিদেশের বরেণ্য শিক্ষক-গবেষক-লেখক-শিল্পী-রাজনীতিক তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ প্রথাগতভাবে এই উৎসবে অতিথির আসন অলংকৃত করেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতির সাংস্কৃতিক পরিসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব এক 'নব্য তরঙ্গ' সৃষ্টি করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে ২০০৬ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই 'নব্য তরঙ্গে'র প্রবাহ সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা উপস্থাপনা করা হবে।

প্রথম উৎসব: জনগণের ক্ষমতায়ন ও সময়ের রাজনৈতিক-নান্দনিক ভাষ্য

২০০৬ সালের, ১০ মার্চ হতে ১৪ মার্চ পর্যন্ত মোট ৫ দিন প্রতিসন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে টিএসসি মিলনায়তনে বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশনায় এবং সৈয়দ শামসুল হক অনূদিত উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের কালজয়ী ট্র্যাজেডি *ম্যাকবেথ* মঞ্চস্থ হয়। একুশ শতকে এসে তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীনের সৃজনশীল নির্দেশনায় শেক্সপীয়ারের ক্ল্যাসিক নাটক *ম্যাকবেথ* কেন প্রযোজিত করেছিল, সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করলে ১ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের দর্শন উন্মোচিত হবে। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান। উৎসবের প্রকাশনা অনুযায়ী জানা যায় যে, বিভাগ মূলত শেক্সপীয়ারের অনবদ্য কাব্যময় ভাষাকে নয় বরং তার ভাবের ধ্রুপদী আবেদনকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে, এই নাট্যে প্রমূর্ত করে তুলতে চেয়েছে। অর্জিত জ্ঞান, তত্ত্ব, তথ্য, দক্ষতা, কৌশল ও কর্মপ্রণালীকে যুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা ও কাজের ঐতিহ্যবাহী ধারাকে প্রবাহমান রাখার উদ্দেশ্যেই এই *ম্যাকবেথ* প্রযোজনা। একুশ শতকের ক্ষমতাচঞ্চল ও রক্তকাতর পৃথিবীর 'ম্যাকবেথ' শীর্ষক ডিসকোর্সটি যেন চার শতাব্দী আগেই সৃষ্টি করে রেখেছেন শেক্সপীয়ার। এ যেন চিরচেনা আমাদের সমকালীন ঘটনা প্রবাহ। *ম্যাকবেথ* প্রযোজনার রূপায়ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ভাষ্যে পাওয়া যায়–

> বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তি-বীক্ষণ গড়ে তোলা। আর ব্যক্তির দেখার ভঙ্গিটি, নিজের ভুবনটি, একান্ত দর্শনটি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইতিহাসবোধ ও ইতিহাস চেতনা এক জরুরি উদ্দীপক। আমরা আমাদের কাজে ইতিহাসের মহাকাব্যিক

বিস্তারের পটভূমিতে ব্যক্তি ও সমষ্টির অবস্থান নির্ণয়ের সূত্রসন্ধান করতে চেয়েছি। কাজের এই ধারায় শেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ*–কে যেমন আমরা টেক্সট হিসেবে গ্রহণ করেছি, তেমনি আমরা আমাদের বর্তমান সময়টাকেও একটা সমান্তরাল টেক্সট হিসেবে বুঝতে চেয়েছি।[৬]

১ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের প্রধান বক্তব্য ছিল– ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিক্ষমতার চর্চা নয়, বরং নেতিবাচক ক্ষমতার নির্মূলের মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। সর্বোপরি, সব মানুষের ক্ষমতায়ন হলেই ক্ষমতার বিনাশ ঘটবে–এভাবেই সূচিত হয় নাট্যযাত্রার 'নব্য তরঙ্গ'।

চিত্র ২ : টিএসসি মিলনায়তনের দর্শক সারিতে অতিথিবৃন্দ

দ্বিতীয় উৎসব: জীবনের বহুরূপ আবিষ্কারের নাট্য-ভুবন

বার্ষিক নাট্যোৎসবের দ্বিতীয় বর্ষে দর্শকের ব্যাপক উৎসাহ ও উপস্থিতি প্রমাণ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক তরঙ্গে প্রবল জোয়ার এসেছে। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও প্রফেসর এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। নাটক আরম্ভের পূর্বে টিএসসি মিলনায়তনের বাইরে অপেক্ষারত বিপুল দর্শকের দীর্ঘ লাইন রোকেয়া হল গেইটকেও ছাড়িয়ে যেত প্রতিদিন। ২০০৭ সালে ১৮ হতে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নন্দিত নাট্যকারগণের

১৩টি নাটক নির্বাচন করা হয়েছিল। যেসকল নাটকসমূহ বিশ্বজনীন ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও বিখ্যাত। বিভাগের নির্দেশনা ব্যবহারিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে ১৩ জন স্নাতক সমাপনী বর্ষের শিক্ষার্থীর নির্দেশনায় এই ১৩টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। উৎসবে উপস্থাপিত প্রযোজনাগুলো তত্ত্বাবধান করেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ। তাঁর সাথে সামগ্রিকভাবে সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেন অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

২য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ প্রযোজনাগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলো :[৭]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
অদিতি আরজু	রচনা: উইলিয়াম শেক্সপিয়র অনুবাদ: কবীর চৌধুরী মুনীর চৌধুরী	ওথেলো
ফারজানা কবির	সুরেন্দ্রা ভার্মা	কয়েদ-ই-হায়াৎ
শাকিলা সুমী	রচনা: ইউজিন ও' নীল অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ডিজায়ার আন্ডার দ্য এলমস্
নাহিদ জাহান	রচনা: ইউজিন আয়োনেস্কো অনুবাদ: সাঈদ আহমদ	দ্য চেয়ার্স
মো: বাবুল আক্তার	নূরুল মোমেন	নেমেসিস
খন্দকার রবিউল আরাফাত	রচনা: স্যামুয়েল বেকেট অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ওয়েটিং ফর গডো
রেহানা হক	রচনা: ইউজিন আয়েনেস্কো অনুবাদ: সাইদুস সাকলায়েন	দ্য লেসন
সুমী কাওছার	রচনা: নিকোলাই কালিয়াদা অনুবাদ: সঞ্জয় ঘোষ দস্তিদার	ব্রাত্য
কোয়েলা শারমীন	রচনা: জ্যঁ রাসিন অনুবাদ: অসিত কুমার	ফেইড্রা
আমিনুল হক শিবলী	রচনা: ফার্নান্দ আরাবল অনুবাদ: আমিনুল হক শিবলী	দ্য টু এক্সিকিশনারস্
মানব সরকার	রচনা: হ্যারল্ড পিন্টার অনুবাদ: মানব সরকার	নো ম্যান্স ল্যান্ড

শান্তনু হালদার	রচনা: জন অসবর্ন অনুবাদ: অশোক দাশগুপ্ত	লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার
শামীম হাসান	রচনা: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরূপ: সাইমন জাকারিয়া	কবি

এই নাট্যোৎসবের দর্শন প্রসঙ্গে বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ইসরাফিল শাহীন বলেন–

> বিভাগীয় নাট্যচর্চার একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও স্নাতক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা সমাপনী পরীক্ষা হিসেবে ১৩টি নাটক প্রযোজিত হচ্ছে এই নাট্যসপ্তাহে। এর মধ্যে দেশীয় ১টি নাটকের পাশাপাশি ফ্রান্সের ৫টি, ভারতের ২টি, ইংল্যান্ডের ৩টি, রাশিয়া ও আমেরিকার ১টি করে নাটক রয়েছে। (...) নাটকগুলোর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু তার কালিক মাত্রাকে অতিক্রম করে বিশ্ববাস্তবতায় ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ও রাজনীতিতে আজও সমসাময়িক। এই অবিচ্ছিন্নতার সূত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য একীভূত হয়েছে।[৮]

অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা প্রকৃতির নাটক, যথা– এলিজাবেথান পিরিয়ডের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, মধ্যবিত্তের জীবন নির্ভর বাস্তববাদী নাটক, জীবনের অর্থহীনতা-শূন্যতা-হতাশা অনুসন্ধানী অ্যাবসার্ডধর্মী নাট্য, ঔচিত্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা বয়ানে প্রাঞ্জল ফরাসি নিউক্লাসিক নাটক এবং সেই সাথে বাংলা অঞ্চলের উপন্যাসে দেশজ নাট্যিক রূপ ইত্যাদি ধারার নাটক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের সমাজ সভ্যতার বাস্তবতায় ব্যক্তি, পরিবার, রাজনীতির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়াদি কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বর্তমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

পৃথিবীর নানা ভাষা ও দেশের নাট্য-উপস্থাপনের মাধ্যমে জীবনের বহুরূপ আবিষ্কারের একটি সমন্বিত প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে।

তৃতীয় উৎসব: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপক

২০০৮ সালের ৮ হতে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় ১১ দিন ব্যাপী টিএসসি মিলনায়তনে বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্দেশিত মোট ১৭টি নাটক উপস্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও প্রফেসর এমিরেটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[৯]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
সুদীপ চক্রবর্তী	দ্বিজেন্দ্র লাল রায়	সাজাহান
সুদীপ চক্রবর্তী	রচনা: ম্যাক্সিম গোর্কি অনুবাদ: তানভীর মোকাম্মেল	দ্য লোয়ার ডেপথ্স (নিচুতলার মানুষ)
এনামুল হক টুটুল	রচনা: ভাচলাভ হাভেল অনুবাদ: সাঈদ আহমদ	প্রোটেস্ট
সাইফুদ্দিন মো. মিনহাজ	রচনা: এডওয়ার্ড এলবি অনুবাদ: কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ্	দ্য জু স্টোরি
সারমিন আক্তার	রচনা: অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ অনুবাদ: কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস	দ্য স্ট্রংগার
মাহফুজা খান	রচনা: আন্তন চেখভ অনুবাদ: সিরাজুর রহমান	দ্য বিয়ার
নুসরাত জাহান	রচনা: জর্জ বার্নার্ড শ অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	হাউ হি লাইড টু হার হাজবেন্ড
মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম ভূঞা	রচনা: ফ্রানজ কাফকা অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	মেটামরফোসিস
বেলায়েত হোসেন	রচনা: জ্যঁ পল সার্ত্রে অনুবাদ: আবদার রশিদ	ম্যান উইদাউট শ্যাডোস
সুবর্ণা হুদা	রামনারায়ণ তর্করত্ন	চক্ষুদান
রাব্বী ইবনে সিদ্দিকী	রচনা: হ্যারল্ড পিন্টার অনুবাদ: শাহমান মৈশান	দ্য রুম
শাহমান মৈশান	শাহমান মৈশান	অশেষকৃত্য
নওশিন লায়লা মুনমুন	রচনা: গিরিশ কারনাড অনুবাদ: স্বপন মজুমদার	নাগমণ্ডল
রাজীব চন্দ্র দাস	সৈয়দ শামসুল হক	ঈর্ষা
রেহমুমা হোসেন	রচনা: স্যামুয়েল বেকেট অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ক্যাটাস্ট্রফি

ফারজানা নিপা	রচনা: পিটার হ্যানকে অনুবাদ: শাশ্বত সিকদার	অফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্স
ড. মো. সাইফুল ইসলাম, সুদীপ চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রক্তকরবী

এই উৎসবে অভিনেতা-অনুবাদক-নির্দেশক-নাট্যকার হিসেবে অংশগ্রহণকারী বিভাগের তৎকালীন শিক্ষার্থী শাহমান মৈশান জানান,

> বাংলাদেশ তখন পরোক্ষভাবে সামরিক শাসনের কবলে ছিল। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও ধনিক শ্রেণী সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিবিস্তারের প্রক্রিয়ায় জাতিগত, শ্রেণীগত ও ধর্মীয় দিক থেকে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপরে আক্রমণে উদ্যত। মানুষের মনে তখন পুনরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। মুনাফাবাদী পরাক্রমশালী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবল বিশ্বায়ন বৈশ্বিক জনজীবনেও অশান্তি ও অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলছে। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যেও মানুষের দুঃখ-বেদনা-লড়াইয়ের ভাষা প্রায় অনুপস্থিত। এই সমুদয় প্রেক্ষাপটের একটি রূপক হয়ে ওঠেছিল আমাদের ওই উৎসব। বাংলা নাটক থেকে রুশ নাটক, ভারতীয় নাটক থেকে ফরাসি নাটক, অনুবাদ থেকে মৌলিক নাটক, বাস্তববাদ থেকে অ্যাবসার্ড ধারা, আধুনিক থেকে উত্তরাধুনিক–বিচিত্র রূপ-রীতি ও বিষয়ের নাটক ওই উৎসবে ওঠে এসেছিল। আমাদের বন্ধুরা, সতীর্থরা, আমরা ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকেরা সবাই মিলে আমাদের দাহকালের দ্রোহ, দুঃখ ও স্বপ্নের স্ফুরণ ঘটাতেই তো চেয়েছিলাম ওই উৎসবে।[১০]

চতুর্থ উৎসব: আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্কের মানবিক রূপায়ণ

'জীবন হোক প্রকাশ মুখোর' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সপ্তাহব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০০৯ সালের ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:৩০টায় টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এই নাট্যোৎসবে ১৭ হতে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত টানা চার দিন বিভাগীয় শিক্ষক আশিকুর রহমান লিয়ন নির্দেশিত ভারতীয় ধ্রুপদী রীতির নাটক *মৃচ্ছকটিক* এবং ২২ ও ২৩ নভেম্বর আহমেদুল কবির নির্দেশিত ইউরোপীয় বাস্তববাদী রীতির নাটক *বুনোহাঁস* টানা দুই দিন মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও উৎসবের মধ্যবর্তী সময়ে ২১ নভেম্বর পাবনা থেকে আগত সমন্বয় থিয়েটার দলের আসাদুজ্জামান দুলাল রচিত ও নির্দেশিত *বাথান* নাট্য প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিচে উল্লেখ করা হলো :[১১]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
আশিকুর রহমান লিয়ন	রচনা: শূদ্রক অনুবাদ: মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য	মৃচ্ছকটিক
আসাদুজ্জামান দুলাল সমন্বয় থিয়েটার (পাবনা)	আসাদুজ্জামান দুলাল	বাথান
আহমেদুল কবির	রচনা: হেনরিক ইবসেন অনুবাদ: খায়রুল আলম সবুজ	বুনোহাঁস

নাট্য অভিযাত্রার এই 'নব্য তরঙ্গে'র ধারা ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তন এবং জাতীয় সংস্কৃতির পেশাদারী বলয়ে এক মুখ্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে। কারণ তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ মনে করেছে যে, নাট্যকলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জ্ঞান শুধু গ্রন্থবাহিত নয়, প্রায়োগিক অনুশীলন ও দর্শক-সম্মুখে উপস্থাপনার মাধ্যমেই নাট্যশিল্প তথা নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা নির্মাণ সম্ভব। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় এই নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হওয়া ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্য *মৃচ্ছকটিক*-এর অভিনেতৃবৃন্দ তাঁদের ক্রিয়া সম্পাদনে স্তানিস্লাভস্কির বাস্তববাদী অভিনয়রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে ধীরে ধীরে ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যের প্রচলিত শৈলীবাদী (স্টাইলাইজেশন) রীতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। এভাবে অভিনেতারা বাস্তববাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের নিরিখে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রভিত্তিক প্রতীকবদ্ধ অভিনয় ধারায় পৌঁছেছিল। আবার ইউরোপীয় বাস্তববাদ রীতির নাটক *বুনোহাঁস*। কিন্তু এই নাট্যে দেখা যায় ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাকে অভিনেতৃবৃন্দ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় প্রতিস্থাপন করে নিজ পরিবার ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের প্রথা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুধাবনে সচেষ্ট হয়েছিল। অপরদিকে আমন্ত্রিত নাটক *বাথান* ছিল প্রকাশ রীতির বিচারে সরল কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচনের বিচারে এই নাট্য প্রযোজনাটি ছিল এই নাট্যোৎসবের বিশেষ দিক। কারণ শুকরের বাথানে মানুষ এবং পশুর সম্পর্ক আর জীবন পাঠের মধ্য দিয়ে এক প্রাকৃতিক-মানবিক পৃথিবী সৃষ্টির ডাক দেয়া হয় এই প্রযোজনায়। এই উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক।

পঞ্চম উৎসব: প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চার মিলন-মোহনা

সৃষ্টি লগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দায়বদ্ধতার মনোভাব পোষণ করে চলেছে। সেই দায়বদ্ধতার পটভূমিতে তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ অংশগ্রহণভিত্তিক এক নব্য নাট্যধারা সূচিত করে নাট্যোৎসব আয়োজনের মাধ্যমে। যার ফলশ্রুতিতে ৫ম কেন্দ্রীয়

বার্ষিক নাট্যোৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের নাট্য প্রযোজনার পাশাপাশি তৎকালীন প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চার প্রতিনিধিত্বশীল দুটি নাটক পরিবেশনের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগকে নাট্যোৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০১০ সালের ৪ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ৮ দিন ব্যাপী ৫ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন এবং তৎকালীন আইটিআই (ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট)-এর সভাপতি রামেন্দু মজুমদার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[১২]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ওয়াহীদা মল্লিক	ভাস	মধ্যমব্যায়োগ
ড. ইসরাফিল শাহীন	রচনা: বার্টল্ট ব্রেখ্‌ট অনুবাদ ও ড্রামাতার্গ: শাহমান মৈশান	সিদ্ধান্ত (দ্য মেজারস্ টেকেন)
মনোজ কুমার প্রামাণিক (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)	জিয়া হায়দার	এলেবেলে
রেজা আরিফ (জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়)	অভিজিৎ সেন	রহু চণ্ডালের হাড়

এই উৎসবের বিশেষ আরও একটি দিক ছিল বিভাগীয় শিক্ষক ওয়াহীদা মল্লিক নির্দেশিত ভাস রচিত ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্য *মধ্যমব্যায়োগ* এবং ড. ইসরফিল শাহীন নির্দেশিত জার্মান নাট্যকার বার্টল্ট ব্রেখ্‌ট-এর *সিদ্ধান্ত* (*দ্য মেজারস্ টেকেন*) নাটক উপস্থাপন। বিষয়, আঙ্গিক, রীতি ও উপস্থাপনার বৈচিত্র্য এবং শিক্ষায়তনের নাট্যপ্রযোজনার অংশগ্রহণের ফলে এই নাট্যোৎসব সাধারণ দর্শক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। নাট্য উপস্থাপনের বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন একদিকে ভারতীয় ধ্রুপদী রীতির নাটকে সংকেতায়িত অভিনয় ধারার মাধ্যমে প্রেম, বিচ্ছেদ, পারিবারিক সম্পর্ক, ক্ষমতার দম্ভ ইত্যাদি চিত্রায়িত হয়, অন্যদিকে ব্রেখট-এর নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাষার প্রকাশ ঘটে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যশিক্ষার পথপ্রদর্শক নাট্যকার জিয়া হায়দার রচিত কমেডি এবং অভিজিৎ সেনের নাটকের মাধ্যমে উঠে আসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট, স্বপ্ন ও পরম্পরাকে আঁকড়ে রেখে বেঁচে থাকার যুদ্ধের গল্প। একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চার এরূপ বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন এই নাট্য অভিযাত্রার 'নব্য তরঙ্গ'কে করেছিল অধিক বেগবান।

ষষ্ঠ উৎসব: নাগরিক ও লোকজ নাট্যের যৌথ সৃজনশীলতায় স্বাধীনতার উল্লাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'স্বাধীনতায় সৃষ্টি সুখের উল্লাস' শ্লোগান নিয়ে জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখ হতে ৩১ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাটমণ্ডল এবং টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০১১-১২।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[১৩]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ড. সাইদুর রহমান লিপন	অধর চাঁদ, ক্ষীতিশ চন্দ্র মৌলিক	কমলা রাণীর সাগরদীঘি
মানিক সরকার ও তার দল মহররমের জারির দল (কুমিল্লা)	মানিক সরকার	হুসেন শহীদ
ড. সোমা মুমতাজ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)	জসীম উদ্‌দীন	নক্সী কাঁথার মাঠ
আলকাপ রঙ্গরস থিয়েটার, তানোর, রাজশাহী		আলকাপ
আব্দুল হালিম প্রামাণিক (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)	রচনা: গাও সিংজিয়ান অনুবাদ: সুজন বড়ুয়া	দি আদার শোর
সৈয়দা ইফাত আরা	রচনা: হ্যারল্ড পিন্টার অনুবাদ: নীলা সাহা, আবদুস সেলিম	এ স্লাইট এইক
মাহ্‌জাবীন ইসলাম	রচনা: উমবার্তো বোচ্চিওনি অনুবাদ: রুবাইয়াৎ আহমেদ	জিনিয়াস অ্যান্ড কালচার
লাবনী আক্তার	লাবনী আক্তার	পরপরে পরের কথা
নুসরাত শারমিন	রচনা: এরিক কাইজার অনুবাদ: আবদুস সেলিম, নীলা সাহা	দ্য উইড ড্রিমস
মো. মেহেদী তানজীর	রচনা: মহাশ্বেতা দেবী নাট্যরূপ: মো. মেহেদী তানজীর	বিছন

সুশান্ত কুমার সরকার	ময়মনসিংহ গীতিকাভুক্ত বাইদ্যানির গান অবলম্বনে	ভানুমতির পালা
খাঁন মো. রফিকুল ইসলাম	রচনা: স্যামুয়েল বেকেট অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ওয়েটিং ফর গডো

প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চার অভিব্যক্তির প্রকাশের তাগিদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ ছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ এই উৎসবে নাটক পরিবেশন করে। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের লোকনাট্যের তথা দেশজ পরিবেশনার শেকড় অনুসন্ধানের তাগিদে এবং নাগরিক নাট্য দর্শকের সাথে লোক পরিবেশনার যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী *আলকাপ* এবং কুমিল্লার *জারি* পরিবেশনার জন্য পেশাদারী দলসমূহকে উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শুধুমাত্র দেশজ রীতির নাট্য পরিবেশনার জন্য আমন্ত্রিত দল নয় বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের বিভাগীয় খণ্ডকালীন শিক্ষক ড. সাইদুর রহমান লিপনের নির্দেশনায় *কমলা রানীর সাগরদীঘি* পালা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশজরীতির নাট্য বিষয়ক পরিবশেনার নৃতাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। এই সকল নাট্য পরিবেশনার সাথে যুক্ত হয় নাট্য নির্দেশনা ব্যবহারিক পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের নির্দেশনায় ৭টি নাটক। এই সকল নাট্য প্রযোজনার মধ্যে নির্দেশক কর্তৃক রচিত মৌলিক নাটক ছাড়াও, উপন্যাসের নাট্যরূপ, দেশজ রীতির নাটক এবং পাশ্চাত্য অঞ্চলের নাটকের উপস্থিতি ছিল। যার ফলে ঢাকার নাগরিক দর্শকবৃন্দ একই নাট্যোৎসবে বৈচিত্র্যময় এই ১৭টি নাট্য প্রযোজনার স্বাদ আস্বাদনের এক বৃহৎ সুযোগ পায়। নাট্য অভিযাত্রার এই বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল দ্যোতনার তরঙ্গের সাক্ষী হতে পেরে বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের অজস্র দর্শকস্রোতা আন্দোলিত হয়েছেন। স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে নাগরিক ও লোকজ সৃজনশীলতার যৌথ উপস্থাপনের মাধ্যমে এই উৎসব যেন হয়ে উঠেছিল উল্লাস প্রকাশের এক অনন্য ভাষা।

সপ্তম উৎসব: সৃষ্টিশীলতার আন্তর্জাতিক দিগন্ত ও নিরীক্ষামূলক শিক্ষার পাটাতন

এই প্রথম জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নাট্য প্রযোজনাকে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে ৭ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব হয়ে ওঠে একটি আন্তর্জাতিক উৎসব। শাহমান মৈশান প্রণীত "পৃথিবীর সীমানা আমাদের সৃজন-দিগন্ত" শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে এই উৎসব ২০১২ সালের ২৩ নভেম্বর হতে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে টিএসসি মিলনায়তনে এই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সৃজনের পথ পরিক্রমার কোনও নির্দিষ্ট সীমানা নেই, সেই অভিব্যক্তি-ই প্রকাশ পায় উৎসব ঘোষণায়। তবে উৎসবের প্রকাশনায় উৎসব কথনে অধ্যাপক ড. আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক বলেন,

> বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাস নির্মাণের ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিকতার একটি মৌল অনুষঙ্গ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত পঠন-পাঠনের ধারায় নাট্যকলা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি গঠনের ক্ষেত্রে আরো দৃঢ় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এমনি ভূমিকার ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্য উৎসব আয়োজনে।[১৪]

অর্থাৎ দেশি বিদেশি বহু আঙ্গিকের জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পেশাদারী ভূমিকা রাখার প্রত্যয় নিয়ে বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। আর এই কাজের জন্য উৎকৃষ্ট একটি প্রেক্ষাপট হলো এই নাট্যোৎসব। উৎসবে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করেন বিভাগীয় শিক্ষক আশিকুর রহমান লিয়ন। বিভিন্ন কারণে এই নাট্যোৎসব অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রথমত, ইতালির মুতামেন্তি থিয়েটার কোম্পানির অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব আক্ষরিক অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবের রূপ লাভ করে। ইতালীয় নাট্য অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন। এছাড়াও, এই নাট্যোৎসবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের আমন্ত্রিত নাট্য প্রযোজনা বিশেষ অলংকার যুক্ত করেছে। এই নাট্যোৎসবে বিভাগীয় শিক্ষক ইসরাফিল শাহীন ও আহমেদুল কবির নির্দেশিত নাটকের পাশাপাশি বরাবরের মতই বিশেষ আকর্ষণস্বরূপ বিভাগীয় স্নাতক সমাপনী সেমিস্টারের শিক্ষার্থী নির্দেশিত ১২টি দেশি-বিদেশি বৈচিত্র্যময় নাটকের উপস্থাপন ঘটেছিল।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[১৫]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ড. আহমেদুল কবির	বুদ্ধদেব বসু	প্রথম পার্থ
ড. ইসরাফিল শাহীন	রচনা: বার্টল্ট ব্রেখ্‌ট অনুবাদ ও ড্রামাতার্গ : শাহমান মৈশান	সিদ্ধান্ত (দ্য মেজারস্ টেকেন),
ইউসুফ হাসান অর্ক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)	রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যরূপ: ইউসুফ হাসান অর্ক	তোতাকাহিনী
শামীম হাসান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)	আলাওল	পদ্মাবতী

জর্জিও জরকু	রচনা: ফেদেরিকো বেরতোজ্জি ও সারা দনজেল্লি	দ্য ব্যান্ডিট'স কুইন
সুমাইয়া বিনতে রায়হান	মুনীর চৌধুরী	মিলিটারী
সঞ্জীব কুমার দে	হ্যারল্ড পিন্টার	ওয়ান ফর দ্য রোড
জিয়াউর রহমান	বাদল সরকার	বাঘ
নাফিসা পারভীন	রচনা: ফ্রাঙ্ক ও'কনর অনুবাদ: আব্দুস সেলিম নাট্যরূপ: নাফিসা পারভীন	মাই ইদিপাস কমপ্লেক্স
সিলভিয়া নওরীন হিমি	আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন	কোকিলারা
ক্যামেলিয়া মৌসুমী খান	ইউজিন আয়োনেস্কো	দ্য লেসন
জর্জিও জরকু	ফেদেরিকো বেরতোজ্জি সারা দনজেল্লি	দ্য ব্যান্ডিট'স কুইন মুতামেন্তি থিয়েটার কোম্পানি ইতালি
শেখ জাহিদ আজিম	রচনা: জর্জ বার্নার্ড শ অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	দ্য ডার্ক লেডি অব দ্য সনেটস
তানভীর নাহিদ খান	রচনা: আলব্যের কামু অনুবাদ: তানভীর নাহিদ খান	দ্য মিসন্ডারস্ট্যান্ডিং
নওরিন সাজ্জাদ	নওরিন সাজ্জাদ	বিবর
মেহেরউন নিসা	রচনা: জন গলসওয়ার্দি অনুবাদ: রুবাইয়াৎ আহ্মেদ	দ্য সান
নাভেদ রহমান	রচনা: হ্যারল্ড পিন্টার অনুবাদ: মাইনুল হাসান	দ্য কেয়ারটেকার
মোঃ মাসুদ রানা	রচনা: দানিয়েল কার্জন অনুবাদ: মাসুদ রানা	গডো অ্যারাইভ্স

বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলাওল, মুনীর চৌধুরী, বাদল সরকার, আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন-এর মতো এই অঞ্চলের নাট্যকারদের নাটকের সাথে বার্টল্ট ব্রেখ্ট, ফেদেরিকো বেরতোজ্জি, হ্যারল্ড পিন্টার, ফ্রাঙ্ক ও'কনর, ইউজিন আয়োনেস্কো, জর্জ বার্নার্ড শ, আলব্যের কামু, জন গলসওয়ার্দি, দানিয়েল কার্জন-এর মতন পাশ্চাত্যের নাট্যকারদের নাটকের উপস্থিতির

ফলে উৎসবের প্রকৃতি হয়ে ওঠে সাহিত্য ও শিল্পগুণে ওজস্বী। উৎসবের প্রতিটি সন্ধ্যায় দর্শকবৃন্দ নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছিলেন । শিল্প উপস্থাপনার পাশাপাশি প্রতিটি পরিবেশনাই ছিল এক একটি নাট্য উপস্থাপনার শিক্ষা বিষয়ক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র। ইতালির মুতামেন্তি থিয়েটার কোম্পানির উপস্থাপিত নাট্য প্রযোজনা ছাড়াও এই উৎসবে আই টি আই, ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের যৌথ আয়োজনে লেকচার ডেমনস্ট্রেশন পরিচালনা করেন জার্মানি থেকে আগত নাট্য-প্রশিক্ষক জুলিয়া লিনডিগ এবং ইতালি থেকে আগত নাট্যশিল্পী সারা দনজেল্লি ও জর্জিও জরকু। এই প্রশিক্ষণ-কর্মশালাগুলো নাট্যোৎসবে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করে। ফলে, শুধু নাট্য উপস্থাপনা দেখবার জন্য নয় বরং নাট্য বিষয়ক শিক্ষা অর্জন এবং নিরীক্ষা, ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, অনুসন্ধান ইত্যাদি কিরূপে শিল্পে প্রযুক্ত হয় তা অনুধাবনের একটি প্রেক্ষাপট হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব।

অষ্টম উৎসব: বিবিধ ভাষার বিবিধ রতন

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজিত এই নাট্যোৎসবের মূল প্রতিপাদ্য নিরূপণ করেছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক শাহমান মৈশান– "আমাদের ভাষা আমাদের বিবিধ রতন"। পৃথিবীর সকল জাতির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা ছিল এই উৎসবের মূল আকাঙ্ক্ষা। ভাষার মাসে উৎসব তাই বাংলাদেশের প্রখ্যাত শহীদ নাট্যকার ও শিক্ষক মুনীর চৌধুরীর নাটক *মানুষ* পরিবেশনের মাধ্যমে ২০১৪ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে টিএসসি মিলনায়তনে আরম্ভ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষার্থী নির্দেশিত মোট ৬টি নাটক উৎসবে মঞ্চস্থ হয়।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[১৬]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
মাহবুবুর রহমান	রচনা: মুনীর চৌধুরী	মানুষ
তাহসীনুর রহমান তালুকদার	রচনা: এডওয়ার্ড এলবি অনুবাদ: কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ	দ্য জু স্টোরি
নুসরাত জাহান	রচনা: ইউজিন ও'নীল অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ইল্
ক্যাথরিন পিউরীফিকেশন	রচনা: ডব্লিউ. বি. ইয়েটস্ অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ক্যাথলীন নি হুলিহান

তারিক ইব্রাহীম সজীব	রচনা: অরিঁ গিওন অনুবাদ: খন্দকার কামাল হোসেন	ফার্স অব দ্য ডেভিল'স ব্রীজ
ইরা আহ্মেদ	রচনা: ইউজিন ও'নীল অনুবাদ: কবীর চৌধুরী	ডিজায়ার আন্ডার দ্য এলম্স

এই নাট্যোৎসবেই নাট্যকলা বিভাগ তার নতুন নাম 'থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ' নিয়ে অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উৎসবে নাট্য প্রযোজনাসমূহের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করেন বিভাগীয় শিক্ষক আশিকুর রহমান লিয়ন। ৮ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব প্রসঙ্গে ড. ইসরাফিল শাহীন বলেন,

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রতি বছর এই নাট্যোৎসব ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী, বহুমুখী, গতিময় ও সমষ্টির ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন সঞ্চার করতে সদা উদ্যমী। [...] এই নাট্যোৎসব এমন একটি সৃজনবলয় তৈরি করবে, যেখান থেকে কুড়িয়ে নিতে পারবো আমাদের শিল্পচেতনার নতুন ঋদ্ধি ও উৎকর্ষ।"[১৭]

অর্থাৎ ইন্টারডিসিপ্লিনারি জ্ঞান ও শিক্ষার গতি প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া এবং তার সাথে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবাহের শিক্ষা ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়। বিভাগের জ্ঞানমুখী শিল্পচর্চায় ইন্টারডিসিপ্লিনারি জ্ঞান ও শিক্ষার গতি-প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবাহের শিক্ষা ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্র সংযুক্তির ফলে বিভাগের এই নতুন নামকরণ। ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বিবেচনায় বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষার নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিস্বরূপ বার্ষিক নাট্যোৎসবে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্বজনীন সৃজনশীলতা।

নবম উৎসব ২০১৪: শিল্প ও জ্ঞানের যৌথ যাত্রা

১৯৯৪ হতে ২০১৪, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ সম্পন্ন করে ২০ বছরের বিদ্যায়তনিক নাট্যচর্চার সৃজনশীল পরিক্রমা। প্রবল উৎসাহ আর নব উদ্যমের আশা জাগানিয়া স্বপ্ন নিয়ে আয়োজিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব। বিভাগীয় শিক্ষক শাহমান মৈশান এই উৎসবকে ধারণায়িত করেন "নাট্যকলার দুই দশক: শিল্প ও জ্ঞানের যৌথ অভিব্যক্তি" শীর্ষক উৎসব শ্লোগান প্রণয়নের মাধ্যমে। অভিনয়শিল্পীর শরীর তথা নাট্যাভিব্যক্তি এবং নাট্যকলা বিষয়ক পদ্ধতিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ও শিল্পের সমন্বিত প্রকাশের ধারায় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অভিযাত্রাকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই উৎসবে এই ভাবনার অবতারণা ঘটে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের ১ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত নাট্যোৎসবে শিক্ষার্থী নির্দেশিত মোট ২০টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসব প্রযোজনা তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগীয়

শিক্ষক ড. আহমেদুল কবির এবং পরিকল্পনা সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করেন বিভাগীয় শিক্ষক আশিকুর রহমান লিয়ন।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[১৮]

নির্দেশনা	**রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা**	**নাটক**
মো. আব্দুল হামিদ	মমতাজউদ্দিন আহমেদ	যামিনীর শেষ সংলাপ
রিয়াদ রহমান	রচনা: রিচ স্মোলেন অনুবাদ: রুবাইয়াৎ আহমেদ	দ্য বক্স
আশরাফুজ্জামান শুভ	রচনা: ইউজিন ও 'নীল অনুবাদ: আশরাফুজ্জামান শুভ	এ ওয়াইফ ফর এ লাইফ
তাহ্‌মিনা ইসলাম	রচনা: ফ্রাঙ্কা রামে অনুবাদ: তন্দ্রা চক্রবর্তী	দ্য রেপ
মীর মোঃ মানজুরুল হক	মনোজ মিত্র	চোখে আঙুল দাদা
মোঃ রিদওয়ানুল কবির নাহিদ	রচনা: অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ অনুবাদ: কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস	দ্য ফাদার
ফাহারিয়া খান	আসাদুজ্জামান দুলাল	ফেরিওয়ালা
মাহাবুবুর রহমান সবুজ	রচনা: আন্তন চেখভ অনুবাদ: সিরাজুর রহমান	প্রতিশোধ
সাহিদা সুলতানা	মুনীর চৌধুরী	দণ্ড
আরিফা সুলতানা তানিন	রচনা: মার্ক টোয়েন অনুবাদ: আব্দুস সেলিম	অ্যাডাম ও ঈভের ডায়েরি
সাবিহা সুলতানা	রচনা: আন্তন চেখভ অনুবাদ: সিরাজুর রহমান	ভালুক
সিফাত-ই-রাব্বী	সৈয়দ শামসুল হক	ঈর্ষা
আবে হায়াত সৈকত	আইয়ান হেগি অনুবাদ: আবে হায়াত সৈকত	কেক
চন্দনা বিশ্বাস	সৈয়দ শামসুল হক	অপেক্ষমাণ

নূর-ই-তানজীম	বুদ্ধদেব বসু	পঁচিশ বছর পরে অথবা আগে
কানিজ ফাতিমা মৌসুমী	বাদল সরকারের নাটকের নব রূপায়ণ	নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র
লাহুল মিয়া	হ্যারল্ড পিন্টার লাহুল মিয়া	দ্য লাভার
ঐশ্বর্য আজাদ শিমুল	রচনা: কলিন ক্যাম্পবেল ক্ল্যামেন্টস অনুবাদ: শাহাদাৎ রুমন	গতকাল
মোঃ শাইখুল কামাল নাহিয়ান	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের জবানবন্দী
অমিত জাহিদি হিমেল	ক্রিস্টোফার মার্লো	ডক্টর ফস্টাস

নাট্যোৎসবের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব বিগত প্রায় এক দশক ধরে আমাদের যাপিত জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ তুলে ধরেছে। এর মধ্যে সংস্কৃতির যে কাজ অর্থাৎ মানুষের মনোভূমির উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও মানবিকতার সপক্ষে এক পরিপূর্ণ বোধের উদ্বোধন, সেটি থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রযোজনাগুলোর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের বহু মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে হয়ে চলেছে।[১৯]

প্রখ্যাত অভিনেতা ও রাজনীতিক আসাদুজ্জামান নূরের বক্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সাংস্কৃতিক জ্ঞানের প্রতি দায়বদ্ধতা, নাট্যিক সাফল্য এবং জনগণের সাথে নাট্যচর্চার যোগসূত্র প্রতিফলিত হয়–যা সে বছরের নাট্যোৎসবের দার্শনিক প্রতিপাদ্যও বটে।

১০ম উৎসব: শিল্পের মুক্ত ভাষা অভিমুখে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০১৫ সালে ডিসেম্বরের ৩ হতে ৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তখন এক ভিন্ন রকম সংকট বিরাজ করছে। ক্ষমতার করাল গ্রাস আর ধর্মীয় উগ্রপন্থী সহিংসতায় টালমাটাল বিশ্ব-সভ্যতা। বিশেষ করে শিয়া মসজিদে ইসলামী জঙ্গী সংগঠন আই এস–এর হামলা এবং প্যারিসে আই এস–এর ভয়াবহ জঙ্গী হামলা উল্লেখযোগ্য। থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিল্প প্রকাশের ভাষাতেও অনিবার্যভাবেই তাই এসেছিল এক ভিন্ন রূপ। শরীর, মন ও চিন্তার সংশ্লেষ হলো

নাট্য। পৃথিবী তথা নিজ ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত লক্ষণীয় ছিল এই ১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের পরিবেশনাগুলোতে। যার দরুন, শাহমান মৈশান প্রণীত 'শিল্পের মুক্ত ভাষা অভিমুখে'–এই শ্লোগানই হয়ে উঠেছিল এই নাট্যোৎসবের দার্শনিক প্রতিপাদ্য। বিভাগীয় শিক্ষক কাজী তামান্না হক সিগমা ও অমিত চৌধুরী-এর উৎসবের মূলভাবনা রূপায়ণকারী নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সেবছরের উৎসবের পর্দা উন্মোচিত হয়েছিল। এই নাট্যোৎসবের প্রযোজনা ও পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করেন বিভাগীয় শিক্ষক ড. আহমেদুল কবির ও আশিকুর রহমান লিয়ন।

নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাগুলোর তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[২০]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
শাহারুল ইসলাম কাজল	রচনা: মার্টিন শেরম্যান অনুবাদ: শাহারুল ইসলাম কাজল	দ্য বেন্ট
সাইমা ফারজানা	পিটার হ্যান্ডকে'র অফেন্ডিং দ্যা অডিয়েন্স দ্বারা অনুপ্রাণিত ইম্প্রোভাইজেশন প্রক্রিয়ায় সৃজিত	কালের যাপনরঙ্গ
নাজমুল হুদা সাকীর	রচনা: উডি এলেন অনুবাদ: কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ্	ডেথ নকস্
কামরুল ইসলাম মারুফ	কামরুল ইসলাম মারুফ	ভস্ম
সাওগাতুল ইসলাম হিমেল	রচনা: সারা কেইন অনুবাদ: নীলা সাহা	৪.৪৮ সাইকোসিস
ইশতিয়াক খান পাঠান	রচনা: সারা কেইন অনুবাদ: আতিকুল ইসলাম	ক্রেভ এন্ড নট ক্রেভ ক্রেভ অবলম্বনে
ধীমান চন্দ্র বর্মন	রচনা: নিকোলাই কালিয়াদা অনুবাদ: সঞ্জয় ঘোষদস্তিদার	ব্রাত্য

উৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী বলেন,

> বাংলাদেশ একটি জটিল ঋতু অতিক্রম করছে। স্বাধীনতার ৪৪ বছরের তীরভূমে দাঁড়িয়ে দেশ আজ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের মুক্তচর্চায় ভীষণভাবে সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট স্থানীয় নয় অবশ্যই, আন্তর্জাতিকও, সন্দেহ নেই। দেশ ও জাতির ভূগোল ও সাংস্কৃ

তিক ঐতিহ্য অস্বীকার করে রক্ষণশীল উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ধর্মকে মুখ্য করে তুলেছে পৃথিবীব্যাপী। মুনাফাকামী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সন্ত্রাসে ত্রস্ত বিশ্ববাস্তবতাকে আরো জটিলতার আবর্তে ফেলেছে। ফলে দৃশ্যে ও অদৃশ্যে সহিংসতা এখন ঘটমান বর্তমান। (...) ঘাতকের উন্মত্ত নাগালের বাইরে আমরা কেউ নই। তবু আমরা লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, ছবি আঁকি, কবিতা উচ্চারণ করি, ভাস্কর্যের প্রান্তর সাজাই।"[২১]

এই উৎসবের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি তথা নাট্যচর্চায় এই নব্য নাট্যতরঙ্গের ধারা ইতোমধ্যে ১০ বছরের পরিক্রমা অতিক্রম করে। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনস্বীকার্যভাবেই যে এই উৎসব একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তার দর্শন প্রকাশ পায় উৎসবের আমন্ত্রিত অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের বক্তব্যে– "দেশজ সংস্কৃতি চর্চার অগ্রণী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এ বিভাগ [থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ] বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব অন্যতম।"[২২]

১১তম উৎসব: নব্য শিল্পরস সৃজন-অভিযাত্রা

২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭:০০টায় টিএসসি মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উদ্বোধন হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ জন শিক্ষার্থী নির্দেশিত ৮টি এবং বিভাগীয় শিক্ষক নির্দেশিত ১টি মিলিয়ে সর্বমোট ৯টি নাটক পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্ত হয়। উৎসবের উদ্বোধনী সন্ধ্যায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর স্বয়ং উপস্থিত থেকে নাটক উপভোগ করেন। এই নাট্য উৎসবের শিক্ষার্থী নির্দেশিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক আশিকুর রহমান লিয়ন এবং সহকারী অধ্যাপক তিতাস জিয়া।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[২৩]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ড. আহমেদুল কবির	সৈয়দ শামসুল হক	বহ্নি বিসর্জন ব-দ্বীপ
সুমাইয়া মনি	সুমাইয়া মনি	অভিনেত্রীর এক সাদা রাত্রি
তন্ময় পাল	রচনা: ফরিদ কামিল অনুবাদ: পরাগ চৌধুরী	জেরা
রনি দাস	রচনা: স্টিফেন বিন অনুবাদ: রনি দাস	শূন্যে একটি ছোট্ট বাক্সো

শংকর কুমার বিশ্বাস	রচনা: ওয়াল্টার ওয়াইকস অনুবাদ: শংকর কুমার বিশ্বাস	একজন চাকুরের জীবনবাস্তবতা
ইসরাত জাহান মৌটুসী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কঙ্কাল
সাখাওয়াত ফাহাদ	রচনা: জুলিয়া লী ডীন অনুবাদ: মীম আরাফাত মানব	প্রতিবিম্ব
আব্দুর রাজ্জাক	টেরি রচি অনুবাদ: আব্দুর রাজ্জাক	শিকড় ও শাখা
শুভ্রা গোস্বামী	বাদল সরকার	সারারাত্তির

এই নাট্যোৎসবে নির্দেশক কর্তৃক রচিত পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাদল সরকার-এর নাটক ছাড়াও বেশ কিছু বিদেশি নাট্যকারের নাটকের সাথে ঢাকাই মঞ্চনাটক দর্শকের সাথে পরিচিতি ঘটে। উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত এই নাট্য অভিযাত্রা সব সময়ই নব্য শিল্পরস অনুসন্ধানে সজাগ হয়ে ওঠেছে। যার ফলে প্রতি বছর দর্শক ও নাট্যকর্মীবৃন্দ এই নাট্যোৎসবে নতুন নতুন অভিব্যক্তির উন্মেষে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এই নাট্যোৎসবে ফরিদ কামিল, স্টিফেন বিন, ওয়াল্টার অয়াইকস, জুলিয়া লী ডীন, টেরি রচি-এর মতো নাট্যকারদের নাটকের সাথে দর্শকবৃন্দের বিশেষ পরিচয় ঘটে। এছাড়াও ১১তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের দুটো কাব্যনাটক নুরুলদীনের সারা জীবন ও পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এবং উপন্যাস নিষিদ্ধ লোবান–ইতিহাসাশ্রয়ী এই তিন বিস্ময়কর সৃষ্টিকর্মের সংশ্লেষে নির্দেশক কর্তৃক সংকলিত নাট্য প্রযোজনা বহ্নি বিসর্জন ব-দ্বীপ দর্শক সম্মুখে প্রদর্শিত হয় যা দর্শককে বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাসের অনুভবে-অভিজ্ঞতায় তুমুলভাবে আলোড়িত করে। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির। এই প্রযোজনার জন্য বিশেষ গীত ও ভাষ্য রচনা এবং আখ্যান সংযোজনা করেন শাহমান মৈশান। সামগ্রিকভাবে, নতুনত্বের স্ফুরণে এই নাট্যোৎসব নব নব শিল্পরসের সৃষ্টিশীল অভিযাত্রার স্মারক হয়ে ওঠে।

১২তম উৎসব: শিল্পের অফুরান সম্ভাবনার উদ্‌যাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০১৭– সে বছরের ১১ হতে ১৮ ডিসেম্বর মোট ৮ দিন ব্যাপী প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা হতে টিএসসি মিলনায়তনে নাট্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় শিক্ষক শাহমান মৈশান নিরূপণ করেন উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য: "আমরা ফুরিয়ে যাই তোমাদের তরে অফুরান হতে"। শিল্প সবসময়ই প্রবাহমান, সীমাহীন আর তাই এর নান্দনিক সম্ভাবনা অফুরান যা কখনো ফুরাবার নয়। আর শিল্পী নিজেকে উৎসর্গ

করে প্রবহমান শিল্প সৃষ্টির তাগিদে। তাই শিল্পীর কাজ, কর্ম, প্রতিভা, দক্ষতা কখন ফুরায় না, নিঃশেষিত হয় না। এভাবেই শিল্পী তার স্বীয় কর্মের মাধ্যমে হয়ে উঠে ধ্রুপদী। এই আত্ম-উৎসর্গের মাঝে আছে প্রেম, আছে দরদ, আছে চিরঞ্জীব হওয়ার আনন্দ। এমনি নান্দনিক এই উৎসব-ভাষ্যটি প্রকারান্তরে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মবলিদানের আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতটিকেও প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। শিল্প ও সংগ্রামের রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক মর্মানুসন্ধানে মেতে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব। প্রখ্যাত অভিনেতা, নির্দেশক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের-কে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয় এই নাট্যোৎসবে। বাংলা নাট্যের এই কিংবদন্তি স্বশরীরে বিভাগীয় সম্মাননা গ্রহণ করেন ও উদ্দীপনা-সঞ্চারী অভিভাষণ প্রদান করেন।

চিত্র ৩ : নাট্যজন সম্মাননা গ্রহণ করছেন আলী জাকের, ২০১৭

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[২৪]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
সাদিয়া মাহবুব সারা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চণ্ডালিকা
মনিরুজ্জামান রিপন	রচনা: সৈয়দ শামসুল হক নাট্যরূপ: মনিরুজ্জামান রিপন	নীল দংশন
রিয়াজ তারেক	রচনা: আহমদ ছফা নাট্যরূপ: রিয়াজ তারেক	মরণবিলাস

মারিয়া খানম মিম	বাদল সরকার	বাঘ
মো. এহসানুল আবেদীন	রচনা: পল হাওয়ার্ড স্যুরিজ অনুবাদ: মীম আরাফাত মানব	উদ্যোক্তা মন
সজীব রানা	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	উজানে মৃত্যু
আব্দুল্লাহ আল জাবির	রচনা: অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ অনুবাদ: মেহের কবীর	মিস জুলি
প্রণব শর্মা	বুদ্ধদেব বসু	বিশ বছর আগে অথবা পরে
এস. এম. লাতিফুল খাবীর	রচনা: ট্রেভর সুথার্স অনুবাদ: এস. এম. লাতিফুল খাবীর	ক্ষরণ
তামান্না ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	শিল্পী
রফিকুল ইসলাম সবুজ	রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যরূপ: রফিকুল ইসলাম সবুজ	ছুটি
মো: আশরাফুল আলম	আব্দুল্লাহ আল-মামুন	মাইকমাস্টার
নাছুমা হক	আব্দুল্লাহ আল-মামুন	তৃতীয় পুরুষ
মো: শামীম মিয়া	রচনা: হ্যারল্ড পিন্টার অনুবাদ: রবিউল আলম	ডাম্ব ওয়েটার
নুসরাত জাহান	সেলিম আল দীন	অলৌকিক রন্ধন প্রণালী
রাগীব নাঈম	রচনা: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নাট্যরূপ: রাগীব নাঈম	তারাবিবির মরদ পোলা
কীর্তি বিজয়া	রচনা: মমতাজউদদীন আহমদ বিনির্মাণ: কীর্তি বিজয়া	কী চাহ শঙ্খচিল

তারুণ্যের সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিতে মুখর এই উৎসবের তত্ত্বাবধান করেন বিভাগের দুই জন শিক্ষক আশিক রহমান লিয়ন এবং শাহমান মৈশান। উৎসবে পরিবেশিত নাট্য প্রযোজনাগুলোর সামগ্রিক মানচিত্র পর্যবেক্ষণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তা হলো, মঞ্চস্থ ১৭টি নাটকের মধ্যে ৪টি বাদে বাকি সবগুলো নাটকই বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের রচিত। এমনকি প্রযোজনার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের শিক্ষণ-প্রণালির আওতায় স্নাতক সমাপনী

শিক্ষার্থী-নির্দেশকবৃন্দ নিজেরা অনুবাদ, রূপান্তর, নাট্যরূপ ও রচনায় ব্রতী হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগন্ধর লেখকদের নাটক এবং গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চায়নের দিকে এই উৎসবের শিল্প-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বাদল সরকার, সৈয়দ শামসুল হক, আহমদ ছফা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিম আল দীন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং মমতাজউদদীন আহমদ প্রমুখের সাহিত্যকর্ম নাট্যরূপায়িত হওয়ায় বিপুল দর্শকের আবহমান সাংস্কৃতিক সত্তায় এই উৎসব সৃষ্টি করেছিল বিশেষ অভিঘাত। মিলনায়তনের কাঠামোবদ্ধ মঞ্চ ছাড়াও টিএসসি'র খোলা প্রান্তরে "স্থানাঙ্কিত" (সাইট-স্পেসিফিক) নাট্যও পরিবেশিত হয়। সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি, সম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস এবং একান্ত ব্যাক্তিক অনুভূতির বিচিত্র রূপ চিত্রিত হয়েছিল এই সকল নাট্য-পরিবেশনায়। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, রীতি এবং উপস্থাপন-শৈলীর নতুনত্ব, বৈচিত্র্য, নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও শিল্প-সাফল্যের নিরিখে এই উৎসব হয়ে ওঠে নব নাট্য অভিযাত্রার এক উত্তুঙ্গ বাঁক।

১৩তম উৎসবঃ জনপরিসর ও জনযোগাযোগের নতুন ধারা

বিষয়, আঙ্গিক ও উপস্থাপন-বৈশিষ্ট্যের বিচারে ১৩তম নাট্যোৎসবটি ছিল সর্বাধিক বৈচিত্র্যে পূর্ণ। ডিসেম্বর মাসের ০৩ হতে ০৮ তারিখ পর্যন্ত, টিএসসি মিলনায়তনে এবং টিএসসি'র বহিঃঅঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০১৮। বৈচিত্র্যময় এই উৎসবে নাটক পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর নাট্যকলা বিভাগকে। এছাড়া বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন ও তানভীর নাহিদ খান-এর নির্দেশনায় দু'টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যোৎসবে বিশিষ্ট নাট্যজন, নির্দেশক, অভিনেতা, নাট্যসমালোচক, লেখক ও সুবক্তা আতাউর রহমানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অমিত চৌধুরী নির্দেশিত আবাহনী পরিবেশনা রায়বেঁশে নৃত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে উৎসব আরম্ভ হয়।

চিত্র ৪ : টিএসসি'র উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রায়বেশে নৃত্য

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[২৫]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ক্যাথরিন পিউরীফিকেশন (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)	রচনা: ক্রিস্টোফার মার্লো অনুবাদ: তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়	ডক্টর ফস্টাস
শামীম হাসান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	ক্যাপ্টেন হুর্‌রা
ড. ইসরাফিল শাহীন	রচনা: উইলিয়াম শেক্সপীয়ার অনুবাদ: সৈয়দ শামসুল হক	ম্যাকবেথ
তানভীর নাহিদ খান	রচনা: ম্যাক্সিম গোর্কি অনুবাদ: তানভীর মোকাম্মেল	দ্য লোয়ার ডেপথ্‌স
কাজী তামান্না হক সিগমা	সংগীত পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: কাজী তামান্না হক সিগমা	মঙ্গলগীত (উৎসব প্রারম্ভে পরিবেশিত গান ভিত্তিক বিশেষ পরিবেশনা)
অমিত চৌধুরী	পরিকল্পনা: অমিত চৌধুরী	রায়বেঁশে

নাহিদা ইসলাম	নির্দেশকদের ধারণায়ন ও মহড়া কক্ষে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া নির্মিত এই নাট্য প্রযোজনাগুলো টিএসসির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জনসম্পৃক্তকরণের প্রক্রিয়া উপস্থাপিত হয়	মাই মাস্টারপিস
মোঃ আল আমিন হাবিব		সুইসাইড নোট
মোঃ তানভীর হাসান সৈকত		নিভু নিভু শুকতারা
কামরুন্নাহার মুন্নী		গণঘরের কেচ্ছা : কক্ষ নং ২৪৩
উম্মে হাবিবা		কায়া ক্যানভাস
নুসরাত রহমান		ধুলোর দিন পেরিয়ে
দিগার মোঃ কৌশিক		নির্জন গোধূলির নাচ
অনিতা ঘোষ দীপা		ললিতা কিংবা মানুষ
দেবলীনা ব্যানার্জী		ইচ্ছের এপিটাফ
আজহার উদ্দিন রাসেল		ক্যান্টিন ভাই
জুলযাবাদাইন সাদমান		সবুজ রক্তের ফোঁটা
রাসেল মিয়া		ওরা চলে যায়
বি. এম. জবল ই রহমু		চিবল সাংমা
কামরুন নাহার লিজা		শিউলির সাতকাহন
ইমতেনান মোহাম্মদ জাকি		জ্ঞানগম্যির কাব্য
তিথী চক্রবর্ত্তী		গোলকধাঁধা
মোঃ ইয়াছির আরাফাত		ছায়াপথে হুইসেল বাজে
বি এম শহিদুল হাসান		শিরোনামহীন

এই উৎসবে বিশেষ বৈচিত্র্য সূচিত করেছিল ১৮ জন নির্দেশক-শিক্ষার্থীদের নাট্য প্রযোজনাসমূহ। কারণ এই সকল নাট্য প্রযোজনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ অভিনয় করেছিল এবং এই নাট্য প্রযোজনাগুলো তথাকথিত পাণ্ডুলিপি নির্ভর না হয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির সমকালীন ও ইতিহাস নির্ভর চিন্তা ও সৃজনশীল ব্যাখ্যার উপর ভর করে নির্দেশকবৃন্দ ইম্প্রোভাইজেশন পদ্ধতিতে এক একটি নাট্য প্রযোজনা নির্মাণ করেছিল। আর শিক্ষার্থী নির্দেশিত এই নাট্য প্রযোজনাসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র খেলার মাঠ, ছাদ, ক্যান্টিন এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন খোলা স্থানে দর্শকের সামনে প্রদর্শিত হয়। একদিকে মিলনায়তনে পাণ্ডুলিপি নির্ভর আমন্ত্রিত এবং বিভাগীয় শিক্ষকদের প্রযোজনার উপস্থাপন; অন্যদিকে, মিলনায়তনে নাট্য উপস্থাপনের পর টিএসসি'র বাইরে বিপুল দর্শকের সামনে শিক্ষার্থীদের নির্দেশিত ইম্প্রোভাইজেশন নির্ভর কন্সেপচ্যুয়াল পরিবেশনা। যার

ফলে দর্শকবৃন্দ সম্পূর্ণ নতুন এক নাট্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এই জনসম্পৃক্তকরণের জন্য নাট্যোৎসবটি হয়ে উঠেছিল সৃজনশীল কল্পনা, চিন্তা এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চারণভূমি। বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীনের "নাট্যের গণতন্ত্রায়নের ভাবনায়" অনুপ্রাণিত এই শিক্ষার্থীদের নাট্য নির্মাণের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষক শাহমান মৈশান ও আশিকুর রহমান লিয়ন। শাহমান মৈশান ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেন :

> the 18 directors began their journey from disappointment towards an unknown destination but also about a curved turn into a vital adventure of collaborative creation and success in terms of public participation as both performers and spectators and alternative ways of staging in contrast with the colonial formal proscenium staging trend. […] more than thousand audience watched the young directors and performers' theatrical performances that contained the contemporary global and local politics, socio-historical issues and topics.[26]

ঔপনিবেশিক প্রসেনিয়াম মঞ্চকেন্দ্রিক প্রভাবশালী নাট্যচর্চার বিপরীতে এই নাট্যোৎসবে জনসম্পৃক্তমূলক নাট্যকর্মগুলো সমকালীন বৈশ্বিক ও স্থানীয় রাজনীতি তথা সমাজিক-ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর মুক্ত প্রকাশের মাধ্যমে এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। শাহমান মৈশান ঐ নিবন্ধে আরো উল্লেখ করেন:

> This public theatre festival has witnessed the vast participation of young performers from non-theatre background, the engagement of a large amount of audience, the spatio-architectural presentation in the open-air as well as the creative and critical improvisational devising of content against the written dramatic literature. Thus the 18 theatrical performances of Dhaka University's theatre and performance studies department has created a new wave, embodied a new knowledge and, of course, brought up in society a new story of cultural history. This theatre festival cultivated an opposite dream about how we can live with alternative zeal of free creation while existing ways have already been clichéd.[27]

এভাবেই ১৩তম নাট্যোৎসব রচনা করেছিল গতানুগতিক সাংস্কৃতিক চর্চার উল্টোস্রোতে এক বিপরীত স্বপ্ন, এক নতুন তরঙ্গ, প্রবাহিত জ্ঞানের ধারা, এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন

গল্প।

১৪তম নাট্যোৎসব: রজত জয়ন্তীর ফল্গুধারা ও নতুন প্রত্যয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবটি ছিল থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগ তথা নাট্যাঙ্গনের জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ। কারণ এই উৎসবের মধ্য দিয়েই বিভাগ উদ্‌যাপন করে তার রজত জয়ন্তী অর্থাৎ ২৫ বছর পূর্তি। ২০১৯ সালে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:০০টায় ১ হতে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ১০ দিন ব্যাপী এই বিশেষ নাট্যোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈচিত্র্যময় আয়োজনে উদ্‌যাপিত এই বিশেষ নাট্যোৎসবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় পূর্বসূরি শিল্পগুরুদের। যেমন: বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট নাট্যগবেষক, নাট্য নির্দেশক অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, বিশিষ্ট সঙ্গীত গবেষক ও শিল্পী ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও প্রখ্যাত অভিনেত্রী সহযোগী অধ্যাপক ওয়াহীদা মল্লিক, ভারত ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, গুণী নাট্যনির্দেশক, গবেষক এবং শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন, বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ ও নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের সঙ্গীত বিষয়ের শিক্ষক প্রয়াত নিলুফার ইয়াসমিন, খ্যাতিমান অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক জনাব রহমত আলী, ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী এবং সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক ড. শাহনাজ নাসরিন ইলা।

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :[২৮]

নির্দেশনা	রচনা/অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ড. আহমেদুল কবির	রচনা: ড. আহমেদুল কবির	রসপুরাণ
মো. ফারিজ খান	রচনা: মুনীর চৌধুরী	একতালা দোতালা
সৈয়দ আল মেহেদী হাসান	রচনা: জহির রায়হান নাট্যরূপ: সৈয়দ আল মেহেদী হাসান	একুশের গল্প
রুদ্র সাওজাল	রচনা: দারিও ফো অনুবাদ: রুদ্র সাওজাল	মৃত্যু আসে ছদ্মবেশে
মোসা. সায়মা আক্তার	রচনা: হারেস হোলি অনুবাদ: মোসা. সায়মা আক্তার	হিজ লাক
আহম্মেদ রাউফুর রহিম	রচনা: আহম্মেদ রাউফুর রহিম	ব্লাড টেলিগ্রাম
মো. ওয়ালী হোসেন এমদাদ	রচনা: আহমদ ছফা নাট্যরূপ: মো. ওয়ালী হোসেন এমদাদ	কবি ও সম্রাট
সোনিয়া পারভীন অনা	রচনা: হাসান আজিজুল হক নাট্যরূপ: সোনিয়া পারভীন অনা	লালদিঘিতে জ্যেৎস্না
ফারজিয়া হক ফারিন	রচনা: ফেরেঞ্চ মোলনার অনুবাদ: ফারজিয়া হক ফারিন	ছদ্মবেশ
অদিতি চ্যাটার্জী	রচনা: গ্যারি মাইকেল ক্লুগার অনুবাদ: অদিতি চ্যাটার্জী	দ্য হোস্টেজ
মো. সানজিদুল ইসলাম	রচনা: রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরূপ: মো. সানজিদুল ইসলাম	কাদম্বরী

মো. সোহেল রানা	রচনা: স্যামুয়েল বেকেট অনুবাদ: কবীর চৌধুরী ও শাহিন	হ্যাপি ডেইজ
মো. আখলাকুজ্জামান অনিক	রচনা: এরিক কোবল অনুবাদ: আব্দুর রাজ্জাক	ওয়েটিং ফর দ্য ম্যাটিনি
শেখ আব্দুল কাইয়ুম	রচনা: জেফ গডে অনুবাদ: শেখ আব্দুল কাইয়ুম	মার্ডার বাই মিডনাইট
রাম কৃষ্ণ সাহা	রচনা: আন্তন চেখভ অনুবাদ: রাম কৃষ্ণ সাহা	সোয়ান সঙ
মোসা. তাসলিমা	রচনা: জেমস খালমার্স অনুবাদ: মোসা. তাসলিমা	নির্দয় পারিশ্রমিক
মো. আমিনুর রহমান	রচনা: অনুপম দেবাশীষ রায়	ফ্রম লাভ টু রেভ্যুলিউশন

শিক্ষার্থীদের নাট্য নির্মাণ ও পরিকল্পনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষক আশিকুর রহমান লিয়ন, তানভীর নাহিদ খান এবং নাভেদ রহমান। রজত জয়ন্তীর এই উৎসবে মোট ১৭টি নাট্য প্রযোজনা প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্যে একটি ভারতীয় ধ্রুপদীরীতির প্রযোজনাসহ ছয়টি বাংলা নাট্য প্রযোজনা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দশটি নাটক প্রদর্শিত হয়। এই সকল নির্বাচিত নাটকের মাঝে বেশ কিছু মৌলিক নাটক রচনা এবং উপন্যাস বা গল্প থেকে নাট্যরূপ দেয়ার কাজটি করেছে নির্দেশনা শিক্ষার্থীবৃন্দ নিজেরাই। নাট্য শিক্ষার্থীদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসবকে করেছিল প্রাঞ্জল। এ সম্বন্ধে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. আহমেদুল কবির-এর দেয়া উৎসব কথন থেকে জানা যায় :

> থিয়েটার এন্ড পারফম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দর্শকের সামনে প্রায়োগিক অভিব্যাক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এরপর থেকে বহু বৈচিত্র্যময় ও সৃজনশীল নাট্য প্রযোজনা দ্বারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেখেছে অনন্য অবদান। পঁচিশ বছর ধরে এই বিভাগ সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চার এক মহাকাব্যিক নকশী কাঁথার বুনন করে চলেছে।"[২৯]

সর্বোপরি, শাহমান মৈশান কৃত 'এখানে জীবন ফুরায় না, কেননা এখানে ভালবাসা অফুরান' শ্লোগানটি ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বার্ষিক নাট্যোৎসবের অঙ্গীকার ও দর্শন সম্পর্কে এক অনুপম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যেখানে প্রেম, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ আর জীবনের অর্থ রচিত হয় একই নাট্য-সৃজন-বেদীতে।

১৫তম উৎসব : রোগ শোক, ভয় শংকা ছাপিয়ে জয়যাত্রা

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি সংকট কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৌরবময় মাহেন্দ্রক্ষণে "শতবর্ষের এই আলোকতীর্থে

স্বাধীনতার এই বীজভূমে
আমাদের সৃষ্টির এই উৎসব
সত্তাও স্বপ্নের ভাষায় করি কলরব"

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২১ মার্চ হতে ১ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাটমণ্ডল অডিটরিয়ামে মোট ৯টি নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি।

বাংলাদেশের প্রতিথযশা নাট্যজন, সংগঠন রামেন্দু মজুমদারকে এই উৎসবে নাট্যজন সম্মাননা প্রদান করা হয়। চলমান বাস্তবতায় এই উৎসব আয়োজনের প্রেক্ষপটের কর্মপ্রণালি আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই কর্মপ্রক্রিয়ার মাঝেই অনুসন্ধান করা হবে– কেন এই উৎসবটি ছিল জয়যাত্রার সামিল। করোনা সংকটের মাঝে উন্নত বিশ্বের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ শিক্ষাকার্যক্রম, অনুশীলন ও পরীক্ষা যথাসময়ে সমাপ্ত করার চেষ্টা করেছে। সেই লক্ষ্যেই বিশ্বব্যাপী চলমান রোগ ও শোকের করাল গহ্বর থেকে বেরিয়ে নাট্য শিক্ষার্থীদের প্রবল আন্দোলিত অংশগ্রহণে ২৪ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটরিয়ামে ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু করোনা মহামারি পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় উৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ। হৃদয়ভাঙ্গা এমন সিদ্ধান্তে মুষড়ে পড়া বাস্তবতার মুখোমুখি হয় বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ সকলে। কিন্তু এই থমকে যাওয়ার মাঝে, পরাজিতের যে অনুভূতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাকে প্রশ্রয় দেয়াকে বিভাগ কখনই সমর্থন করে না। তাই করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর একাডেমিক ক্লাস-পরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রমকে চলমান রেখে এবং স্থগিত হওয়া উৎসবের আর্থিক সংকট মোকাবেলা করে দ্বিগুণ উৎসাহে ১৫তম কেন্দ্রীয় নাট্যোৎসব আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে এই উৎসবের জয়যাত্রা শিক্ষায়তনে সাংস্কৃতিক ও নাট্যচর্চার 'নব্য তরঙ্গে' যেন বিশেষ অনুরণন সৃষ্টি করেছিল।

চিত্র ৫ : নাট্যজন সম্মাননা গ্রহণ করছেন রামেন্দু মজুমদার, ২০২২

এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত নাট্য প্রযোজনাসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো : [৩০]

নির্দেশনা	রচনা/ অনুবাদ/পরিকল্পনা	নাটক
ইসরাফিল শাহীন	স্যামুয়েল বেকেট আসাদুল ইসলাম	ওয়েটিং ফর গডো
দেবাশীষ কুমার দে প্রশান্ত	শংকর কুমার বিশ্বাস	খারিজ
মো. আশরাফুল ইসলাম	শহীদুল জহির মো. আশরাফুল ইসলাম	কোথায় পাব তারে
অপূর্ব চক্রবর্তী	এলদাদ কোহেন চৈতী হাওলাদার	রেপার্টরি থিয়েটার এ প্লে
ওয়াজেদ শাহরিয়ার হাশমী	অ্যাথল ফুগার্ড কউসার হামিদ যাওয়াদ	দ্য শ্যাডো অব হামিংবার্ড
নাদিরা আঞ্জুম মিমি	টেনেসি উইলিয়ামস	দ্য টু ক্যারেক্টার প্লে
তাসলিমা হোসেন নদী	তাসলিমা হোসেন নদী	শেষ গোধূলীর ঘুম
ইন্দ্রাণী দাশ নিশি	শাঁওলি মিত্র	নাথবতী অনাথবৎ
তানভীর নাহিদ খান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে বলেন,

> শতবর্ষের শিক্ষায়তনিক পথ পরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চার বহুমাত্রিক ভাষা ও বাগবিধি সৃজন প্রচেষ্টায় সর্বদা ব্রতী। নাট্যশিল্প সেই বহুমাত্রিক ভাষা বিনির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নাট্যোৎসবে প্রযোজিত দেশি-বিদেশি নাট্যকারদের

রচিত নাটকসমূহ একই সাথে নান্দনিক ও জ্ঞানমূলক; যা আমাদের সমাজজীবন পরিবর্তনে নানাবিধ ইতিবাচক বার্তা প্রদান করে থাকে। একদিকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ, মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আনন্দ-উল্লাস তখন অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারির ভয়াবহতা বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অতিমারির বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আন্তঃসম্পর্কীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে যুগপৎ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-অনুশীলন ও অদৃশ্য জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য এধরনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অসাধারণ। [৩১]

অপরিচিত ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব যে অসীম তার অনুসন্ধান মেলে মাননীয় উপাচার্যের কথনে।

জীবন, সম্পর্ক, সমাজ, ধর্ম পাঠ করার কার্যকর প্রেক্ষাপট সৃজিত হয়েছিল এই উৎসবে। জীবনের অর্থ কি শুধু অর্থহীন অপেক্ষা, নাকি বৃহৎ অপেক্ষার পর প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের চূড়ান্ত মুহূর্তে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া, নাকি জীবনের অর্থ হলো হাতড়ে বেড়ানো সারল্য খুঁজে পাবার জন্য ছায়ার পিছনে ছুটে চলা, আবার এমনও তো ঘটে জীবনে– ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে চলেছেন কোন এক নিরপরাধ ব্যক্তি অথবা ধর্মের ঝাণ্ডা নাচিয়ে ক্ষমতা লাভের তাড়নায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে নিজ সন্তানকে। এমন নানা প্রসঙ্গ আবিষ্কৃত হয় এই উৎসবের নাট্য প্রযোজনাসমূহে। বৈচিত্রময় প্রেক্ষাপটে জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে কি করে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা সৃজিত হয়, সেই দর্শন খুঁজে পাওয়া যায় এই ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে।

চিত্র ৬ : টিএসসি ভবনের সামনে নির্মিত নাট্যোৎসব ফটক

নাট্যাঙ্গনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিক্ষকবৃন্দের নাট্য প্রযোজনাসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে পরিবেশিত নাট্য প্রযোজনা ছাড়াও বিভাগের শিক্ষক নির্দেশিত বেশকিছু নাট্য প্রযোজনা জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে নাট্য অভিযাত্রায় 'নব্য তরঙ্গ' সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ-এর নির্দেশনায় লোকনাট্য প্রযোজনা *কমলারাণীর সাগর দিঘী* (১৯৯৪), ড. বিপ্লব বালার আখ্যান ভাষ্যে পদ্মাপুরাণ অবলম্বনে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত *বেহুলার ভাসান* (২০০৪) (২০০৬) (২০১০), লোকনাট্য সং যাত্রার আলোকে *সং ভং চং* (২০০৯)। সহযোগী অধ্যাপক ওয়াহীদা মল্লিক নির্দেশিত ভাস রচিত ভারতীয় ধ্রুপদী নাটক *মধ্যম ব্যায়োগ* (২০০৫) (২০১০), *উরুভঙ্গ* (২০০৮)। সহযোগী অধ্যাপক রহমত আলী নির্দেশিত মুনীর চৌধুরীর নাটক *কবর* (২০০২)। অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন নির্দেশিত সাদাত হাসান মান্টো রচিত *টোবাটেক সিং* (১৯৯৬), নরওয়েজিয় নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের *এ ডল'স হাউস* (১৯৯৭), রাশিয়ান নাট্যকার আন্তন চেখভের নাটক *থ্রি-সিস্টার্স* (২০০৫), নোবেলজয়ী নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের *দ্য বার্থ ডে পার্টি* (২০০৭), পারস্য প্রতিভা ফেরদৌসী রচিত *সোহরাব-রুস্তম* (২০১৩), *দ্য মেজারস টেকেন (সিদ্ধান্ত)* রচনা: বার্টল্ট ব্রেখ্ট (২০১৩), জ্যঁ রাসিনের ফেইড্রা অবলম্বনে *সাঁঝবেলার বিলাপ* (২০১৭), শাহমান মৈশান রচিত *পাঁজরে চন্দ্রবান* (২০১৮), উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রচিত *ম্যাকবেথ* (২০০৬) (২০১৮)। সহকারী অধ্যাপক সুদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত আন্তন চেখভের নাটক *থ্রি-সিস্টার্স*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী* (২০০৭), দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের যাত্রাপালা সাজাহান (২০০৮), ম্যাক্সিম গোর্কির নাটক নিচুতলার মানুষ (২০০৮), সেলিম আল দীন রচিত চাকা (২০১৩), শেক্সপিয়ার -এর একাধিক নাটকের সমন্বয়ে শেক্সপিয়ার সপ্তক (২০১৬)। সহকারী অধ্যাপক জিয়াউল হক তিতাস নির্দেশিত সৈয়দ সামসুল হক রচিত নাটক নূরলদীনের সারাজীবন (২০০৮), রাশিয়ান নাট্যকার আন্তন চেখভের নাটক সী গাল (২০০৯), আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত তৃতীয় পুরুষ (২০১০), হারল্ড পিন্টার রচিত হোম কামিং (২০১০), ডরিস লেসিং রচিত প্লে উইথ দ্য টাইগার (২০১০), আর্থার মিলার-এর ডেথ অফ এ সেলসম্যান (২০১২), নির্দেশক রচিত উল্টোরথ (২০১৪)। সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির নির্দেশিত হেনরিক ইবসেন রচিত নাটক ওয়াইল্ড ডাক (২০০৯), স্যামুয়েল বেকেট রচিত এন্ড গেম (২০১০), উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত এ মিডসামার নাইট'স ড্রিম (২০১০), হপ্তম্যান রচিত নাটক দ্য উইভার্স (২০১১), সাঈদ আহমেদের তৃষ্ণায় (২০১১), বুদ্ধদেব বসুর নাটক প্রথম পার্থ (২০১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিসর্জন* (২০১২), সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন, নিষিদ্ধ লোবান ও পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় অবলম্বনে *বহ্নি বিসর্জন ব-দ্বীপ* (২০১৮), রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন ধ্রুপদী নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ *রসপুরাণ* (২০১৯)। সহকারী অধ্যাপক আশিক রহমান লিয়ন নির্দেশিত ও পরিকল্পিত শূদ্রক রচিত ধ্রুপদী নাটক *মৃচ্ছকটিক* (২০০৯), জে

এম সিঞ্জ-এর *রাইডার্স টু দ্যা সী* (২০১১), উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত *হ্যামলেট* (২০১৪), নাটক *অপরেরা* (২০১৯) অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের দ্য ফাদার, মিস জুলি, আন্তন চেখভের থ্রি সিস্টার্স, দ্য সিগাল এবং হেনরিক ইবসেনের এ ডল'স হাউস, দ্য লেডি ফ্রম দ্য সি অবলম্বনে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। সহকারী অধ্যাপক শাহমান মৈশান নির্দেশিত হাইনার মুল্যার রচিত নাটক *হ্যামলেটমেশিন* (২০১২), ফ্রাঙ্ক ওয়েডেকিন্ডের *বসন্ত জাগরণ* (২০১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও ডাকঘর অবলম্বনে ও নির্দেশকের ভাবনা ও বিনির্মাণে সৃজিত *প্রকৃতি, চিত্রা ও অমলের চাড়ালনামা* (২০১৬)। সহকারী অধ্যাপক কাজী তামান্না হক সিগমা নির্দেশিত পদ্মাপুরাণ অবলম্বনে *চম্পকনগরের উপকথা* (২০১৫)। খন্ডকালীন শিক্ষক ড. সাইদুর রহমান লিপন নির্দেশিত লোকনাট্য *কমলারানীর সাগরদীঘি* (২০১১), *ভেলুয়া পালা* (২০১২)। প্রভাষক তানভীর নাহিদ খান নির্দেশিত মাক্সিম গোর্কির নাটক *দ্য লোয়ার ডেপথ্স*্ (২০১৮) উল্লেখযোগ্য। এসকল নাট্য প্রযোজনা দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ মিলনায়তন ছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করে সমাদৃত হয়েছে।

উপসংহার:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের ১৪টি প্রপঞ্চ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নাট্যচর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও সৃজনশীলতার তরঙ্গ তৈরিতে এই উৎসব এক বহুমুখী কর্ষণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নাটকের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনাগত নিরন্তর নিরীক্ষা, নতুনত্ব এই উৎসবকে তারুণ্যের মুক্তাঙ্গনে পরিণত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা অতিক্রম করে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক চর্চাকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সৃজন-উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উৎসব প্রতীয়মান করে জাতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজের মিলনের প্রয়োজনীয়তাকে। পরিশেষে, সৈয়দ জামিল আহমেদের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাট্যোৎসব হলো সেই বিশেষ মাধ্যম, "যার মাধ্যমে সমস্যাসঙ্কুল জীবনের ভেতরেও জন্ম নেয় এই আবিষ্কারের এবং সৃষ্টির অনুরাগ যে, জীবন নানা রঙের এক উৎসব।"[৩২]

তথ্যনির্দেশ

১. শাহমান মৈশান, "বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চা", *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১২ পরিবেশনা শিল্পকলা*, ইসরাফিল শাহীন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৩০৮।

২. সৈয়দ জামিল আহমেদ, "থিয়েটার থেকে পারফরম্যান্স : জ্ঞানতত্ত্বের নয়া প্রস্থানবিন্দু ধুরন্ধর রঙ্গকারের বহুরূপী সৃষ্টি-উৎসব" শীর্ষক বক্তৃতার পুনঃমুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মুদ্রিত স্যুভেনির, ২০১৯, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

৩. *পূর্বোক্ত*

৪. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৫।

৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।

৬. ইসরাফিল শাহীন, "*ম্যাকবেথ*: রূপায়ণ প্রক্রিয়া", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির, ২০০৬, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

7. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০০৭, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

৮. ইসরাফিল শহীন, "প্রসঙ্গ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যসপ্তাহ", *পূর্বোক্ত*।

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩য় কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০০৮, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১০. শাহমান মৈশান (বার্মিংহামে অবস্থানরত), ব্যক্তিগত যোগাযোগে গৃহীত সাক্ষাৎকার, মাধ্যম : মুঠোফোন, ঢাকা, ৬ জুন ২০২১।

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০০৯, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১০, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১১, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৪. আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক, "উৎসব কথন" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে গৃহীত হয়েছে, ২০১২, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১২, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৪, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৭. ইসরাফিল শাহীন, "উৎসব কথন", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে গৃহীত হয়েছে, ২০১৪, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৪, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

১৯. আসাদুজ্জামান নূর, "উৎসব কথন", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে গৃহীত হয়েছে, ২০১৪, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৫, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

২১. সুদীপ চক্রবর্তী, "উৎসব কথন", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে গৃহীত হয়েছে, ২০১৫, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

২২. আসাদুজ্জামান নূর, "উৎসব কথন", *পূর্বোক্ত*।

২৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৭, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৭, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

২৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৮, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

26. Shahman Moishan, "A story of a new history of theatre", *New Age*, Published on December 14, 2018. Accessed on September 9, 2021. Link: http://www.newagebd.net/article/58831/a-storyof-a-new-history-of-theatre

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ও রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০১৯, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

২৯. আহমেদুল কবির, "নাট্যচর্চা বহুমুখী জ্ঞানের যৌথ অভিব্যক্তি", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ও রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে গৃহীত হয়েছে, ২০১৯, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০২১, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

৩১. মো. আখতারুজ্জামান, "উৎসব কথন" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে প্রযোজিত নাটকসমূহের বিস্তারিত তথ্য গৃহীত হয়েছে, ২০২১, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

৩২. সৈয়দ জামিল আহমেদ, "থিয়েটার থেকে পারফরম্যান্স : জ্ঞানতত্ত্বের নয়া প্রস্থানবিন্দু, ধুরন্ধর রঙ্গকারের বহুরূপী সৃষ্টি-উৎসব " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ও রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির হতে গৃহীত হয়েছে, ২০১৯, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

রবীন্দ্রভাবনায় শিশুশিক্ষা

বিপাশা আহমদ*

সারসক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে মানুষ প্রকৃতির সন্তান। তাই শিশু থেকে সম্পূর্ণ বিকশিত মানুষ হবার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, তা যেন প্রকৃতির স্পর্শের বাইরে না হয়, সেদিকে ছিল তাঁর সচেতন দৃষ্টি। এ চিন্তা থেকেই তিনি রচনা করেছেন বহুবিধ প্রবন্ধ; নির্মাণ করেছেন বিশ্বভারতীর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশদের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার স্পর্শে ভারতবর্ষে যখন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো, তখন কেন রবীন্দ্রনাথ সেই পুরনো তপোবনভিত্তিক গুরু-শিষ্য শিক্ষাদানের কথা বলছেন, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা চালানো হয়েছে নিবন্ধটিতে। সেই সাথে রবীন্দ্র-শিশুশিক্ষা দর্শনের সাথে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মতবাদ মিলিয়ে দেখার একটা প্রচেষ্টাও সাধিত হয়েছে। আধুনিক শিশুশিক্ষণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাজ্ঞ পুরুষের কাছ থেকে আমরা কতখানি গ্রহণ করতে পারি, তা ভেবে না দেখার অবকাশ নেই।

১

প্রকৃতিপূজারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১- ১৯৪১) চেয়েছিলেন মানুষের শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত ঘটুক প্রকৃতির সান্নিধ্যে। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। তাই প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শিক্ষক তার আর কেউই নেই। প্রকৃতিই জ্ঞানের প্রকৃত আধার। শিশুর কাছে প্রকৃতি চির নতুন। শিশু তার অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ। এভাবেই সম্পন্ন হয় তার জ্ঞানের বিকাশক্রম। রবীন্দ্রনাথের মতে :

> কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে বাড়িয়া উঠিবার সময়ে প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮০)

২.১

শিল্পবিপ্লবোত্তর ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ফিরে যেতে চাইলেন প্রাচীনে; অনুসন্ধান করলেন তপোবন আশ্রিত শিক্ষার ইতিবাচকতা।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা

ভারতে প্রাচীনকালে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। শিক্ষা ছিল শাসক, পুরোহিত ও সুবিধাপ্রাপ্তদের জন্য। চতুবর্ণের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা শূদ্রদের এবং সকল বর্ণের নারীদের শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার ছিল না। মহাভারত থেকে জানা যায় যে, উপনয়নের পরই শিক্ষারম্ভ। উপনয়নের মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করলে তবেই বেদবিদ্যা অধ্যয়নের অধিকার জন্মায়। উপনয়নের পর শিক্ষার্থী একজন ব্রাহ্মণ গুরুর গৃহে কয়েক বছর থেকে শিক্ষা অর্জন করত। উপনয়নের বয়স ব্রাহ্মণের জন্য ছিল আট বছর; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর জন্য ছিল যথাক্রমে এগারো ও বারো বছর।

ব্রহ্মচর্যাকালে শিক্ষার্থীর বেশভূষা বলতে ছিল নিম্নাঙ্গে বস্ত্র, ঊর্ধাঙ্গে পশুচর্ম, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী ব্রাহ্মণ বেশ। দণ্ড ধারণের অর্থ হলো শিক্ষাজীবনে দীর্ঘ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজনীয় অবলম্বন। এছাড়া থাকত যজ্ঞোপবীত বা পৈতা। গুরুর আশ্রমে প্রাচীন ঋষিরা শিষ্যকে পুত্র, স্বামী এবং পিতা হিসাবে কী দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেসম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। দণ্ডনীতি, ধনুর্বেদ, সামাজিক বিধি-বিধান এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল সমাজজীবনের বিচিত্র বর্ণের কথা মাথায় রেখে। একদিকে পরমজ্ঞান সত্যোপলব্ধি এবং অন্যদিকে পার্থিব দায়িত্বপালন এই দুই লক্ষ্যপূরণের জন্য গুরুগৃহে তপোবন আশ্রমে বিদ্যাকে দুভাবে পরিবেশন করা হতো পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা হলো পরমজ্ঞান লাভের জন্য তিন বেদ, ছয় বেদাঙ্গ অনুশীলন করা। আত্মসংযম এবং যোগসাধন দ্বারা এই বিদ্যা অর্জন করা হতো। আর অপরাবিদ্যা ছিল পার্থিবসংশিষ্ট। শিক্ষাপ্রবাহিত ছিল গুরু থেকে শিষ্য, শিষ্য থেকে তার শিষ্য পরম্পরায়। এই কারণে সে যুগে জ্ঞান গ্রন্থনাকে বলা হতো 'স্মৃতি' বা 'শ্রুতি'।

সমাজের শূদ্ররা যেহেতু শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল, তাই একসময় জীবিকার তাগিদে শূদ্র ও বৈশ্যদের একটা অংশ গণিত, অক্ষরজ্ঞান শিখতে শুরু করে। এ ধরনের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিল বণিক, গ্রাম্য কারিগর ও কৃষক। এ শিক্ষায় লেখার গুরুত্ব ছিল বেশি। ধীরে ধীরে সেখানে কাব্য, ব্যাকরণ, গণিত শেখানোর উপর জোর দান করা হয়। এভাবে বাংলার ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষিজীবীরা মিলে নিজেদের প্রয়োজনে এই পাঠশালার ভিত গড়ে তোলে। সময়ের প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরেই এই শিক্ষাধারার জন্ম। এরপর মুঘল আমলে টোল, মক্তব, মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ আমলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় মাদ্রাসা-পাঠশালার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

২.২

ব্রিটিশ আমলে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম কলকাতা মাদ্রাসা (অধুনা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) চালু করেন। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও আদব-কায়দা শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় চালু করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের উচ্চশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম

ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত চার্লস উডের ডেসপ্যাচকেই ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা আখ্যা দেয়া হয়। তিনিই প্রথম প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর পর্যন্ত শিক্ষার একটি যুক্তিসঙ্গত পলিসি নথি আকারে প্রকাশ করেন। এই নথিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে কিভাবে কী পড়ানো হবে, সেবিষয়ে নির্দেশনা থাকে। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ করা হয়। এরপর হান্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩), ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪), স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-২৯), হার্টগ কমিশন (১৯২৯), বুনিয়াদি শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (১৯৩৭), সারজেন্ট পরিকল্পনা (১৯৪৪)সহ সময়ের ধারাবাহিকতায় নানা শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়। উনিশ শতকের পূর্বে ভারতবাসী পাঠশালা, টোল, মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরবি-ফারসি-সংস্কৃত আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করত। সেখানে শাস্ত্রগ্রন্থ, সাহিত্য, দর্শন, আইন, গণিত, ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সরকারি সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন সরকারি চাকরিতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ব্রিটিশদের এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ, কারণ তখনকার শিক্ষা নগরকেন্দ্রিক হওয়ায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ শিক্ষা থেকে ছিল বঞ্চিত। দেশীয় ভাষার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মাশ্রম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এখানে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ ঘটাতে চাইলেন যা পাশ্চাত্য জ্ঞানে অনুপস্থিত বলে তিনি মনে করতেন। পরবর্তীতে অভিভাবকদের চাপেই শান্তিনিকেতনে ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর আদলে পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম চালু করেন। ১৯২১ সালে এর নতুন নাম দেন 'বিশ্বভারতী'। এখানে শিশুদের বৃক্ষছায়াতলে পাঠদানের রীতি প্রচলিত।

৩.১

আজ শতবর্ষ পরেও বঙ্গদেশ তার সন্তানদের জন্য এমন প্রকৃতিবেষ্টিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেনি বটে, তবে আধুনিক বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের আয়োজনে প্রয়াসরত; যেখানে দরকার পড়ে ইটকাঠের ইমারত, বিদ্যুৎ, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রশিক্ষিত শিক্ষক। শিক্ষণের বিপুল আয়োজন শেষে প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ কতখানি ফলপ্রসূ হয়, সেটাই বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিশু বেড়ে উঠুক প্রকৃতির মাঝে; প্রকৃতির ক্যানভাসে তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলুক রঙ-বেরঙের স্বপ্ন। সেখানে শিশুর সামনে আমরা প্রস্তুত করেছি চারকোণা আলো বিকিরণ সমন্বিত প্রজেক্টর, যার তীব্র আলোর বিকিরণ শিশুর চোখের জন্য কতখানি স্বাস্থ্যকর, তা বিবেচনার বাইরে রেখেই। অথচ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতে সবুজ প্রকৃতি চোখের জন্য উপাদেয়। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এসব চিন্তা

করেই 'স্কুল' নামক কারাগারকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন :

> কোনোমতে সাড়ে নয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যা শিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরাদিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থ্যভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮১)

৩.২

রবীন্দ্রনাথ যে নিরানন্দময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছিলেন, বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তা থেকে বেরোনোর জন্য চেষ্টারত। তাই রাষ্ট্র আইন করে স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীদের শাস্তিপ্রদান থেকে মুক্তি দিয়েছে। আরও আনন্দের বিষয় যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার উপকরণাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। শিশুর বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রক্ষার জন্য টিফিন, উপবৃত্তিসহ নানা আয়োজন করা হয়েছে। এসবই সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে অধিকাংশই সমাজের নিম্নবিত্তের সন্তানরা পড়াশুনারত। তাদের অভিভাবকগণ যথেষ্ট সচেতন নন। তাই কিছুদিন স্কুলে যাতায়াতের পর তাঁরা পরিবারে স্বচ্ছলতার কথা চিন্তা করে সন্তানদের অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত করে দেন। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীন ভারতের তপোবনভিত্তিক শিক্ষায় শূদ্ররা বিদ্যাশিক্ষার ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল। আবার ব্রিটিশ আমলেও শ্রমজীবী মানুষেরা নিরক্ষর থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ সমাজের এই তৃণমূল অংশকে শিক্ষিত করতে শান্তিনিকেতনে শুরুর দিকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের সূচনা করেছিলেন।

৩.৩

সমাজের মধ্যবিত্ত অংশ সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তাঁরা সবসময়ই প্রত্যাশা করে তাঁর সন্তানটি সবকিছুতে সেরা হোক, ক্লাসে প্রথম হোক। তীব্র প্রতিযোগিতার মাঝে নিজের সন্তানটিকে শ্রেষ্ঠ দেখাই তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদের আয়োজনের কমতি নেই। সন্তানকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে, ইংলিশ ভার্সন অথবা কিন্ডারগার্টেন স্কুলই তাদের প্রথম পছন্দ, যা শিশুদের মাঝে শিক্ষার আনন্দের পরিবর্তে বিভীষিকারূপে প্রতীয়মান হয়। এসব স্কুলের শিক্ষকরাও যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নন। এই ইংলিশ ভার্সনের জন্য তাদের অতিরিক্ত বইয়ের চাপতো আছেই, এরপর আবার কোচিং-প্রাইভেটের চাপ। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েও এর ব্যতিক্রম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি আরও অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় : 'পরের ভাষায় গ্রহণ করা শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৭৪)

৩.৪

সমাজের উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এসব স্কুল মূলত বিদেশি স্কুলসমূহের সিলেবাস অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু সেখানেও দেখা দেয় মাতৃ ভাষার দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে 'শিক্ষা সংস্কার' প্রবন্ধটিতে যা বলেছেন, তার মর্ম হলো এই যে আমরা জাতি হিসেবে আলাদা, তাই আমাদের শিক্ষা আমাদের অনুকূলে হওয়া আবশ্যক; বিদেশের অনুকরণে নয়। এই নীতিটি বর্তমান সময়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।' (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৭৩)

বর্তমান সময়ে শিক্ষাব্যবস্থায় কিছুদিন পরপর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নীতি নির্ধারকগণ সরাসরি বিদেশি শিক্ষার প্রবর্তন করতে চান। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন থ াকলেও জাতি হিসেবে আমরা কতটুকু নিতে পারব, তা ভেবে দেখা আবশ্যক। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনটা সাযুজ্য হবে, তাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪.১

সুতরাং সমাজের কোনো স্তরেই শিশুর শিক্ষণ যথাযথ হচ্ছে না। ব্রিটিশ আমলেও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। এ থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের আশ্রম, তপোবন, গুরু-শিষ্য শিক্ষার কথা বলেছেন। শিশুরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে আদর্শবান গুরুর কাছে উপদেশ বাণী গ্রহণ করবে এবং জীবনে প্রয়োগ করতে শিখবে। শিক্ষা যেন বাস্তব জীবনযাপনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন থাকার কথা বলেছেন:

> বাড়িতে বাপ-মা, ভাই-বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে– তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৭৮)

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় এই মন্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। শিক্ষাবিদগণ বলে থাকেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যা পড়ানো হয়, তার অধিকাংশই জীবনে কাজে আসে না।

৪.২

ব্রিটিশ উপনিবেশে বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যে শাসনের সুবিধার্থে, তা অনেকেই অবহিত। সমাজবিচ্ছিন্ন এক ধরনের কলের মানুষ তৈরি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আজকের শিক্ষাব্যবস্থায়ও যে দাতাদেশ সমূহের ইচ্ছার প্রতিফলন রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। সচেতন, দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পেরেই বলেছিলেন :

> নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতে প্রতিবাদ করিবেনা ও পরের কাজে জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৭৪)

৪.৩

আশ্রমে শিশুরা অল্প খেয়ে, অল্প পরে বড় হবে, যাতে বড় হয়ে তারা কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বঙ্গদেশ দরিদ্র দেশ। তাই কৃচ্ছ্রসাধনা না করে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। তাছাড়া কৃচ্ছ্রতা ধনী দরিদ্রের মাঝে বিভেদ কমিয়ে, সম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার লাগাম টানতে সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ 'আবরণ' প্রবন্ধে প্রকৃতির সাথে শিশুর কোমল শরীরের একাত্মতা কামনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন যে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বইমুক্ত থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থ বহিঃপ্রকৃতির সাথে শিশুর অন্তর্সংযোগের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে বলে তাঁর ধারণা। প্রাচীন তপোবনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও লিখিত পুস্তকের আবশ্যকতা ছিল না। গুরু উপদেশ দান করতেন; শিষ্য শ্রবণ করে আত্মস্থ করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রুতি-স্মৃতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪.৫

রবীন্দ্রনাথ হাতেকলমে শিক্ষা তথা কারিগরি শিক্ষার প্রতি জোরারোপ করেছেন। শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি শিশুরা সাংসারিক জীবনের কাজের সাথেও জড়িত থাকবে, অভিজ্ঞ হবে অর্থাৎ দেশের অর্থনীতিতে তারা শৈশব থেকেই অবদান রাখবে এমনটাই তিনি কামনা করেছেন। পাশ্চাত্যে আমরা দেখতে পাই শিশুরা পড়াশুনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন চাকরি করে। আমাদের শিশুরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? তাছাড়া শৈশব থেকেই শিশুদের শ্রমের অনুশীলন করানো শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলে জমি থাকা আবশ্যক। এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে; এইরুপে তাহারা প্রকৃতি সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮২)

৪.৬

শিক্ষার্থী অন্যায় করলে রবীন্দ্রনাথ দণ্ডপ্রদানের কথাও বলেছেন। তবে তা মাস্টারের বেতের বাড়ি নয়,অন্যায় স্বীকারকেই তিনি দণ্ডপ্রদান বলেছেন। এতে অন্যায় সম্বন্ধে শিশুর বোধোদয় ঘটবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানি মোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই। পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮২)

৪.৭

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিও জোর দিয়েছেন। শিশুর সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা শিশুর শিক্ষাকে আরও আনন্দময় করে তোলে বলে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগের কথা বলেছেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও এর প্রতি গুরুত্বদান লক্ষ করা যায়। এর ফলে শিশুর শিল্পীসত্তার বিকাশ যেমন স্বাভাবিক হয়, তেমনই জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি থেকেও দূরে থাকা সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণির মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র পরিচয়ে, সংগীত চর্চায় পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮২)

৪.৮

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় নীতি-উপদেশের বিরোধিতা করেন, যাতে শিশুদের সাথে মিথ্যার পরিচয়ই না ঘটে। নীতি-উপদেশ তাকেই দান করা যায়, যার নীতিবোধ নেই। কিন্তু শিশুরাতো নিষ্পাপ তাই তিনি বলেছেন :

> নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮০)

৪.৯

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের নিজের কাজ নিজে করা শেখানোর প্রতি গুরুত্বদানের কথা বলেছেন। পরিবার থেকে দূরে আশ্রমে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে অবস্থান করলে তা সম্ভব। মা-বাবার আদরে অনেক শিশুই নিজের কাজ নিজে শিখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে না। আমাদের সমাজে কায়িক শ্রমকে লজ্জার মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ ভ্রান্ত ধারণার বিপক্ষে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> প্রথমেই তো বদ্ধ ডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে হাত-পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই, সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরুপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সুস্থ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া উঠে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮৪)

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন 'সুখ মনে, আয়োজনে নয়', কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিশুকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার চিন্তা ছিল রবীন্দ্র-শিশুশিক্ষা দর্শনে।

৪.১০

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবাণিজ্যের বিরুদ্ধেও কথা বলেছিলেন, যা বর্তমান যুগে বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করেছে :

> আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৮৩)

৪.১১

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মাঝে শিশুর বেড়ে ওঠার প্রতি এতটাই তাগিদ দিয়েছিলেন যে শিশুদের বই পড়া নয়, বই কীভাবে তৈরি হলো, তা জানার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃতিই জ্ঞানের আধার। তাই প্রকৃতিকে জানলে, বই থেকে অধিক জানা হবে বৈকি :

> বই পড়াটাই যে শেখা ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত এবং সেখানে যে আমাদের অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৯৯)

যে রবীন্দ্রনাথ বইয়ের দৌরাত্ম্য বেশি বলে মন্তব্য করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই একসময় শিশুদের উপযোগী করে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতিশীল। নিজে শিশুদের জন্য *'সহজপাঠ'*, *'ইংরেজি সোপান'* প্রভৃতি রচনা করেছেন। আবার নিজের তত্ত্বাবধানে অন্যদের দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও অবদান রেখেছেন।

৪.১২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেই স্থির ছিলেন না, তা বাস্তবে রূপদানের জন্য

নিজের অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে শিশুশ্রেণি থেকে উচ্চতর পড়াশুনা ছিল প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে সফিউদ্দিন আহমদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> পৃথিবীর অনেক শিক্ষাবিদই দেশের শিক্ষা, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু হাতে কলমে কাজ না করে তাঁরা শুধুমাত্র দূর থেকে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথই শিক্ষা নিয়ে হাতে কলমে কাজ করেছেন। (সফিউদ্দিন আহমদ ১৯৯৯ : ৪৪)

৫.১

তখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ শিশুশিক্ষা চিন্তা সত্যিই বিস্ময়কর। তবে বর্তমান বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যার জন্যে যখন বনই উজাড়, তখন তপোবনে শিক্ষার কথা আমাদের মনে ভুলেও উদয় হয় না। শিশুর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনেক অভিভাবকই সন্তানকে দূরে পাঠাতে চায় না। এমতাবস্থায় দেশের আবাসিক স্কুলগুলো চাইলে রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করতে পারে। সর্বপ্রথম চাই অভিভাবকের আকাঙ্ক্ষা। কারণ শিক্ষা এক ধরনের মানসিক সেবা। অধিকাংশ অভিভাবক নিজেই জানে না যে, তার সন্তানের ভালো কিসে। সে কেবল চায় তার সন্তান যেন পিছিয়ে না পড়ে। আজকাল শিশুকে স্কুলে দিয়ে অনেক অভিভাবকই স্কুলের গেটে অপেক্ষা করে স্কুলছুটি না হওয়া পর্যন্ত। স্কুলে অভিভাবকদের জন্যে বসার জায়গা ও সেখানে এজাতীয় প্রবন্ধাদি প্রচারের ব্যবস্থা থাকলে অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের আগামী প্রজন্মও বেড়ে উঠতে পারে স্বাভাবিকভাবে।

৫.২

আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। পাশ্চাত্যের মতো গ্রীষ্মপ্রধান বা শীতপ্রধান নয়। তাই স্কুলেই খোলা জায়গায় তাদের গাছের তলায় শিক্ষাদান করা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গরিবের এক ধরনের ঘোড়ারোগের মতোই। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে যা আবশ্যক, তা একে তো ব্যয়বহুল, দ্বিতীয়ত তার সবই প্রায় আমদানিকৃত। এর ফলে উন্নত দেশগুলোর ইলেকট্রনিক সামগ্রীর বাণিজ্য করার সুবিধা হচ্ছে, অপচয় হচ্ছে দেশীয় অর্থের। যে রবীন্দ্রনাথ স্কুলের বেঞ্চ-টেবিলের বিরোধিতা করেছিলেন ইংরেজ সামগ্রী বলে, সেই রবীন্দ্রনাথ আজকের শিশুদের বদ্ধগৃহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম দেখে কী মন্তব্য করতেন, সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছিলেন :

> এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি-টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামী করিয়া এই কথা বলিতেছি এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যক বাদে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে।

> চৌকি টেবিল বেঞ্চ সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে। আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে, আমরা নীচে বসিতে পারিনা, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণ অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই, তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। (রবীন্দ্রনাথ ২০০০: ৬৯৯)

৬.১

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কেন শিশুশিক্ষা বা শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেছেন। সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি সমাজবীক্ষণ করেছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে আলো পৌঁছাতে হলে আর আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ব্রিটিশরাই এদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। তাই তিনি ফিরে গেলেন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সেই তপোবন দর্শনের দ্বারে। তিনি স্মরণ করলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য।

আধুনিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ কেন সেই তপোবন ভিত্তিক শিক্ষার দ্বারস্থ হলেন, সেটাও ভাববার বিষয়। এর কারণ হতে পারে : প্রথমত তিনি নিজে ভুক্তভোগী। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি অবলম্বনে জানা যায় তাঁর শৈশবের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কী ভয়ানক ই না কেটেছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হোক তা কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। নর্মাল স্কুলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন :

> গানের কথাগুলো ছিল ইংরেজি, তাহার সুরও তথৈবচ আমরা যে কী মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কী অনুষ্ঠান করিতেছি তাহা, কিছুই বুঝিতাম না। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৯৪ : ২৬)

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার ওপর গুরুত্বদান করে বহুবিধ প্রবন্ধ রচনা করতে দেখি।

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিকড়সন্ধানী, ঐতিহ্যানুসন্ধানী। ঐতিহ্য মানুষের আত্মবল বৃদ্ধিতে সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা দেখতে পাই যে, তিনি আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে কতখানি গুরুত্বদান করেছেন। আমাদের যা আছে, তা ব্রিটিশদের বা অন্যদের অপেক্ষা কম নয়, এটা স্বদেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন।

তৃতীয়ত তিনি বিলেত ভ্রমণ করেছিলেন কয়েকবার। বিদেশের অনুদার আচরণ তাঁর ভালো লাগেনি। তাই তিনি প্রাচীন ভারতের উদার গুরু-শিষ্য-শিক্ষার প্রবর্তন প্রত্যাশা করেন।

উদার প্রকৃতির প্রাঙ্গণে বেড়ে ওঠা শিশুও উদার মনের অধিকারী হবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অবলোকন করে বুঝেছিলেন যে পশ্চিমা শিক্ষা মানবিকতার শিক্ষা দেয় না।

চতুর্থত রবীন্দ্রনাথ বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। তপোবন-শিক্ষা প্রবর্তন করা হলে শিক্ষার্থীরা বিলাসী জীবন পরিহার করবে, পাশাপাশি ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ ভুলে বৃহত্তর ঐক্যেও পৌঁছাবে এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

পঞ্চমত পারিবারিক ঝুট-ঝামেলার প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে থাকবে। শিশুরা পরিবার থেকেই সবচেয়ে বেশি শেখে। যেহেতু একেক পরিবারের পরিবেশ একেক রকম, তাই শিশুদের ভিন্ন ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর তপোবন আশ্রমে থাকলে সকলে বেড়ে উঠবে একই আদর্শে ।

ষষ্ঠত রবীন্দ্রনাথ শিশুদের ইন্দ্রিয়শক্তির ওপর গুরুত্বদান করেছিলেন। প্রকৃতি ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধিতে সহায়ক। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, প্রকৃতিনির্ভর বিদ্যাই চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে। এসব কারণে তিনি তপোবন-আদর্শ বেছে নিতে বলেছেন।

সপ্তমত রবীন্দ্রনাথের নিজের শিশুজীবনে হিমালয়ের ঔদার্য, প্রকৃতির কোমলতা যত প্রভাব বিস্তার করেছিল, অন্য কিছুই আর তত প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি নিজে পিতার সহিত ধ্যানে বসতেন। নিজের প্রবর্তিত শিক্ষাচিন্তায়ও তাই এই বিষয়টা রাখতে তিনি আগ্রহী হয়েছেন। আধুনিককালে অবশ্য আমরা ধ্যান বা ইয়োগার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছি।

৬.২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই তপোবনভিত্তিক দর্শন তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তি নিকেতনে প্রয়োগে সথেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে শিশুদের গৃহবন্দি শ্রেণিকক্ষে নয়, বরং বৃক্ষের ছায়ায় প্রকৃতির মাঝে পাঠদান করা হয়। শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও দক্ষ করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের সন্তানকেও শান্তি নিকেতনের অন্যান্য সাধারণ ছাত্র থেকে আলাদা চোখে দেখেননি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী অবলম্বনে জানা যায় :

> রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের বোর্ডিং এ ছাত্র রূপে অন্যান্য ছেলেদের সহিত সমানভাবে খাওয়া-দাওয়া করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ নিজ পুত্রের জন্য কোন প্রকার পৃথক আহারাদির ব্যবস্থা করিতে দেন নাই। (প্রভাতকুমার ১৩১৬ বঙ্গাব্দ : ৭৮)

এতে বোধগম্য যে রবীন্দ্রনাথ ভেদাভেদহীন এক সুষম সমাজের কল্পনা করেছিলেন। পড়ার পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কাজকর্মে দক্ষ করার ব্যবস্থাও করেছিলেন। যেমন, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের পাশে উন্মুক্ত জমিতে বালকদের কৃষিকাজ, বালিকাদেরও সেলাইসহ

নানা গৃহকর্মের প্রশিক্ষণ দান করা হতো, যা বর্তমানের কারিগরি শিক্ষার ধারণা সংশ্লিষ্ট।

৬.৩

বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে সকালে ক্লাস নিতেন ও সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন। তাঁর রচিত শিশু পাঠ্যপুস্তক '*সহজপাঠ-১*' প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে। এখানে শিশুদের বর্ণ পরিচয়দানের চেষ্টা। ছড়াগুলো অনেকটা গল্পাকারে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে একেকটি অক্ষর একেকটি চরিত্র লক্ষণীয় :

প ফ ব ভ যায় মাঠে
সারাদিন ধান কাটে
ম চালায় গোরু-গাড়ি
ধান নিয়ে যায় বাড়ি।
(রবীন্দ্রনাথ ২০১২ : ১৬)

এতে শিশুদের কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার ইঙ্গিত রয়েছে। *সহজপাঠ*-২ এ শিশুদের যুক্তবর্ণ শেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সেইসাথে শিশুদের সময়জ্ঞান সম্পর্কে ধারণাদানের চেষ্টাও পরিলক্ষিত। বাংলা ঋতুর বিভিন্ন মাস ও দিনের সময় নিয়েও এখানে লেখা রয়েছে। আরও রয়েছে শিশুদের কায়িক শ্রম ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নির্দেশনা। যেমন : 'আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন'। (রবীন্দ্রনাথ ২০১২ : ৭)

বইটিতে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের উল্লেখ রয়েছে যেমন, পালং শাক, মাছ, লাউ, আলু, কলা, আখ, জাম, দৈ, খৈ, দুধ ইত্যাদি যেগুলো শিশুর দৈহিক বিকাশে সাহায্য করে। শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশের সাথে সামাজিক বিকাশ, নৈতিকতা, মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে। যেমন : 'তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দণ্ড দিতে হবে'। (রবীন্দ্রনাথ ২০১২ : ৫)

এছাড়া মনুষ্যত্ববোধ, কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যবোধ, আতিথেয়তা, সহযোগিতা, জনসেবা, স্নেহপরায়ণতা, পরোপকার বিষয়েও নির্দেশনা আছে এতে। এমনকি জাতীয় সংহতি ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য 'বন্দে মাতরম' গানের উল্লেখও রয়েছে। এছাড়া বারো মাসে পড়ানোর জন্য বারোটি অধ্যায় রয়েছে। '*সহজপাঠে'র* সকল উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়ক। শিক্ষা-সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের নিরিখে একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য উপাদানগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৪

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিশুদের নানারকম ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা নিতেন যা বর্তমান পরীক্ষার মতো

নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরীক্ষায় পাশ মানে 'গলায় ফাঁস' চিন্তা করেছিলেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের অজ্ঞাতে কয়েকটি জিনিস রুমাল চাপা দিয়ে মুহূর্তের জন্য রুমালটি উঁঠিয়ে নিতেন, ওই সামান্য সময়ে দেখে নিয়ে ছাত্রদের বলতে হতো রুমালের তলে কি কি বস্তু আছে। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ : ১৮)

৭.১

শিক্ষাতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কল্পিত বা অনুসৃত শিশুশিক্ষা অনেকটা জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) দ্বারা প্রভাবিত। রুশোর মতে, শিক্ষার উৎস তিনটি– প্রকৃতি, মানুষ ও বস্তুজগৎ। শিক্ষার এই তিনটি উৎসের মধ্যে যদি পূর্ণ সমন্বয় না ঘটে, তবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। এক্ষেত্রে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) এবং প্রাকৃতিক ফলভিত্তিক শিক্ষার (Educationthrough natural Consequences) ধারণা দেন।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা অনুসারে শিশুকে কোন কিছু শেখাবার চেষ্টা না করে সার্বিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে দিতে হবে। জোর করে শেখানোর চেষ্টা করার ফলে শৈশবে রাগ, বিরক্তি, হিংসা মারামারি প্রভৃতি জেগে ওঠে। রুশোর প্রাকৃতিক ফলের তত্ত্ব অনুসারে মুক্ত প্রকৃতির বুকে অবাধ বিচরণের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা লাভ করবে। প্রথাসিদ্ধভাবে তাকে নৈতিক বা মানসিক কোনো শিক্ষাই দেয়া যাবে না। তাঁর মতে মুক্ত পরিবেশেই কেবল শিশুর সহজাত ও সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নৈতিক শিক্ষার কথা বলেননি, শিশু তা আপনা আপনি শিখবে।

রুশো কল্পিত শিশু 'এমিলের শিক্ষা' কে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন। এগুলো মধ্যে এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের খাবারদান ও বেশি কাপড়-চোপড় পরিধান করতে দেয়া যাবে না বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই বয়সে শিশুদের বিলাসিতা করাতে নিষেধ করেছেন। রুশো দামি খেলনা পর্যন্ত দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সী শিশুদের ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্বদানের কথা বলেছেন। শিশুর কোনো কিছু করার ইচ্ছা এবং করতে পারার ক্ষমতার ভারসাম্যের মধ্যেই শিক্ষার মূল বিষয়টি নিহিত।

রুশোর মতে প্রাক-সামাজিক এই স্তরে শিশুর একজন শিক্ষক থাকবেন। তিনি কিছুই শিক্ষা দেবেন না, কেবল তত্ত্বাবধান করবেন। শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেয়ার চেয়ে সমাজের ভুল ও খারাপ জিনিসগুলো থেকে আড়াল করে রাখতে হবে। বই-পুস্তক শিশুর জন্য ক্ষতিকর, যতদূর সম্ভব তাকে কম বাচনিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। বাচনিক শিক্ষা বলতে তিনি আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশকে বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও একই ধরনের কথা বলেছেন।

৭.২

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক রুশো শিষ্য ফ্লোরেবেল (১৭৮২ - ১৮৫২) শিক্ষাকে আনন্দপূর্ণ কর্ম-খেলা ভিত্তিক করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে জগৎব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা হলো একটি স্বাভাবিক জৈবিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া। শিশুশিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে ফ্লোরেবেল এই স্তরে চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যরসপূর্ণ গল্প, মাটির কাজ এবং বল, ঘুটি প্রভৃতির বিভিন্ন আকৃতির বস্তুর সঞ্চালনের উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর শান্তিনিকেতনে এসবের প্রচলন রেখেছিলেন।

৭.৩

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষায় যে পদ্ধতি দেখা যায়, সেগুলো অনেকটা মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২) দ্বারা প্রভাবিত। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষাকে মন্তেসরি মূলত একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন, যার আশু লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন এবং চরম লক্ষ্য হল ধর্মীয়। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই শিক্ষার্থীর বিকাশ সহজে সাধিত হয়। শিশুর বিকাশের অর্থ অন্তর শক্তিসমূহের অব্যাহত ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, প্রত্যেক শিশুর বিকাশের দ্বারা আলাদা আত্মশিক্ষা হলো শিখনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ এবং পেশী ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশের ওপর অন্যান্য প্রকারের বিকাশ নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথও শিশুর ইন্দ্রিয়শক্তি বিকাশের প্রতি জোরারোপ করেছেন।

বাইরে থেকে চাপানো শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সমর্থক মন্তেসরি ছিলেন না। বিদ্যালয়ের স্বাধীন ও সুন্দর পরিবেশে দলগত কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক শিক্ষা দেয়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষাকার্যে শিশুদের সরাসরি হস্তক্ষেপকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে আত্মশিক্ষাকে সমর্থন করে তোলার জন্য শিক্ষকের উচিত শুধু প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করা। রবীন্দ্রনাথও শিশুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হোক চাননি।

মন্তেসরি শিক্ষককে 'পরিচালিকা' রূপে ভেবেছেন। তবে শিক্ষককে বিনয়ী, সংযত ও শিশু পর্যবেক্ষণে দক্ষ হবার নির্দেশও দিয়েছেন। বিদ্যালয়কে তিনি শিশুদের গৃহ বলেছেন, যে গৃহে অনেকগুলি ঘর থাকে আর একটি বাগান থাকে, যার দেখাশুনা শিশুরাই করে। এই বাগানে রোদ বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নেবার জন্য কতকগুলি ছাউনি থাকে। প্রধান ঘরটিতে লেখাপড়ার কাজ চলে এবং তার সংলগ্ন ঘরগুলিতে নানা কাজ চলে। ঘর ঝাঁট দেয়া থেকে খাবার দেয়া, টেবিল পরিষ্কার করা, স্নান করা, বিছানা পাতা, জিনিস গুছানো সব শিশুরাই করে। পিয়ানো, বাদ্যযন্ত্র, ফুল, খেলনা, ছবি ইত্যাদিও বিদ্যালয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষার চিন্তায় এর সাথে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের সহশিক্ষা কার্যক্রম যথা সংগীত, নৃত্য, ছবি আঁকা, বাজনা শেখা, নিজের কাজ নিজে করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৭.৪

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অন্যান্য শিখনতত্ত্ব যেমন, জ্যাঁ পিয়াজের জ্ঞান বিকাশতত্ত্ব, কোহল বার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব, ব্রুনারের তত্ত্ব, স্কিনারের তত্ত্বসহ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে এগুলোর কোনোটাই বাংলাদেশে অনুসৃত হয় না। শিশুদের জন্য কল্পিত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতিতে লক্ষ করা যায় যে, তিনি শিশুকে একজন পূর্ণ বিকশিত মানুষে রূপান্তরে প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি শিশুদের ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বইকে অনাবশ্যক মনে করেও পরে শান্তি নিকেতনে অভিভাবকদের চাপে যুগের চাহিদা সাপেক্ষে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন।

বর্তমান যুগে তথ্য-প্রযুক্তির অতি আধুনিকায়নে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে। অনুমান করা হয়, আজ থেকে শতবর্ষ পরে বই নিয়ে শিশুদের আর বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। তাদের সাথে থাকবে অডিও-ভিডিও সমেত ট্যাব, যেখানে পাঠ্যক্রম বিন্যস্ত আকারে থাকবে। বৃদ্ধিপাবে শ্রবণ-দর্শন-ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহার।

আমাদের দেশে পার্বত্যাঞ্চলের জনজীবন লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এখানকার শিশুরা বেড়ে উঠছে প্রকৃতির কোলে। ওদের মধ্যে মিথ্যাচার ও চৌর্যবৃত্তি তুলনামূলকভবে কম, অর্থাৎ নৈতিক মানদণ্ড উন্নত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে উঠায় প্রকৃতির সারল্য ও উদারতা ওদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচারের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে শিশুরা পরিচিত হবার সুযোগই পায় না। শিশুরা উপদেশ শ্রবণ নয়, অনুকরণে অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ তা ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি শিশুদের নীতি-উপদেশ দিতে নিষেধ করেছেন। নৈতিকতা একটি প্রক্রিয়া; যা চর্চার মধ্য দিয়ে জাগ্রত হয়, উপদেশ দিয়ে নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে জটিল সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণতা লাঘবেই রবীন্দ্রনাথ পুরাতনকে আশ্রয় করেছেন, স্মরণ করেছেন তপোবনভিত্তিক শিক্ষার আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের যুগে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যাসমূহ বিদ্যমান ছিল, এতযুগ পরেও তার লাঘব তো ঘটেইনি, বরঞ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। তবু প্রত্যাশার বাণী হলো, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র শিশুশিক্ষা উন্নত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট। এর জন্য প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, পাঠদানের কৌশল প্রভৃতিতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ করা যায়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষার দর্শন আরোপ করলে আমাদের জাতির মুক্তির সম্ভাবনা। আমরা যেভাবেই শিশুদের বড় করি না কেন, তা যেন মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যের বাইরে না হয়, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের

প্রত্যাশা। বর্তমান ও আশু ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের তপোবনভিত্তিক গুরু-শিষ্য শিক্ষাপদ্ধতির বাস্তবায়ন হয়তো আর সম্ভবপর নয়, তবে শিশুর সার্বিক বিকাশে আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানীর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষা দর্শনের দ্বারস্থ আমাদেরকে হতেই হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০০। *প্রবন্ধসমগ্র*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা।

সফিউদ্দিন আহমদ, ১৯৯৯। *রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষা চিন্তা*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৪। *জীবনস্মৃতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, কলকাতা ।

হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৯। *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তা*, আগামী প্রকাশন, ঢাকা।

গোপাল হালদার (সম্পাদনা), ১৯৯৮। *রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন*, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ১৯৯৫। *দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, ১৯৬৮। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

শাহজাহান তপন ও আব্দুর রশিদ, ২০০৩। *শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন*, মেট্রো পাবলিকেশন, ঢাকা।

আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, ২০০৭। *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১২। *সহজপাঠ প্রথমভাগ*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিকাশ ভবন, পশ্চিমবঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১২। *সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিকাশ ভবন, পশ্চিমবঙ্গ।

গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৭। *উন্নত শিক্ষাতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০২১। *রবীন্দ্রনাথের এশিয়া দর্শন*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।